প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশিকা ঃ
শ্রীমতি আলোরাণী পাত্র
প্রগতি প্রকাশনী
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ
প্রদোষকান্তি বর্মণ

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীগৌরচন্দ্র জানা
২৪৩/২সি এ. পি. সি. রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য—৪৫.০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

পাঠক পাঠিকাদের

উদ্দেশ্যে

দৈনিক ট্রেনটা সেদিনও সকালে যথারীতি ইডেনব্রিজ থেকে লণ্ডন যাচ্ছিল। নিজের জায়গাতেই বসেছিলেন স্যামুয়েল নার্টকিন। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন যদি তাঁর চশমার খাপটা বসবার আসনের নিচের গদীতে আটকে না যেত, তাহলে এসব ঘটনা ঘটতই না। কিন্তু খাপটা পড়ে গেল, আর সেটাকে তোলার জন্য তিনিও গদীর নিচে হাত ঢোকালেন। ব্যস্, শুরু হয়ে গেল খেল।

গদীর নিচে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে চশমার খাপ তো খুঁজে পেলেনই, সেই সঙ্গে তাঁর হাতে উঠে এল একটি সরু পত্রিকা। বোঝাই যায় এর আগে কেউ ঐ আসনেই বসে পত্রিকাটি পড়ে সিটের তলায় গুঁজে দিয়েছে। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, এটি রেলের টাইমটেবল। তাই পত্রিকাটি হাতে ঠেকতেই তুলে নিয়েছিলেন। অবশ্য রেলের টাইমটেবলেরও তাঁর যে খুব প্রয়োজন আছে, তা নয়। গত পঁচিশ বছর ধরে রোজ এই একই সময়ে একই ট্রেন ধরে তিনি ইডেনব্রিজ থেকে চেয়ারিং ক্রস স্টেশনে যাচ্ছেন। আবার সন্ধ্যাবেলা ফেরার সময় ক্যানন স্ট্রীট স্টেশন থেকে কোল্ট-এ ফিরছেন। অতএব টাইমটেবলের কোন প্রয়োজনই নেই। স্রেফ কৌতূহলবশতই তুলে নিয়েছিলেন পত্রিকাটা।

কিন্তু পত্রিকার সামনের মলাটটায় চোখ পড়তেই মিঃ নার্টকিনের মুখটা রক্তবর্ণ ধারণ করল। তড়িঘড়ি বইটা আবার গদীর নিচেই ঠেসে দিলেন। দ্রুত গোটা কামরাটায় একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন, তাঁর আবিষ্কারটির দিকে আর কারুর চোখ পড়েছে কিনা। ঠিক উল্টোদিকেই দু'টি 'ফিনান্সিয়াল টাইমস', একটি 'টাইমস' এবং একটি 'গার্ডিয়ান' তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ট্রেনের চলার ছন্দে দুলছে। তাদের পাঠকরা কাগজের আড়ালে অন্তর্হিত। তাঁর ডানদিকে বৃদ্ধ ফোগার্টি একমনে ক্রসওয়ার্ড পাজল করে যাচ্ছেন। জানলার বাইরে 'হাইদার গ্রিন' স্টেশনটা হুস্ করে বেরিয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন স্যামুয়েল নার্টকিন।

পত্রিকাটা ছোট্ট, মলাটটা রীতিমতো চকমকে মলাটের উপরের দিকে লেখা 'নিউ সার্কল', সম্ভবতঃ এটাই পত্রিকার নাম। মলাটের নিচের দিকে লেখা রয়েছে

'যৌন সচেতন মহিলা-পুরুষের যোগাযোগের পত্রিকা—একক, গোষ্ঠী, অথবা দু'জন।' এই দু'টি লাইনের মাঝখানে মলাটের উপর একটি মেয়ের ছবি। ছবির সিংহভাগ দখল করেছে মেয়েটির বিশাল দুই স্তন। মুখ দেখা যাচ্ছে না, সেখানে সাদা রং করে দিয়ে মেয়েটির পরিচিতি হিসেবে লেখা রয়েছে 'মডেল এইচ ৩৩১'। মিঃ নার্টকিন আগে কোনদিন এধরনের পত্রিকা দেখেননি। চেয়ারিং ক্রস স্টেশন পর্যন্ত তাঁর মন জুড়ে রইল শুধু এই পত্রিকাটাই।

ট্রেন গন্তব্যস্থলে পেঁছানোর পর হাট হয়ে খুলে গেল দরজাটা। ছয় নম্বর প্ল্যাটফর্মে সার দিয়ে নামতে শুরু করল রোজকার যাত্রীরা। স্যামুয়েল নার্টকিন কিন্তু আজ কোন তাড়াহুড়ো করলেন না। ব্রিফকেস গোছানোর অছিলায় খানিকটা সময় নিলেন, ছাতা আর টুপি নাড়াচাড়া করে আরো একটু দেরি করলেন। শেষমেশ দেখা গেল কামরায় সবার শেষে তিনি। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে টুক করে পত্রিকাটা টেনে ঢুকিয়ে দিলেন নিজের ব্রিফকেসে। তারপর অগণিত অফিস যাত্রীর সঙ্গী হয়ে মিশে গেলেন জনারণ্যে।

কিন্তু স্টেশন থেকে অফিস পর্যন্ত হাঁটা পথটায় একটা তাঁর অস্বস্তি খোঁচা দিতে থাকল তাঁকে। ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম বেয়ে সাবওয়ে, সেখান থেকে ম্যানসন হাউস স্টেশন, গ্রেট ট্রিনিটি লেন এবং ক্যাননস্ট্রীট ধরে হাঁটলে শুরু হয় অফিসপাড়া। এখানেই এক বীমা কোম্পানীতে কর্মরত তিনি। রোজই এ পথটা হেঁটে আসেন, কিন্তু আজ হাঁটাটা ঠিক স্বস্তিদায়ক হল না। একবার একটা লোকের কথা শুনেছিলেন, লোকটাকে একটা গাড়ি ধাক্কা মেরেছিল। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে যখন তার পকেটের জিনিসপত্র বের করা হল, তখন পাওয়া গেল একগাদা নোংরা ছবি। সে কথাটাই এখন বারবার মনে আসতে লাগল। ওঃ, তাঁর এখন কোন দুর্ঘটনা ঘটলে কী হবে? যেমন লজ্জা, তেমনি দুর্নাম, অসহ্য পরিস্থিতি হয়ে উঠবে। পা প্লাস্টার করে তিনি শুয়ে আছেন, এদিকে সবাই তাঁর গোপন অনুভূতির কথা জেনে ফেলেছে। সেদিন রাস্তা পার হলেন অতিরিক্ত সতর্কতা নিয়ে। ধীরে ধীরে হেঁটে পেঁছেগেলেন অফিসপাড়ায়।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই এটা পরিষ্কার হয়েছে যে স্যামুয়েল নার্টকিন এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত নন। খুব অল্প বয়সে সেনাবাহিনীতে ঢুকেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর যখন সেনাবাহিনী ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, তখন তিনি

নিয়মবহির্ভূতভাবে কোম্পানির অ্যাকাউণ্ট থেকে যে হাজার খানেক পাউণ্ড সরাবেন, সে চিন্তাও তাঁর মনে এল না।

সন্ধ্যাবেলা লেটিসের সঙ্গে বসে টিভি দেখছিলেন। ঠিক আটটায় ফোন বাজল। সেই ধোঁয়াটে কণ্ঠস্বর।

'টাকাটা জোগাড় করেছেন, মিঃ নাটকিন?' কোন ভূমিকা ছাড়াই লোকটি প্রশ্ন করল।

'অ্যাঁ···অ্যাঁ···হ্যাঁ,' বললেন মিঃ নাটকিন, 'কিন্তু দেখুন, এটা না দিলেই নয়? নেগেটিভগুলো পাঠিয়ে দিন আপনারা, প্লিজ! গোটা ব্যাপারটা আপনারা ভুলে যেতে পারেন না?'

অপরপ্রান্ত খানিকক্ষণ চুপচাপ। বোধহয় বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হয়ে গেছে। তারপর আবার সেই কণ্ঠ কথা বলল, 'আপনার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'উহুঁ', বললেন মিঃ নাটকিন, 'কিছুই হয়নি। আমি শুধু আপনাকে বোঝাতে চাইছিলাম যে আপনারা এই ব্যাপারটা নিয়ে চাপাচাপি করলে একটা চরম দুঃখজনক ঘটনার সৃষ্টি হবে।'

'এবার তুমি আমার কথা শোন', 'রাগে হিসহিসিয়ে উঠল ওপাশের গলা, 'তোমাকে যা বলা হচ্ছে, সেটা করলেই তোমার মঙ্গল। উল্টোসিধে কাজ করলে স্রেফ ছবিগুলো তোমার বৌ-আর ওপরওলার কাছে পাঠিয়ে দেবো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিঃ নাটকিন। বললেন, 'এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। ঠিক আছে, বলুন।'

'আগামীকাল অফিসে টিফিনের সময় একটা ট্যাক্সি ধরে অ্যালবার্ট ব্রিজ রোড পর্যন্ত আসবেন। তারপর ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করবেন। ব্যাটারসি পার্ক দিয়ে ঘুরে পড়বেন ওয়েস্ট-ড্রাইভে। সোজা রাস্তাটা অর্ধেক হাঁটলে বাঁদিকে একটা রাস্তা পাবেন। সেটা দিয়ে এগোলেই সেণ্ট্রাল ড্রাইভ। সেটা ধরে খানিকটা আবার এগোলে রাস্তার ধারে দেখবেন দু'টো বেঞ্চ। আশে-পাশে কেউ থাকবে না, বছরের এ সময়ে কেউ সেখানে যায় না। টাকাটা একটা ব্রাউন পেপারের মোড়কে মুড়ে প্রথম বেঞ্চটার তলায় রাখবেন। তারপর সোজা হেঁটে পার্কের অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবেন। বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি', মিঃ নাটকিন বললেন।

'বেশ', লোকটি বলল, 'আর একটা কথা। আপনি পার্কে ঢোকার পর থেকেই কিন্তু আপনার উপর নজর রাখা হবে। আপনি ঠিকমত টাকাটা

রাখলেন কিনা, সেটাও লক্ষ্য রাখা হবে। পুলিশের সাহায্য চেয়ে কোন লাভ হবে না, কারণ আপনি আমায় চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে আগাপাশতলা চিনি। একটু বিপদের ইঙ্গিত পেলে, বা পুলিশ নজর রাখছে জানতে পারলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়ব। তারপর কী হবে তা তো জানেনই।'

'হ্যাঁ', দুর্বল গলায় বললেন মিঃ নার্টকিন।

'ঠিক আছে, তাহলে যা বললাম, সেই মত কাজ করবেন। ভুলভাল করবেন না।'

ফোন নামিয়ে রাখার শব্দ হল।

এর মিনিট কয়েক বাদে স্যামুয়েল নার্টকিন স্ত্রীকে একটা অজুহাত দেখিয়ে বাড়ির পাশে গ্যারেজে চলে গেলেন। খানিকক্ষণ তিনি একা থাকতে চান।

পরের দিন ঠিক পূর্বনির্দেশমতই কাজ করলেন মিঃ নার্টকিন। সেণ্ট্রাল ড্রাইভে পৌঁছনোর পর তিনি দেখলেন, কয়েক ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে এক মোটর সাইকেল আরোহী। নিজের বাহনের উপর বসে নিবিষ্টচিত্তে একটি রোডম্যাপ পর্যবেক্ষণ করছে সে। লোকটির মাথায় ক্র্যাশ হেলমেট, চোখে গগল্‌স, গলা এবং মুখ জুড়ে একটা স্কার্ফ জড়ানো। নার্টকিনকে দেখে স্কার্ফের ভিতর দিয়ে চাপা গলায় সে বলে উঠল, 'এই যে স্যার, একটু সাহায্য করতে পারেন?'

হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন মিঃ নার্টকিন। তারপর মোটর সাইকেলটার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ম্যাপটা দেখতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কানের কাছে একটা কণ্ঠস্বর হিসহিসিয়ে উঠল, 'মিঃ নার্টকিন, মোড়কটা আমার হাতে দিয়ে দিন।'

মোড়কটা প্রায় ছিনিয়ে নিল লোকটি স্যামুয়েল নার্টকিনের হাত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ইঞ্জিনের চালু হবার শব্দ। মোড়কটি হ্যাণ্ডেলের পাশে লাগানো একটি বাস্কেটে ঢুকিয়ে নিল আগন্তুক, তারপর নিমেষের মধ্যে মোটর সাইকেল চালিয়ে দিল ঝড়ের মত। গোটা ঘটনাটা ঘটে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। পুলিশ যদি নজরও রাখত, ওরা কিছুতেই লোকটিকে ধরতে পারত না। একটা অস্বাভাবিক দ্রুততায় কাজ সেরে সে মিশে গেল অ্যালবার্ট ব্রিজ রোডের গাড়ির অরণ্যে। খুব বিষণ্ণভাবে সেদিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন মিঃ নার্টকিন। তারপর আবার অফিসে ফেরার পথ ধরলেন।

লণ্ডন পুলিশের অপরাধ তদন্ত শাখার ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট স্মাইলির

নামের সঙ্গে স্বভাবের কোন মিল নেই। তাঁর মুখে হাসি এক অতি দুর্লভ ব্যাপার। একে তো মুখখাল্য ঘোড়ার মত লম্বা, বাদামী চোখ দুটোয় সব সময় এক বিষণ্ণ দৃষ্টি। তার উপর পরের সপ্তাহে তিনি যখন মিঃ নাটকিনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তখন তাঁকে আরো গম্ভীর দেখাচ্ছিল। শীতের সন্ধ্যা, অন্ধকার একটু তাড়াতাড়িই নেমেছে। লম্বা, কালো ওভারকোট পরে দরজার সামনে সিঁড়ির উপর দাঁড়ালেন স্মাইলি।

'মিঃ নাটকিন ?'

'হ্যাঁ'

'মিঃ স্যামুয়েল নাটকিন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই।'

'আমি ডিটেকটিভ সার্জেণ্ট স্মাইলি। আপনার সঙ্গে একান্তে একটু কথা বলতে চাই।' তিনি তাঁর পরিচয়পত্র বের করলেন, কিন্তু ততক্ষণে মিঃ নাটকিন মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে দিয়েছেন। বললেন, 'আসুন, ভিতরে আসুন।'

দেখা গেল স্মাইলি একটু অস্বস্তিতে পড়েছেন। গলা-টলা খাকারিয়ে শুরু করলেন, 'যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে এসেছি মিঃ নাটকিন, সেটা কী বলব…একটু…এই…ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে বলতে পারেন। খানিকটা অস্বস্তি-করও বলা যায়।'

'না, না, অস্বস্তির কি আছে ? আপনি সহজ হয়ে বলুন, সার্জেণ্ট।'

এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন স্মাইলি। কেটে কেটে বললেন, 'অস্বস্তির কিছু নেই ?'

'কেন ? কী ব্যাপার বলুন তো ? আমি ভেবেছিলাম, আপনাদের কোন অনুষ্ঠান। টেনিস ক্লাবের সদস্যদের তো আমন্ত্রণ জানান আপনারা। তাছাড়া এ বছর আমিই সম্পাদক, তাই ভেবেছিলাম……'

ঢোক গিললেন স্মাইলি, 'না, ব্যাপারটা তা নয়। আমি একটা তদন্তের ব্যাপারে এখানে এসেছি।'

'তদন্ত ? বেশ, বলুন। তাতেও আপনার অস্বস্তি হবার কোন কারণ নেই।'

সার্জেণ্টের চোয়াল এবার শক্ত হল, 'মিঃ নাটকিন, আমি আপনার অস্বস্তির কথা বলছিলাম, আমার নিজের নয়। আপনার স্ত্রী কি বাড়িতে আছেন ?'

'হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছেন। একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন, শরীরটা খুবই খারাপ

তো……'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দোতলা থেকে রাগত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কে এসেছে স্যামুয়েল ?'

'পুলিশ থেকে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।'

'পুলিশ ?'

'চিন্তার কিছু নেই। পুলিশ স্পোর্টস ক্লাবে একটা টেনিস টুর্নামেণ্ট হবে, তাই নিয়ে কথা বলতে এসেছেন।'

মাথা নাড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়াটা তারিফ করলেন স্মাইলি। তারপর মিঃ নাটকিনের পিছু পিছু প্রবেশ করলেন বসার ঘরে।

দরজা বন্ধ করতে করতে মিঃ নাটকিন বললেন, 'এবার বলুন তো সার্জেণ্ট, কী এমন ব্যাপার যা নিয়ে আমাকে অস্বস্তিতে পড়তে হবে।'

'দিন কয়েক আগে', শুরু করলেন সার্জেণ্ট স্মাইলি, 'আমার কয়েকজন সহকর্মী এক বিশেষ প্রয়োজনে লণ্ডনের ওয়েস্ট এণ্ডের একটি ফ্ল্যাট খানা-তল্লাসি করতে যায়। তল্লাসি চলাকালীন চাবি দেওয়া একটি ড্রয়ারের মধ্যে তারা বেশ কয়েকটা খাম পায়।'

মুখে তীব্র আগ্রহ নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মিঃ নাটকিন।

'সব মিলিয়ে প্রায় খান তিরিশেক খাম পাওয়া গেছে', বললেন স্মাইলি, 'প্রত্যেকটা খামের মধ্যে রয়েছে একটা করে পোস্টকার্ড ; প্রত্যেকটা পোস্টকার্ডে লেখা রয়েছে একজন করে লোকের নাম, তাদের ঠিকানা ; কোন কোন ক্ষেত্রে অফিসের ঠিকানা পর্যন্ত। এরকম অনেকের নাম ঠিকানা পাওয়া গেছে। সেইসঙ্গে প্রত্যেকটা খামে পাওয়া গেছে এক ডজন করে ফটোর নেগেটিভ। প্রতিটি ছবিতেই দেখা যাচ্ছে কোন না কোন পুরুষ বয়স্ক মানুষই বলা ভালো, একজন মহিলার সঙ্গে খুব…কী বলব…মানে বেশ, উত্তেজক ভঙ্গিতে, ঘনিষ্ঠ অবস্থায় রয়েছেন।'

মিঃ নাটকিনের মুখ ততক্ষণে রক্তশূন্য হয়ে গেছে। খুব নার্ভাস ভাবে একবার ঠোঁটটা চেটে নিলেন। সেটা চোখ এড়াল না সার্জেণ্ট স্মাইলির।

'প্রত্যেকটি ছবিতেই', বলে চললেন স্মাইলি, 'দেখা যাচ্ছে, মহিলা একজনই। পুলিশের খাতায় তার নাম রয়েছে। পেশায় বারবণিতা, দু'-একবার জেলও খেটেছে। আর পুরুষদের মধ্যে…স্যারি, কিছু মনে করবেন না……একটা খামে আপনার নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে, সঙ্গে ছ'টা নেগেটিভ। তাতে দেখা

গেছে আপনিও ওই মহিলার সঙ্গে…মানে…বিশেষ এক ধরনের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি যে এই মহিলা আর একজন লোকের সহায়তায় কোন কুকর্ম শুরু করেছিল। যে ফ্ল্যাটটিতে আমার সহকর্মীরা হানা দিয়েছিল, সেখানেই এরা দু'জন থাকত। আমার কথা বুঝতে পারছেন তো ?'

লজ্জায় ততক্ষণে স্যামুয়েল নার্টকিন দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছেন। শূন্য দৃষ্টিতে মেঝের কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ! ছবি! কেউ নিশ্চয়ই ছবি তুলে নিয়েছিল। উঃ, এগুলো প্রকাশ পেয়ে গেলে কি হবে ? আমি দিব্যি গেলে বলছি, সার্জেন্ট, এটা যে বে-আইনি কাজ, তা আমার ধারণাই ছিল না।'

ভুরু কুঁচকে তাকালেন স্মাইলি, 'মিঃ নার্টকিন, একটা কথা আগে পরিষ্কার করে নিই। আপনি যা করেছেন, তা আদৌ বে-আইনি নয়। আপনার ব্যক্তিগত জীবন আপনার ব্যাপার। পুলিশের তা নিয়ে কিছু বলার নেই। যতক্ষণ না আইন ভাঙছেন। আর বেশ্যালয়ে যাওয়াটা আইন ভাঙার পর্যায়ে পড়ে না।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না', ধরা গলায় স্যামুয়েল বললেন, 'আপনি বললেন তদন্তে এসেছেন……'

'কিন্তু সেটা আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নয়', দৃঢ় গলায় বললেন স্মাইলি, 'লণ্ডন পুলিশের ধারণা, পুরুষদের লোভ দেখিয়ে ঐ মহিলার ফ্ল্যাটে নিয়ে আসা হত। হয় ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে, নয়তো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কাজটা করা হত। তারপর গোপনে তাদের ছবি তুলে পরবর্তীকালে ঐসব পুরুষদের ব্ল্যাকমেল করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য।'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন মিঃ নার্টকিন। তিনি আর ভাবতে পারছেন না। শুধু ফিসফিস করে বললেন, 'ব্ল্যাকমেল ? হে ভগবান, এ কী হল ?'

হ্যাঁ, ব্ল্যাকমেল', বললেন স্মাইলি, 'আচ্ছা, মিঃ নার্টকিন, এটা দেখুন তো…'

কোটের পকেট থেকে একটা ছবি বের করলেন স্মাইলি। বললেন, 'দেখুন তো, এই মেয়েটিকে চিনতে পারেন কি না…'

ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন নার্টকিন। এই মেয়েটিকেই তিনি স্যালি

বলে জানেন। খানিক পরে মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, চিনি।'

'বেশ', ছবিটা আবার কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন স্মাইলি।

'এবার বলুন তো, কীভাবে মেয়েটির সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল? আমি অবশ্য এখন লিখিত কিছু রাখছি না। আপনি যা বলবেন, সেটা গোপন তথ্য হিসেবেই বিবেচনা করা হবে। যদি না পরে মামলা চলাকালীন তার কোন দরকার পড়ে।'

সন্ত্রস্ত, লজ্জিত, অসহায় স্যামুয়েল নাটকিন একেবারে গোড়া থেকে সব ঘটনা বলতে শুরু করলেন। ট্রেনে হঠাৎ পত্রিকা পাওয়া, অফিসের বাথরুমে পড়া চিঠি লিখবেন কি না, তা নিয়ে নিজের মনের সাথে যুদ্ধ, লোভের বশ্যতা স্বীকার, হেনরি জোন্স নাম নিয়ে চিঠি লেখা, সবকিছু। তারপর চিঠির উত্তর পাওয়া, টেলিফোন নম্বর পাওয়া, বেলা সাড়ে বারোটায় সাক্ষাতের সময় করা—এসবও বললেন। তারপর মহিলার সঙ্গে সাক্ষাতের পুংখানুপুংখ বিবরণ দিলেন। বললেন, শোবার ঘরে যাবার আগে মহিলা কীভাবে তাঁকে বাধ্য করেছিলেন জ্যাকেট খুলে বসার ঘরে রেখে যেতে। আরো বললেন, জীবনে এই প্রথম তিনি এরকম কাজ করেছেন। এমনকি মহিলার সঙ্গে সাক্ষাতের পর সেই পত্রিকাটি পর্যন্ত তিনি পুড়িয়ে ফেলেছেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছেন আর কখনো এরকম কাজ করবেন না।

মন দিয়ে সব শুনলেন স্মাইলি। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলি! সেখানে যাবার পর আপনি কি কোন টেলিফোন পেয়েছেন? বা আপনার অনুপস্থিতিতে বাড়িতে আপনার নামে কি কোন টেলিফোন এসেছে? ফোনে কি ছবির নেগেটিভ দেবার নাম করে কোন টাকা দাবি করা হয়েছে?'

মাথা নাড়লেন স্যামুয়েল নাটকিন, 'না তো, সেরকম কিছু আসেনি। মনে হয়, এখনো আমাকে ধরার সময় করে উঠতে পারেনি।'

এতক্ষণে হাসলেন সার্জেন্ট স্মাইলি, মৃদু হাসি। বললেন, 'ধরতে পারেনি, আর পারবেও না। সবচেয়ে বড় কথা, নেগেটিভগুলো তো পুলিশের হাতে।'

চোখে আশার আলো জ্বলে উঠলো মিঃ নাটকিনের। 'ওঃ হ্যাঁ, তাই তো, তিনি বলেছেন, আপনিই তো তদন্ত করছেন। আমাকে ওরা ধরার আগে আপনি নিশ্চয়ই ওদের ধরে ফেলবেন। আচ্ছা সার্জেন্ট, ঐ—ভয়ঙ্কর ছবিগুলোর কি হবে?'

'আপনার সঙ্গে কথা বলার পর আমি যদি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে জানাই যে আপনার ছবিগুলো আমাদের তদন্তের ব্যাপারে কোন কাজে আসবে না, তাহলে ওগুলো পুড়িয়ে ফেলা হবে।'

'ওঃ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম সার্জেন্ট। এতক্ষণে স্বস্তি পেলাম। আচ্ছা একটা কথা বলুন তো, বিভিন্ন লোকের ছবি তো এরা দু'জন তুলে রেখেছিল ব্ল্যাকমেল করার জন্য, কিন্তু ব্ল্যাকমেল করেছে এরকম কাউকে পাওয়া যায়নি? কাউকে না কাউকে নিশ্চয়ই চেষ্টা করেছিল।'

'নিঃসন্দেহে', বললেন স্মাইলি, উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে, যেসব লোকের ছবি পাওয়া গেছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অনেক লোক তো, সময় নেবে। তবে কিছু কিছু হদিস নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ব্ল্যাকমেলের শিকার হয়েছে, এরকম কিছু নাম অতি অবশ্যই বেরিয়ে আসবে।'

'কিন্তু কারা টাকা দিয়েছে, আর কারা দেয়নি সেটা আপনারা বুঝবেন কি করে?' প্রশ্ন করলেন মিঃ নাটকিন, 'ধরুন, কোন মানুষের কাছে হয়তো টাকা দাবি করা হয়েছিল, সে হয়তো দিয়েছেও, কিন্তু ভয়ে কোন কথা স্বীকার করল না। এমনকি আপনাদের কাছেও।'

আবার মৃদু হাসলেন সার্জেন্ট স্মাইলি, 'ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখলেই ধরা পড়ে যাবে। সাধারণ মানুষের সাধারণতঃ একটা-দুটোর বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে না। হঠাৎ অনেক টাকার দরকার পড়লে হয় তারা ব্যাংকে যাবে, নয়তো ঘরের দামি জিনিস কিছু বেচে দেবে। একটা না একটা সূত্র পাওয়া যাবেই।'

কথা বলতে বলতে দু'জনে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'সার্জেন্ট, যে লোকটা পুলিশের কাছে গিয়ে এইসব স্কাউন্ড্রেলগুলোকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে, তার কিন্তু প্রশংসা করতেই হবে, বললেন মিঃ নাটকিন 'আমার কাছেও নিশ্চয়ই তারা টাকা দাবি করত। জানিনা, সেটা আপনাদের জানানোর মত সাহস আমার হত কিনা, তবে বলা উচিৎ। যাকগে আমায় কি সাক্ষ্য দিতে হবে, সার্জেন্ট? যদিও নাম-ধাম গোপন থাকবে ঠিকই, তবু লোকের চোখে তো নজর এড়ানো যায় না।'

'নাঃ, মিঃ নাটকিন। আপনাকে সাক্ষ্য দিতে হবে না।'

'কিন্তু যে লোকটা এদের পরিচয় ফাঁস করেছে, তাকে তো সাক্ষ্য দিতেই হবে। তার জন্য আমার খারাপ লাগছে', বললেন মিঃ নাটকিন।

'না, এইসব ব্যক্তিদের কাউকেই সাক্ষ্য দিতে হবে না।'

'ব্যাপারটা তো বুঝতে পারলাম না, সার্জেন্ট। আপনি দু'জন ব্ল্যাকমেলারকে সাক্ষ্য প্রমাণ সমেত ধরিয়ে দিয়েছেন। তাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে, আপনি নিশ্চয়ই তাদের গ্রেপ্তার করবেন। আপনার তদন্ত...'

'মিঃ নাটকিন, দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন সার্জেন্ট স্মাইলি, 'আমরা শুধু ব্ল্যাকমেল নিয়ে তদন্ত করছি না, আমরা খুনেরও তদন্ত করছি।'

নাটকিনের মুখটা দেখার মত হল। 'খুন?' অস্ফুটে বলে উঠলেন তিনি, 'মানে বলতে চাইছেন ওরা খুনও করেছে?'

'কারা?'

'ঐ ব্ল্যাকমেলাররা।'

'না, না, ওরা কাউকে খুন করেনি। কেউ একজন ওদের খুন করেছে। কিন্তু প্রশ্নটা হল, কে? ব্ল্যাকমেলারদের কপালে অবশ্য এরকমই ঘটে। এরা শ'য়ে শ'য়ে লোককে ব্ল্যাকমেল করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ না কেউ এদের পরিচয় ধরে ফেলেছে। সম্ভবত পাবলিক বুথ থেকে ফোন করে এরা এদের কাজকারবার চালাত। বর্তমান শিকারদের নাম-ধাম-ছবি ছাড়া আর কোন রেকর্ড এরা রাখেনি। সমস্যাটা হল, কোথা থেকে শুরু করা যায়?'

'তাইতো, বিড়বিড় করে বললেন মিঃ নাটকিন, 'ওদের কি গুলি করা হয়েছে?'

'না। যে কাজটা করেছে, সে ওদের ঠিকানায় একটা পার্সেল পাঠিয়েছিল। অর্থাৎ সে যেই হোক্ না কেন, ওদের ঠিকানাটা তার জানা ছিল। পার্সেলটা একটা ইস্পাতের ছোট ক্যাশবাক্স। ঢাকনার উপরে একটা চাবি টেপ দিয়ে আটকানো। যখনই চাবি দিয়ে ঢাকনা খোলার চেষ্টা হয়েছে, তখনই ভিতরের চাপে খুলে গেছে ঢাকনাটা। ভিতরে একটা দুরন্ত কায়দায় বানানো ছোট অথচ শক্তিশালী বোমা রাখা ছিল। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায়নি। পুলিশ ল্যাবরেটরি থেকে জানানো হয়েছে এই ধরনের বোমার নাম হাউসট্র্যাপ স্প্রিং। ঢাকনা খোলা মাত্র বোমাটা ফেটে দু'জনকেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।'

মিঃ নাটকিন এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন তিনি মাউন্ট অলিম্পাস থেকে পড়ে গেছেন। অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন, 'অবিশ্বাস্য! কিন্তু কোন সম্মানীয় নাগরিক বোমা জোগাড় করবে কী করে?'

মাথা নাড়লেন সার্জেন্ট স্মাইলি, 'আজকালকার দিনে সবই পাওয়া যায়।

কি করে বানাতে হয়, সে ব্যাপারে তো বইও বেরিয়ে গেছে। ঠিকঠাক জিনিস-পত্র যুগিয়ে দিলে আজকের একটা ক্লাস সিক্সের ছেলেও বোমা বানিয়ে দেবে। যাক্, শুভরাত্রি, মিঃ নাটাঁকিন। মনে হয় না আর আপনাকে বিরক্ত করতে হবে।'

পরের দিন অফিস থেকে ফেরার পথে মিঃ নাটাঁকিন এক ফটো বাঁধানোর দোকানে গেলেন। দিন পনেরো আগে এখানে একটা ফটো বাঁধাতে দিয়েছিলেন, সেটা সংগ্রহ করলেন। দোকানে বলেই দিয়েছিলেন, তিনি নিজে এসে না নেওয়া অবধি যেন কাউকে এই ফটো না দেওয়া হয়। পুরনো ছবি; সেটার পুরনো ফ্রেমটা পাল্টে নতুন ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে ছবিটা। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে ফায়ারপ্লেসের পাশে টেবিলের উপর আবার সগর্বে স্থান পেল ছবিটা।

ছবিটা বহু পুরোনো। ছবিতে দু'জন যুবককে দেখা যাচ্ছে, গায়ে তাদের ব্রিটেনের রয়্যাল আর্মি ইঞ্জিনিয়ার্স বম্ব ডিজপোজাল ইউনিটের উর্দি। তারা দু'জনে পাঁচ টন ওজনের একটা জার্মান বোমার উপর বসে আছে। সামনে একটা কম্বলের উপর ছড়ানো রয়েছে বিশাল সেই বোমার ভিন্ন ভিন্ন অংশ। পিছনের প্রেক্ষাপটে রয়েছে একটা গ্রামের গির্জা। যুবকদের একজন রোগাটে, লম্বা চোয়াল, উর্দির কাঁধের কাছে কয়েকটি তারকাচিহ্ন বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে একজন মেজর। অন্য যুবকটি গোলগাল, চোখে চশমা। ছবিটির নিচে লেখা রয়েছে—বোমার দুই জাদুকর—মেজর মাইক হ্যালোরান এবং কর্পোরাল স্যাম নাটাঁকিনকে—অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতাসহ স্টিপ্‌ল নর্টন গ্রামের অধিবাসীরা, জুলাই ১৯৪৩।'

গর্বিত দৃষ্টিতে সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন স্যামুয়েল নাটাঁকিন। তারপর চাপা ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলেন—

'ক্লাস সিক্সের ছেলের কাজই বটে!'

মার্ক স্যান্ডারসন মেয়েদের পছন্দ করে। অবশ্য ভাল ভাল খাবারও তার পছন্দ, যেমন গাজরের কুচি দিয়ে অ্যাবার্ডিন অ্যাঙ্গাসের ফিলে স্টেক। দু'টোই সে সমানভাবে উপভোগ করে। যখন যেটার দরকার, চট করে ফোন করে দেয় জায়গা মত। পছন্দের জিনিস চলে আসে তার গেস্টহাউসে। অর্থের অভাব নেই, 'কোটিপতি' কথাটাও তার সম্পদের হিসেব দেবার ক্ষেত্রে তুচ্ছ। ডলারে নয়, তার সম্পত্তির হিসেব হয় পাউন্ড—স্টার্লিংয়ে। আজকের এই মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজারেও যার একটির মূল্য প্রায় দু'টি মার্কিন ডলারের সমান।

যে কোন ধনী এবং সফল মানুষের মত মার্কেরও তিনটি জীবন রয়েছে ; তার প্রকাশ্য এবং পেশাগত জীবন—যেখানে সে লণ্ডনের সফলতম ব্যবসায়ীদের একজন ; তার ব্যক্তিগত জীবন—যেটা পুরোপুরি ব্যক্তিগত নয়, কারণ কিছু কিছু লোক তাদের ব্যক্তিগত জীবনেও প্রচারের আলো চায় ; এবং তার গোপন জীবন।

মার্ক স্যান্ডারসনের পেশাগত জীবনের খবর প্রতিটি কাগজের অর্থনীতি পাতার এবং টিভি অনুষ্ঠানের বিষয়। পড়াশুনো বিশেষ হয়নি, তবে ব্যবসার মাথাটা বরাবরই ক্ষুরের মত ধারালো। ষাটের দশকের মাঝামাঝি লণ্ডনের ওয়েষ্ট এণ্ডে ছোটখাটো রিয়েল এস্টেট এজেন্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু। বছর দু'য়েকের মধ্যে নিয়মকানুন তার নখাগ্রে এসে গেল, এমনকি আইনসম্মতভাবে কীভাবে ওসব নিয়ম ভাঙ্গা যায়, শিখে গেল তাও। তেইশ বছর বয়সে প্রথম একা কাজ করলো, হাজার দশেক পাউন্ড লাভও হল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। তাই দিয়ে পত্তন হল হ্যামিলটন হোল্ডিং-এর। ষোলো বছর বাদে এটাই দাঁড়াল তার সম্পত্তির মূল উৎসে। মার্ক-এর প্রথম কাজ হ্যামিলটন টেরাস'য়ে অবস্থিত একটা বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করা। তাই নিজের কোম্পানির নাম রেখেছিল হ্যামিলটন হোল্ডিং। আবেগ জিনিসটা এই শেষ বারের মত তার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। সত্তর দশকের গোড়ায় ঘরবাড়ি বিক্রি ছেড়ে সে চলে আসে অফিস ব্লক তৈরির ব্যবসায়। ততদিনে তার এক মিলিয়ন পাউণ্ডের উপর রোজগার হয়ে গেছে। বছর পাঁচেক বাদে তার সম্পত্তি দাঁড়াল পাঁচ মিলিয়ন পাউণ্ডে। ব্যবসাও ছড়াতে শুরু করল। মহাজনী, ব্যাংকিং, রাসায়নিক,

হলিডে রিসার্ট খাতে হাত দেয়, তাই সোনা। কাগজে কাগজে তাকে নিয়ে খবর, তার ছবি। হ্যামিলটন হোল্ডিং-এর শেয়ারের দাম এখন আকাশ ছোঁয়া, তার অধীনে এখন গোটা দশেক বিভিন্ন বাণিজ্যিক গোষ্ঠী।

যে সব কাগজে অর্থনীতির পাতায় মার্কের পেশাগত জীবন নিয়ে খবর ছাপা হয়, তাতেই কয়েক পাতা আগে চোখ বুলোলে পাওয়া যাবে তার ব্যক্তিগত জীবনের খবর। গাড়ি বাড়ির খবর তো আছেই, প্রায়ই দেখা যায় অল্পবয়সী সব মেয়েদের সঙ্গে তার ছবি। মার্কের বিছানাটাও দেখার জিনিস, চার মিটার ব্যাসাধের গোলাকৃতি বিছানা। এইসব নিয়ে রগরগে কেচ্ছাও ছাপা হয়। তার সঙ্গিনীরা কেউ ফিল্মের তারকা, কেউ মিস ওয়ার্ল্ড। লোকে তাকে নিয়ে লেখা খবর পড়ে, মনে মনে তার প্রশংসাও করে। বিখ্যাত লোক হয়ে গেছে মার্ক স্যানডারসন।

কিন্তু গোপন জীবনটি তার পুরোপুরি আলাদা, বিচ্ছিন্ন। এককথায় এই জীবনের বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয়—একঘেঁয়ে। প্রচারের আলোয় থাকতে থাকতে মার্ক হাঁফিয়ে উঠেছে। এক সময় তার প্রিয় কথা ছিল, 'মার্ক যা চায় তাই পায়।' এখন সে কথাটা যেন একটা তেতো বিদ্রূপ হয়ে উঠেছে। উনচল্লিশ বছর বয়স হল। দেখতে এখনো দারুণ, লোকে বলে মার্লস ব্র্যান্ডোর সঙ্গে মিল রয়েছে। শারীরিকভাবে দারুণ ফিট। কিন্তু চরম নিঃসঙ্গ সে। এখন আর মার্ক শ'য়ে শ'য়ে মেয়ে চায় না, চায় একজনকে, শুধু একটি মেয়ে। সে মেয়েটি তার স্ত্রী হবে, তাদের সন্তান হবে, ঘর বলে একটা জায়গা থাকবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে এটাও জানে যে তার পছন্দমতো মেয়ে খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। কারণ এব্যাপারে তার নিজস্ব কিছু ধ্যান-ধারণা আছে এবং পছন্দ-মতো মেয়ে আজ পর্যন্ত সে একটিও খুঁজে পায়নি। মার্ক এমন মেয়ে চায় যে তাকে দেখে গলে পড়বে না। অন্তত তার বাইরের রূপ দেখে, তার টাকা, ক্ষমতা, খ্যাতি দেখে যে তার কাছে আসবে না। যে তার মনটাকে বোঝার চেষ্টা করবে, তাকেই বিয়ে করবে, এরকমই তার ইচ্ছা।

মনে মনে আশা ছেড়েই দিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎই গ্রীষ্মের গোড়ায় একটি মেয়েকে দেখে ফেলল মার্ক। একটা পার্টিতেই দেখা; মৃদু হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে শান্তভাবে একটি মোটা মত লোকের সঙ্গে কথা বলছিল সে। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না লোকটির কথা শুনতে তার আদৌ ভাল লাগছিল কিনা। লোকটি অবশ্য কথা বলতে বলতে আড়চোখে মেয়েটির বুকের খাঁজ দেখে যাচ্ছিল

মুহূর্মুহু। এমন সময় মার্কের আবির্ভাব। মেয়েটিকে দেখে নিজেই যেচে তার সঙ্গে আলাপ করল সে। মেয়েটির নাম অ্যাঞ্জেলা সামার্স। হ্যান্ডশেকের সময় দেখল নরম, সুডৌল হাতটি লম্বা, ঠান্ডা, নখ নিখুঁতভাবে রক্ষিত। আর এক হাতে পানীয়ের গ্লাস, মধ্যমায় একটি সরু সোনার আংটি। বিবাহিতা মহিলাদের প্রতি মার্কের একটা আসক্তি বরাবরই আছে, অতএব মোটা লোকটিকে সরিয়ে মেয়েটিকে আর এক কোণে নিয়ে গেল সে। মেয়েটি তাকে উত্তেজিত করেছে, সেটা অবশ্য অভূতপূর্ব কিছু নয়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল, মেয়েটিকে তার ভাল লাগছে।

মিসেস আমাসের্র চেহারাটি ঋজু, লম্বা। মুখখানা শান্ত, সুশ্রী, তবে খুব সুন্দরী বলা যায় না, চেহারাটি খুব নিখুঁত নয়, বুক দুটো গভীর, সরু কোমর, গুরু নিতম্ব, পা দুটি লম্বা লম্বা। মাথার চুল ঝুঁটি করে পিছনে টেনে বাঁধা, গায়ে অত্যন্ত সাধারণ সাদা পোষাক পরা, গয়নাগাটির কোন বালাই নেই। চোখের চারদিকে সামান্য একটু মেকআপ করা। কিন্তু এই অতি সাধারণ সাজসজ্জাই মেয়েটিকে উপস্থিত আর পাঁচজনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখেছিল। প্রথম দেখে মার্ক আন্দাজ করেছিল বয়স বছর তিরিশেক হবে, পরে শুনল বত্রিশ। মেয়েটি তার স্বামীকে নিয়ে স্পেনের উপকূলে একটি গ্রামে থাকে। অবস্থা ভাল নয়, স্বামীর রোজগার খুবই অল্প। স্বামী পাখিদের নিয়ে বই-টই লেখে। মেয়েটি নিজে একটি স্কুলে ইংরেজি পড়ায়। প্রথমে তাকে জন্মসূত্রে স্প্যানিশ মনে হলেও দেখা গেল সে ইংরেজ, মিডল্যান্ডসে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এখন লন্ডনে এক বন্ধুর বাড়িতে সপ্তাহখানেক থেকে আবার ফিরে যাবে। কথাবার্তায় মেয়েটি খুবই স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল, মার্ককে তোষামোদের ধারকাছ দিয়েও গেল না সে। মার্কের মজার কথায় হাসিতে ফেটেও পড়ল না, গোমড়া হয়েও রইল না। মেয়েটিকে ভাল লেগে গেল মার্কের।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পার্টির ব্যাপারস্যাপার দেখতে দেখতে কথা বলছিল তারা। মার্ক প্রশ্ন করল : 'আচ্ছা, আমাদের ওয়েস্ট এন্ড সোসাইটি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'খুব ভাল বোধহয় নয়',—মেয়েটি উত্তর দিল।

'ঠিক যেন আচারের শিশিতে কয়েকটা পোকা ঘুরছে', মার্কের গলায় হিসহিসে বিদ্রূপ।

মেয়েটি ভুরু তুলল, মৃদু হেসে বলল, 'আমার ধারণা মার্ক স্যান্ডারসন নিজেই এই সোসাইটির একটি স্তম্ভ।'

'আমাদের কাজকর্মের খবর কী স্পেনেও যায় নাকি?'

'হ্যাঁ, ডেইলি এক্সপ্রেস আমরা নিয়মিত পড়ি।'

'মার্ক স্যান্ডারসনের কাণ্ডকারখানাও পড়েন?'

'হ্যাঁ, পড়ি', শান্তভাবে মেয়েটি জবাব দেয়।

'ভাল লাগে পড়তে?'

'ভাল লাগা কী উচিৎ?'

'না।'

'তাহলে লাগে না?'

মেয়েটির উত্তরে মার্ক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'খুশি হলাম', সে বলল, 'কিন্তু প্রশ্ন করতে পারি কি কেন ভাল লাগে না?'

মেয়েটি খানিকক্ষণ চিন্তা করল, তারপর বলল, 'আসলে গোটা ব্যাপারটাই খুব কৃত্রিম।'

'এমনকি আমিও?'

সাদা পোষাকের নিচে মেয়েটির জোড়া স্তম্ভের উত্থান-পতন দেখছিল মার্ক। এমন সময় মেয়েটি মুখ তুলল, 'আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হয় একটু সুযোগ পেলে আপনিও বোধহয় স্বাভাবিক, সুন্দর হতে পারেন।'

মুখে আর কথা জোগাল না মার্কের। শুধু বলল, 'আপনার তো ভুলও হতে পারে।'

মেয়েটি আবার হাসল। প্রশ্রয়ের হাসি। যেন সে একটা দুরন্ত ছেলেকে শান্ত করছে। এমন সময়ে বন্ধুরা এসে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে গেল। পার্টি ছেড়ে যাবার পথে লবিতে মার্ক পরেরদিন রাত্রে মেয়েটিকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানাল। বহুদিন সে এমন আন্তরিকভাবে কাউকে চায়নি। মেয়েটি একটু চিন্তা করল, বলল, 'ঠিক আছে, আমার আপত্তি নেই।'

সেদিন সারারাত ধরে অ্যাঞ্জেলার কথাই ভাবল মার্ক। সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কল্পনার চোখে সে দেখতে পাচ্ছিল, তার বিছানায় তার পাশেই বালিশে মেলে রয়েছে ঝুঁটি বাঁধা বাদামী চুল, তার হাতের ছোঁয়ায় সাড়া দিচ্ছে নরম, সোনালী চামড়া। মেয়েটির সবকিছুর মধ্যেই একটা প্রশান্তি রয়েছে, ঘুমোয়ও নিশ্চয়ই শান্তশিষ্টভাবে। নাঃ, আর ভাবতে পারছে না,

ঘুম আসারও আর কোন সম্ভাবনা নেই। বিছানা থেকে উঠে পড়ে রান্নাঘরে গিয়ে কফি বানাল মার্ক, তারপর বসার ঘরে এসে নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ বসে কফি খেতে লাগল। ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে গিয়ে সূর্য যখন অরুণ আলোর রেশ ছড়াল, তখনো মার্ক একদৃষ্টিতে সামনের পার্কের গাছ-গুলোর দিকে তাকিয়ে।

একটা গোটা সপ্তাহ প্রেমের পক্ষে খুব বেশি সময় হয়তো নয়। তবে একটা জীবনের গতিপথ বদলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। অন্তত এখন মার্কের সেরকমই মনে হচ্ছে। পরের দিন যথাসময়ে অ্যাঞ্জেলা এল। মাথার চুল চূড়া করে মাথার উপর বাঁধা, পরনে কালো ম্যাক্সি-স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ। একটু পুরনো ফ্যাশনের পোষাক, কিন্তু মার্কের এটাই ভালো লাগছিল। খুব সাধারণ সব বিষয় নিয়ে কথা বলছিল অ্যাঞ্জেলা, কিন্তু কথাবার্তায় বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। মার্ক কোনদিন মেয়েদের সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে কোন কথা বলে না। কিন্তু সেদিন বলল, অ্যাঞ্জেলাও শুনল মন দিয়ে। ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে মার্ক উপলব্ধি করছিল যে অ্যাঞ্জেলার প্রতি-তার আকর্ষণ কোন সাময়িক বা শারীরিক আকর্ষণ নয়। সে অ্যাঞ্জেলার প্রেমে পড়েছে। অদ্ভুত এক শান্ত, অন্তলীন আত্মবিশ্বাস মেয়েটিকে জড়িয়ে আছে। সেই শান্তির ছোঁয়া মার্কেরও গায়ে লাগল। নিজের সর্বকিছুই সে ক্রমশ উজাড় করে দিতে লাগল এই সদ্যচেনা মেয়েটির কাছে—তার ব্যবসা, তার অর্থ, তার একাকীত্ব, যন্ত্রণা সবকিছু। মাঝরাতের পর রেস্তোরাঁ যখন বন্ধ হবার সময় হল, তখনো তারা কথা বলছে। মেয়েটিকে নিজের পেন্টহাউসে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিল মার্ক। সবিনয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল। তার জীবনে এরকম ঘটনা আর ঘটেছে কি না, মনে করতে পারল না মার্ক।

সপ্তাহের মাঝামাঝি এসে মার্ক মনে মনে স্বীকার করে নিল যে তার অবস্থা এখন প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া সতেরো বছরের উঠতি ছোকরাদের মত। অ্যাঞ্জেলাকে দারুণ এক বোতল পারফিউম উপহার দিল সে। তখন মে মাস। কনকনে ঠাণ্ডা। নিজের উরস্টারশায়ারের বাংলোয় টেলিফোন করে সুইমিং পুলের জলের উষ্ণতা বাড়িয়ে দিতে বলল মার্ক। তারপর শনিবার গাড়ি চালিয়ে সেখানে গিয়ে সারাদিন সাঁতার কাটল তারা। ড্রেসিংরুমে গিয়ে পোষাক বদলে অ্যাঞ্জেলা যখন ওয়ান-পিস স্যুইমস্যুট পরে তার সামনে হাজির হল, স্রেফ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মার্ক। মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হল,

মেয়েটার জবাব নেই।

পরদিন অ্যাঞ্জেলার স্পেন যাত্রা। ছাড়াছাড়ি হবার আগে শেষ সন্ধ্যাটায় মার্কের রোলস রয়েসে বসে দীর্ঘ সময় ধরে পরস্পরকে চুমু খেলো ওরা। কিন্তু যেই মার্কের হাতটা ওর ব্লকের নিচে এগোতে শুরু করল; আস্তে অথচ দৃঢ়ভাবে হাতটা সরিয়ে দিল অ্যাঞ্জেলা।

আর দেরি না করে বলে ফেলল মার্ক। অ্যাঞ্জেলা তার স্বামীকে ছেড়ে দিক, ডাইভোর্স হয়ে যাক। তারপর ওরা বিয়ে করবে। প্রস্তাবটা গভীর-ভাবে চিন্তা করল অ্যাঞ্জেলা। তারপর মাথা নাড়ল, 'না, তা করা যাবে না।'

'কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি। এটা মুখের কথা নয়, আমার কাছে এটাই এখন সবচেয়ে বড় সত্য।'

গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে অন্ধকার রাস্তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মেয়েটি। তারপর ধীরে স্বরে বলল, 'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি মার্ক। আমাদের এতদূর এগোনো উচিৎ হয়নি। ব্যাপারটা আমার আগেই বোঝা উচিৎ ছিল, তোমাকে থামানো উচিৎ ছিল।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো না? একটুও না?'

'এখনই সেটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তাড়াহুড়ো করে কিছু ভাবতে পারি না।'

'কিন্তু কোনদিন কী তুমি ভালোবাসবে? এখন? পরে কখনো?

আবার মাথা নিচু করলো অ্যাঞ্জেলা। চিন্তা করলো কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, সম্ভব। নিশ্চয়ই ভালোবাসা সম্ভব। তোমাকে যা ভাবা হয়, যে জন্য তোমার খ্যাতি, তা আদৌ নও তুমি। যাবতীয় পাগলামোর মোড়কের নিচে তুমি আসলে খুব নরম, ভঙ্গুর। এটাই তোমার সবচেয়ে সুন্দর জিনিস।'

'তাহলে স্বামীকে ছেড়ে দাও। আমাকে বিয়ে করো।'

'না, তা আমি করতে পারি না। আমি আর্চিকে বিয়ে করেছি। এখন দুম করে ওকে ছেড়ে দিতে পারি না।'

স্পেনে বসে থাকা এই অদেখা লোকটির প্রতি দুর্দমনীয় ক্রোধ অনুভব করল মার্ক। তার এবং অ্যাঞ্জেলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এই লোকটাই। জিজ্ঞেস করলো, 'ওর মধ্যে কী এমন আছে। যা আমার মধ্যে নেই?'

বিষণ্ণ হাসি হাসলো মেয়েটি, 'কিছুই নেই। আর্চি অত্যন্ত দুর্বল,

অক্ষম...'

'তাহলে ওকে ছাড়তে চাইছো না কেন?'

'কারণ ওর আমাকে ভীষণ প্রয়োজন।'

'আমারও তোমাকে প্রয়োজন।'

মাথা নাড়ল অ্যাঞ্জেলা, 'না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। তুমি আমাকে চাও ঠিকই, কিন্তু আমাকে না হলেও তোমার চলে যাবে। আর্চি তা পারবে না। তার সেই জোরই নেই।'

'অ্যাঞ্জেলা, আমি শুধু তোমাকে চাই না, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আগে কোনদিন আমি এভাবে কাউকে দেখিনি। আমি সত্যিই তোমাকে চাই।'

'তুমি বুঝতে পারছো না', ঈষৎ থেমে উত্তর দিল অ্যাঞ্জেলা, 'ভালোবাসা পেতে মেয়েরাও চায়। কিন্তু তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল প্রয়োজনীয়তা। আর্চির আমাকে ভীষণ দরকার, শ্বাস-প্রশ্বাসের মত দরকার।'

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ঠেসে গুঁজে দিল স্যাণ্ডারসন। মৃদুস্বরে বলল, 'তাহলে তুমি আর্চির সঙ্গেই থাকছো? একেবারে আমৃত্যু বন্ধন?'

রসিকতায় সাড়া দিল না অ্যাঞ্জেলা। সোজাসুজি মার্কের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, মার্ক। আমৃত্যু বন্ধনই বটে। আমি দুঃখিত, কিন্তু আমার স্বভাবটাই এরকম। যদি সময় অন্যরকম হত, যদি স্থান অন্যরকম হত, যদি আর্চিকে বিয়ে না করতাম, তাহলে হয়তো ব্যাপারটা অন্যরকম হতো। কিন্তু আমি বিবাহিতা, আর কিছু বলা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা এখানেই শেষ।'

পরের দিন অ্যাঞ্জেলা চলে গেল। স্যাণ্ডারসনের ড্রাইভার তাকে গাড়ি করে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়ে এলো।

ভালোবাসা, প্রয়োজন, ইচ্ছা এবং লালসা—এর প্রত্যেকটির মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু তফাৎ রয়েছে, ভিন্নতা রয়েছে। এর যে কোনটাই মানুষের মনের উপর চেপে বসতে পারে, তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে। মার্ক স্যাণ্ডারসনের মনে এখন চারটি অনুভূতিরই সমাহার। মে মাসে অ্যাঞ্জেলা চলে গেছে, জুন এসে গেল। অ্যাণ্ডারসনের একাকীত্ব এবং মানসিক চাপ, দুইই বাড়তে লাগল দ্রুতহারে। এর আগে কোন কিছুই তাকে এমন কুরে কুরে খায়নি। ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া মানুষ নৈতিক দিক দিয়ে ধীরে ধীরে পঙ্গু হয়ে যায়,

হতেই হয়, এটাই নিয়ম। মার্ক স্যান্ডারসনের ইচ্ছেগুলো ক্রমশঃ প্রতিজ্ঞায় বদলে যায়, তার পরে আসে ধারণা, পরিকল্পনা, কাজে নামা, এবং শেষ পর্যন্ত দখলদারি। অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে, যথাসম্ভব সংক্ষেপে কাজ সারার পক্ষপাতী মার্ক। গুণে সে মোটামুটি স্থির করে ফেলল, অ্যাঞ্জেলাকে তার চাই-ই। একটা কথাই সে মনে মনে ভূতে পাওয়া মানুষের মত আউড়ে যেতে লাগল—'আমৃত্যু বন্ধন'। আসলে মেয়েটাই যে অন্যরকম। ও যদি টাকা-পয়সা, বিলাসব্যসন, ক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদা এসব চাইত, তাহলে কোন সমস্যাই হত না। অবশ্য সেক্ষেত্রে মার্কেরও হয়তো তাকে ভালো লাগত না। এখন তার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা, প্রায় পাগলের মত অবস্থা তার। এ থেকে বেরোবার একটাই মাত্র উপায় আছে। মনে মনে স্থির করে ফেলল মার্ক।

টেলিফোনে যোগাযোগ করে একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করে ফেলল মার্ক। মাইকেল জনসন নাম নিয়ে। এক মাসের ভাড়াও অগ্রিম দিয়ে দিল রেজিস্টার্ড পোস্টে। বাড়িওলাকে চিঠিতে বলে দিল লণ্ডনে সে ভোরবেলা যায় সাধারণত, কাজেই চাবি যেন দরজার ম্যাটের তলায় রেখে দেওয়া হয়।

এই ফ্ল্যাটটিকে ভিত্তি করে কাজ শুরু করল সে। এক বেসরকারি গোয়েন্দা সংস্থাকে টেলিফোন করে জানাল সে কী চায়। মক্কেল নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চায় শুনে সংস্থাটি টাকা অগ্রিম চাইল। সঙ্গে সঙ্গে নগদে ৫০০ পাউণ্ড পাঠিয়ে দিল মার্ক।

এক সপ্তাহ বাদে মিঃ জনসনের নামে একটা চিঠি এল। সংস্থা তদন্ত শেষ করেছে, আরো ২৫০ পাউণ্ড লাগবে। টাকাটা পাঠিয়ে দিল মার্ক তিন দিন বাদেই যা চাইছিল, তা পেয়ে গেল হাতে। যাবতীয় তথ্য এক জায়গায় করা। ফাইলের ভিতরে সংক্ষিপ্ত জীবনী, বই থেকে কপি করা ফোটোগ্রাফ এবং টেলিফোটো লেন্সে দূর থেকে তোলা বেশ কিছু ফোটো। ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক বেঁটেখাটো, সরু কাঁধ, ঝাঁটাগোঁফওলা ব্যক্তিকে। নাম মেজর আর্চিবল্ড ক্ল্যারেন্স সামার্স। দেশত্যাগী প্রাক্তন ব্রিটিশ অফিসার, অবশ্য দেখে একেবারে তা মনে হয় না। স্পেনের আলিকান্তে প্রদেশে সমুদ্রোপকূলের এক অতি নগণ্য গ্রামে বর্তমানে সস্ত্রীক বাস করেন। বাড়িটির কয়েকটি ছবিও রয়েছে ফাইলে। পরিশেষে মেজরের জীবনযাপনের ধারার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মেজরের স্ত্রী বিকেল তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত সমুদ্রে সাঁতার কাটতে যান। সেই সময়টা মেজর পাখিদের

নিয়ে লেখালিখি করেন। বর্তমানে তিনি পেশায় পক্ষীবিশারদ।

সব ভালোভাবে পড়ল মার্ক। তারপর নিজের অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিল সে কয়েকদিন বাড়ির বাইরে থাকবে, তবে ফোনে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে।

এবার নিজের চেহারা বদলানোর পালা। গেল এক হেয়ারড্রেসারের কাছে। সে মার্কের চুল একেবারে কদমছাট করে দিল, তারপর চুলের কালো রং বদলে করে দিল সোনালী। প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল কাজটা সারতে। তবে কাজ যা হল, সপ্তাহদুয়েক আর কোন চিন্তা নেই। হেয়ারড্রেসার নিজেই কাজে খুশি হয়ে শিস্ দিতে লাগল।

এবার মার্ক যোগাযোগ করল লণ্ডনের এক বড় গ্রন্থাগারের সঙ্গে। সমকালীন ঘটনা ও তথ্য সম্পর্কে এদের বিশেষ বিভাগ রয়েছে। রয়েছে খবরের কাগজ ও পত্রিকার কাটিং। ঠিক তিন দিন বাদে মাইকেল জনসনের নামে রিডিং লাইব্রেরীর কার্ড ইস্যু হল।'

'ভাড়াটে খুনী' বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা শুরু করল মার্ক। বহু নাম, বহু ফাইল, সাব-ফাইল, সূচীপত্র। কিছু রয়েছে নাম ধরে- যেমন মাইক হোর, রবার্ট ডেনার্ড, জন পিটার্স, জাক্ শ্ক্র্যাম ইত্যাদি। আবার কিছু রয়েছে দেশের নাম ধরে, যেমন, কাটাঙ্গা, কঙ্গো, ইয়েমেন, নাইজেরিয়া, রোডেশিয়া (বর্তমানে জিম্বাবুয়ে), অ্যাঙ্গোলা ইত্যাদি। সব চষে ফেলল মার্ক। ভাড়াটে খুনীদের সম্পর্কে যাবতীয় সংবাদ, পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধ, মন্তব্য, বাইয়ের সমালোচনা, সাক্ষাৎকার সব পড়ে ফেলল। যখন কোন বইয়ের নাম দেখে, সঙ্গে সঙ্গে তা কাগজে টুকে নেয়। তারপর সাধারণ গ্রন্থাগারে গিয়ে, বইটি তুলে মন দিয়ে পড়ে।

প্রায় সপ্তাহখানেক পরিশ্রম করার পর একটা নাম ধীরে ধীরে তার মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করল। লোকটির তিনটি কাজের বিবরণ সে এখনো পর্যন্ত পেয়েছে। খুব দুঃসাহসী লেখকরাও এর সম্বন্ধে রেখেঢেকে কথা বলেছেন। যে কোন সাক্ষাৎকার দেয়নি, কোন ফাইলে তার কোন ছবি নেই। জাতে ইংরেজ, স্যাণ্ডারসন মনে মনে আঁচ করে নিল, এখন হয়তো তাকে লণ্ডনে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারল, একটি লোক বই-টই লেখে। তার ব্যক্তিগত ঠিকানাও জোগাড় হল। তার সঙ্গে নাকি ভাড়াটে খুনীদের আলাপ পরিচয় আছে।

এক প্রকাশনার প্রতিনিধি হিসেবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করল মার্ক। কিন্তু গিয়ে হতাশ হল। লোকটি আগে এসব কাজ করলেও এখন পুরোপুরি পানাশক্ত, অশক্ত এবং অতীতের স্মৃতিচারণ করেই তার দিন কাটে। মার্ককে দেখে সে প্রথমে ভাবল তার কোন বই আবার প্রকাশিত হবার ব্যাপারেই কথাবার্তা বলতে এসেছে। কিন্তু তা নয় শুনে হতাশ হল। সময় বুঝে মার্ক তাকে জানাল, কিছু খবর-টবর দিলে কিছু টাকা রোজগার হবে তার।

ছ' পেগ হুইস্কি শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলল না লোকটি। তার হাতের মুঠোয় একটা নোটের বাণ্ডিল গুঁজে দিল মার্ক। একটা কাগজের টুকরোয় নাম এবং ক্লাবের ঠিকানা লিখে দিল লোকটি। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সেখানেই পাওয়া যাবে।

সন্ধ্যায় স্যাণ্ডারসন সেই ক্লাবে গেল। আর্ল'স কোর্টের পিছনে চুপচাপ একটা জায়গায় ক্লাবটা। প্রথম দিন সন্ধ্যায় কারুর দেখা মিলল না। দ্বিতীয় দিন লোকটি এল। অ্যাণ্ডারসন এর কোন ছবি দেখেনি। তবে লাইব্রেরীতে চেহারার বর্ণনা যা পড়েছে, তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। এমনকি চোয়ালে কাটা দাগটা পর্যন্ত। বারম্যাল লোকটাকে যে নামে ডেকে অভ্যর্থনা জানাল, মিলে গেল সেটাও। লোকটির শক্তপোক্ত চেহারা, চওড়া কাঁধ, দারুন তীক্ষ্ম চেহারা। সামনে রাখা আয়নায় স্যাণ্ডারসন দেখতে পেল, লোকটি চুপচাপ বিয়ার খেয়ে চলেছে। অবশেষে বিয়ার খেয়ে যে যখন বেরোল, স্যাণ্ডারসন অনুসরণ করল তাকে। চারশ' গজ মত হেঁটে লোকটি ফ্ল্যাটবাড়িতে ঢুকে পড়ল।

মিনিট দশেক বাদে স্যাণ্ডারসন লোকটির ঘরের দরজায় টোকা মারল, একঘরের ফ্ল্যাট। কালো রং-এর পোশাক পরে দরজা খুলল লোকটি। স্যাণ্ডারসন লক্ষ্য করল, দরজা খোলার আগে লোকটি ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। দরজা খুলে নিজে দাঁড়াল আড়ালে। করিডরের আলোটা স্থির হয়ে পড়ল স্যাণ্ডারসনের গায়ে।

'মিঃ হিউজেস ?' স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞাসা করল।

লোকটি ভুরু তুলল, 'আপনার নাম কি ?'

'আমার নাম জনসন, মাইকেল জনসন।'

'বাড়ি কোথায় ?'

'কাছাকাছি-ই, এখানকারই নাগরিক। ভেতরে আসতে পারি ?'

প্রশ্নটায় গুরুত্বই দিল না হিউজেস। বলল, 'আপনাকে কে বলল আমাকে এখানে পাওয়া যাবে?'

স্যাণ্ডারসন নামটা বলল। সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, 'অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টা বাদেই এসব আর তার মনে থাকবে না। একেবারে বেহেড ছিল।'

লোকটির ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা খেলে গেল। মাথা ঝাঁকিয়ে স্যাণ্ডারসনকে ভিতরে আসতে ইশারা করল সে। বসার ঘরে ঢুকল তারা। আসবাবপত্রগুলোকে অপরিষ্কারই বলা যায়। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল আর গোটাকয়েক চেয়ার রয়েছে। হিউজেস সেখানে বসতে ইঙ্গিত করল স্যাণ্ডারসনকে। বলল স্যাণ্ডারসন, উল্টোদিকে একটা চেয়ারে বসল হিউজেস নিজে। তারপর বলল, 'হ্যাঁ বলুন কী ব্যাপার?'

'একটা কাজ করাতে চাই। কনট্রাক্টে। একটু আঘাতের ব্যাপার আছে।'

হিউজেস একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। মুখের ভাব একটুকু বদলাল না।

'আপনি গান শুনতে ভালবাসেন?' হঠাৎই প্রশ্ন করল হিউজেস। স্যাণ্ডারসন থতমত খেয়ে গেল প্রথমে, তারপর মাথা নাড়ল।

'একটু গান শোনা যাক', হিউজেস বলল। ঘরের কোণে একটা বিছানা পাতা। তার পাশে টেবিলের উপর একটা বহনযোগ্য রেডিও রাখা রয়েছে। সেটা চালু করতে করতে বিছানার বালিশের নিচে হাত ঢোকাল হিউজেস। যখন ঘুরে দাঁড়াল, তার হাতে উঠে এসেছে একটা কোল্ট '৪৫ অটোমেটিক। স্যাণ্ডারসন ঢোঁক গিলল। রেডিওর মিউজিক আরো জোরে করে দিল হিউজেস। তারপর বিছানার পাশে ড্রয়ারে হাত ঢুকিয়ে একটা নোটপ্যাড আর পেন্সিল বার করে টেবিলে দিয়ে গেল। কাজগুলো করতে করতেও কোল্টের নল কিন্তু স্যাণ্ডারসনের দিকেই তাক করা আছে। এক হাতে কাগজের উপর মাত্র দু'টো শব্দ লিখে সে স্যাণ্ডারসনের দিকে এগিয়ে দিল। তাতে লেখা আছে, 'পোশাক খুলুন।'

স্যাণ্ডারসনের পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠল। সে জানে এধরনের লোকেরা ভয়ংকর হয়। হিউজেস ততক্ষণে রিভলবার দিয়ে স্যাণ্ডারসনকে ইশারা করছে টেবিল ছেড়ে উঠতে। উঠল সে, জ্যাকেট খুলল, টাই খুলল, জামা খুলল। আবার বন্দুকের ইশারা, এবার নিচের দিকে। প্যান্ট খুলে ফেলল স্যাণ্ডারসন। নির্বিকারভাবে সব দেখল হিউজেস। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, জামা-কাপড় পরে ফেলুন।' বন্দুকটা তখনো তার হাতেই রয়েছে, তবে নলটা নিচের

দিকে নেমেছে। আবার কোণে গিয়ে মিউজিকটা আস্তে করে দিল। তারপর টেবিলে ফিরে এসে বসল। বলল, 'জ্যাকেটটা দিন।'

স্যান্ডারসন ততক্ষণে প্যান্ট-জামা পরে ফেলেছে। জ্যাকেটটা সে হিউজেসকে দিল। ভাল করে থাবড়ে থাবড়ে জ্যাকেটটা পরখ করল হিউজেস। তারপর ফেরৎ দিয়ে বলল, 'নিন পরে নিন।'

জ্যাকেটটা পরে নিল স্যান্ডারসন। তারপর ধপ্ করে বসে পড়ল চেয়ারে। উল্টোদিকেই হিউজেস বসে। কোল্ট অটোমেটিকটা টেবিলে তার ডান হাতের কাছেই রাখা। একটা সিগারেট ধরালো সে।

'এসবের অর্থ কী?' স্যান্ডারসন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী ভেবেছিলে আমি সশস্ত্র?'

'না, তা ভাবিনি, তবে আপনার গায়ে তার জড়িয়ে ছোট টেপ বা মাইক্রোফোন লাগানো থাকতে পারত। যদি থাকত, ওই তার আর মাইক আপনার অণ্ডকোষে বেঁধে রেকর্ডিংটা আপনার নিয়োগকারীকে শুনিয়ে দিতাম।'

'ও! এই ব্যাপার', স্যান্ডারসন বলল,'না না, তার, টেপরেকর্ডার এসব কিছু নয়। আমার কোন নিয়োগকারীও নেই। আমি নিজেই নিজের নিয়োগকারী। কখনো অন্যদেরও চাকরি দিই। যাক্‌গে, ঘটনা হল, আমার একটা কাজ করতে হবে, সেজন্য টাকাও দেব। তবে কাজটা করতে হবে গোপনে।'

'আমার আরো কিছু জানার আছে। হিউজেস বলল, 'এখানে তো আরো অনেক ভাড়াটে খুনী আছে আপনি আমার কাছে বেছে বেছে এলেন কেন?'

'আমি তোমাকে নিয়োগ করতে আসিনি, 'স্যান্ডারসন নির্বিকার ভাবে বলল। আবার ভুরু তুলল হিউজেস। কিন্তু স্যান্ডারসন বলে চলল, 'ব্রিটেনে থাকে, বা এখানে যোগাযোগ আছে, এমন কাউকেই আমি চাই না। কাজটা করতে হবে বিদেশে, আমি চাইও একজন বিদেশী। আমি তোমার কাছে একটা উপযুক্ত নাম চাই। অবশ্য সে জন্য তুমি যে টাকা চাইবে, তা আমি দেব।'

ভিতরের পকেট থেকে পঞ্চাশটা কড়কড়ে ২০ পাউন্ডের নোট বের করল মার্ক। তারপর সেগুলো টেবিলে রাখল। চুপচাপ সেগুলো দেখলো হিউজেস। বাণ্ডিলটাকে দু'ভাগ করে এক ভাগ হিউজেসের দিকে ঠেলে দিল স্যান্ডারসন। বাকিটা নিজের পকেটে রাখল। বলল, 'চেষ্টা করার জন্য ৫০০ পাউন্ড। সফল হলে বাকিটা পাবে। তবে তার আগে সেই 'নাম'-কে আমার সঙ্গে দেখা করে আমার কাজে রাজি হতে হবে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কাজটা তেমন জটিল

কিছু নয়। আমার লক্ষ্যবস্তু নামকরা কেউ নয়, এবং একেবারেই সাধারণ।'

পড়ে থাকা ৫00 পাউন্ড তখনো তোলেনি হিউজেস। বলল, 'একটা লোককে জানি। বেশ কয়েক বছর আগে আমার সঙ্গে কাজ করেছিল। এখনো কাজ করে কিনা জানিনা। খোঁজ করে দেখতে হবে।'

'ফোন করে দেখো, 'স্যান্ডারসন বলল। মাথা নাড়ল হিউজেস, "আন্তর্জাতিক ফোন লাইনগুলো আমার পছন্দ নয়। ভীষণ ট্যাপ করা হয় ওগুলো। বিশেষত ইউরোপে, ওর সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে হবে। এতে আরো দুশ 'পাউন্ড মত খরচ পড়বে।'

'ঠিক আছে', 'বলল স্যান্ডারসন, 'নাম পেলেই দিয়ে দেবো।'

'কিন্তু আমি জানব কী করে যে আপনি আমায় ঠকাচ্ছেন না?' জিজ্ঞাসা করল হিউজেস।

'জানার দরকার নেই', বলল স্যান্ডারসন, 'আমি তোমাকে ঠকাতে যাবো কেন, তাহলেই তো তুমি আমার পিছনে লাগবে। তার কোন প্রয়োজন আমার নেই। অন্তত সাতশ' পাউন্ডের জন্য তো নয়ই।'

'আপনি জানছেন কী করে যে আমি আপনাকে ঠকাবো না?'

'তাও আমি জানি না। তবে কাউকে না কাউকে তো খুঁজে পাবো নিশ্চয়ই। তাকে তখন একটার জায়গায় দু'জনকে খুন করার কাজ দেব। সেটুকু বহন করার মত পয়সাকড়ি আমার আছে। আমি ঠকতে পছন্দ করি না। এটাই আমার নীতি।'

প্রায় দশ সেকেন্ড ধরে দু'জোড়া চোখ পরস্পরকে চেয়ে দেখল অপলক দৃষ্টিতে। মনে মনে ভাবল স্যান্ডারসন, বোধহয় একটু বেশি কথা বলে ফেলেছে সে। কিন্তু অবশেষে হিউজেস হাসল, বেশ খোলামেলা, প্রশংসামিশ্রিত হাসি। তারপর ৫00 পাউন্ড তুলে নিল হাতে।

'আপনি নাম পেয়ে যাবেন' সে বলল, 'অসুবিধা হবে না। নাম পেলে এবং রফা হয়ে গেলে বাকি পাঁচশ' এবং খরচ-খরচা বাবদ দুশ' পাউন্ড ডাক মারফৎ পাঠিয়ে দেবেন। টাকাটা পাঠাবেন হারগ্রিভস-এর নামে, আর্লস কোর্ট পোস্টাপিসে। রেজিস্ট্রি করবেন না, সাধারণ খামে, ভাল করে মুখ এঁটে পাঠাবেন। খবর পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে যদি টাকা না আসে, ধরে নেওয়া হবে আপনার অন্য কোন মতলব আছে। সেক্ষেত্রে 'নাম' অদৃশ্য হয়ে যাবে। ঠিক আছে?'

স্যাণ্ডারসন ইতিবাচক মাথা নাড়ল। 'কতদিনের মধ্যে নামটা পাব ?'

'ধর্‌ন, সপ্তাহখানেক', হিউজেস বলল, ''আপনার সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ করব ?'

'দরকার নেই বলল স্যাণ্ডারসন, 'আমিই যোগাযোগ করে নেবো।'

'ঠিক আছে। যে বারে আমাকে দেখছিলেন, সেই বারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

ঠিক এক সপ্তাহ বাদে ফোন করল স্যাণ্ডারসন। প্রথমে বারম্যান ফোন ধরল, তারপর হিউজেস এল লাইনে।

'প্যারিসে র্‌্য মিওল্যাঁ-তে একটা কাফে আছে। আপনি যে ধরনের লোক চাইছেন সেরকম অনেকে সেখানে আসে। হিউজেস বলল, "আগামী সোমবার দ্‌প্‌রে সেখানে যাবেন। লোকটিই আপনাকে চিনে নেবে, সেদিনের 'ফিগারো' পত্রিকাটা পড়বেন। এমনভাবে পড়বেন যাতে খবরের হেডলাইনটা ঘরের দিকে ম্‌খ করে থাকে। লোকটি আপনাকে জনসন বলে ডাকবে। তারপর আপনার হাতযশ। সোমবার যদি না যেতে পারেন। মঙ্গলবার এবং ব্‌ধবার দ্‌প্‌রেও লোকটি থাকবে। তারপর কিন্ত্‌ গোটা ব্যাপারটাই ভেস্তে যাবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে যাবেন কিন্ত্‌।'

'কত ?' স্যাণ্ডারসন জিজ্ঞেস করল।

'ধর্‌ন, হাজার পাঁচেক পাউণ্ড। ম্‌নে হয় তাতে হয়ে যাবে।'

'ঠকানোর কোন ব্যাপার নেই তো ?'

'না। লোকটি তো আর জানবে না। আপনার বডিগার্ড কেউ গোপনে ঘাপটি মেরে আছে কিনা বারের কোথাও ?' ক্লিক করে একটা আওয়াজ হল। বন্ধ হয়ে গেল ফোনটা।

পরের সোমবার বেলা বারোটা পাঁচে র্‌্য দ্য মিওল্যাঁ-তে বসে সেদিনের 'ফিগারো' পত্রিকার পিছনের পাতাটা পড়ছিল স্যাণ্ডারসন। দেওয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে আরাম করে বসেছিল সে। তার সামনের চেয়ারটা টেনে একটা লোক বসে পড়ল। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে, কিন্ত্‌ সে ওই বারে রয়েছে।

'ম'সিয়ো জনসন ?'

কাগজটা নামাল মার্ক', ভাঁজ করে পাশে রাখল। লোকটা বেশ লম্বা, কালো চুল, চোখের মণিও কালো, লম্বাটে চোয়াল। লোকটা কর্সি'কান। প্রায় আধঘণ্টা কথাবার্তা বলল তারা। কর্সি'কান তার নাম বলল ক্যালভি, আসলে

সেটা তার জন্মস্থানের নাম। মিনিট কুড়ি পর স্যাণ্ডারসন তার হাতে দু'টো ছবি দিল। একটা ছবি এক ভদ্রলোকের মুখের, ছবির পিছনে টাইপ করে লেখা আছে ঃ 'মেজর আর্চি সামার্স', ভিলা সান ক্রিসপিন, প্লায়া ক্যালডেরা, অনডারা, আলিকান্তে।' অপর ছবিটি সাদা রং করা একটি ছোট বাড়ির। সামনে সবুজে-হলুদে মেশানো বড় গেট। কর্সিকান ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

'কাজটা সারতে হবে কিন্তু ঠিক বিকেল তিনটে থেকে চারটের মধ্যে, 'বলল মার্ক'। আবার মাথা নাড়ল কর্সিকান, 'ঠিক আছে অসুবিধা নেই।'

টাকা পয়সার ব্যাপারে আরো দশ মিনিট কথা বলল তারা, তারপর স্যাণ্ডারসন তাকে পাঁচটি নোটের বাণ্ডিল দিল। প্রত্যেকটায় ৫00 পাউণ্ড করে রয়েছে। কর্সিকানের বক্তব্য, বিদেশে কাজ করা খুব খরচের ব্যাপার। বিশেষত স্পেনের পুলিশ মাঝে মাঝে খুব খারাপ আচরণ করে। অবশেষে স্যাণ্ডারসন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

'কতদিন লাগবে কাজটা সারতে ?' সে প্রশ্ন করল।

চোখ তুলে কাঁধ ঝাঁকাল কর্সিকান, 'এক, দুই, বড় জোর সপ্তাহ তিনেক।'

'যে মুহূর্তে কাজটা সাঙ্গ হবে, আমাকে জানাতে হবে, ঠিক আছে ?'

'তাহলে যোগাযোগ করার একটা রাস্তা বলুন, 'বলল কর্সিকান।

একটা কাগজের টুকরোয় একটা নম্বর লিখে দিল স্যাণ্ডারসন। বলল, 'এক সপ্তাহ পর থেকে এবং তার পরের তিন সপ্তাহ ধরে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে লণ্ডনের এই নম্বরে টেলিফোন করলে আমাকে পাবে। তবে খোঁজ করার কোন চেষ্টা কোরো না। আর হ্যাঁ ! কাজে ব্যর্থ কোনমতেই হবে না।'

মৃদু হাসল কর্সিকান, বলল 'ব্যর্থ আমি হই না। হবও না, টাকার বাকি অংশটাও আমার প্রয়োজন যে ?'

'আর একটা কথা', 'বলল মার্ক', 'কাজের কোন চিহ্ন যেন না থাকে। আমি যেন কোন ভাবেই জড়িয়ে না পড়ি। কাজটা দেখে যেন মনে হয় ডাকাতি করতে গিয়ে দুর্ঘটনাক্রমে ঘটনাটা ঘটে গেছে।'

তখনো কর্সিকানের মুখে হাসি, 'মঁসিয়ো জনসন, আপনি তো কেবল আপনার সুনাম নিয়েই চিন্তিত। আমাকে তো আমার প্রাণ নিয়ে ভাবতে হবে। প্রাণ থাকলেও কমসে কম তিরিশ বছরের জেল। ভয় নেই, কোন চিহ্ন থাকবে না, কেউ আপনাকে ছুঁতে পারবে না।'

স্যাণ্ডারসন চলে যাবার পর ক্যালভিও বেরিয়ে এলো কাফে থেকে। ভালো করে পরখ করে দেখে নিল কেউ তার পিছু নিয়েছে কি না। তারপর আরেকটা কাফেতে ঢুকে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক কাটালো। মনে মনে আসন্ন কাজের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করছিল সে। এমনিতে কাজটা তেমন শক্ত কিছু নয়, একটা লোককে গুলি করে মারতে হবে, তাও লোকটি নিজে এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করে না। সমস্যাটা অন্য জায়গায়, বন্দুকটা নিরাপদে স্পেনে নিয়ে যাওয়াটা একটা সমস্যা। ট্রেনে প্যারিস থেকে বার্সিলোনায় এটাকে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু কাস্টমস্ চেকিং হবেই। ফরাসি পুলিশ হয়তো তেমন কিছু বলবে না, কিন্তু পেশাদার বন্দুকবাজদের প্রতি স্পেনের পুলিশের মনোভাব একেবারে অসাধুনিক। প্লেনে তো যাওয়াই যাবে না, কারণ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বেড়ে যাবার পর ওরলি-তে প্রত্যেকটি যাত্রীকে নিখুঁতভাবে তল্লাসি করা হয়। স্পেনে তার চেনাজানা লাইনের লোক রয়েছে। তারা আলিকান্তে এবং ভ্যালেনসিয়ার মধ্যে উপকুল অঞ্চল ধরেই থাকে। পুরনো ও এ এস সঙ্গী ফ্রান্সে ফেরার ঝুঁকি তারা আর নেয়নি। চাইলে তাদের কাছে একটা বন্দুক নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তবে এদের হাতে কাজ-কর্ম নেই, কাজেই পাঁচজন এক জায়গায় হলে গালগল্প করবে, কথা ছড়াবে। তাই এদের এড়ানোর সিদ্ধান্তই নিল ক্যালভি।

খানিক বাদে সে উঠে পড়ল। বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। একটা স্প্যানিস ভ্রমণ সংস্থায় আধঘণ্টা মত কাটিয়ে আরো দশ মিনিট কাটাল আইবেরিয়া এয়ার লাইনসের অফিসে। তারপর রু্য দ্য রিভোলিতে একটা বইয়ের দোকান আর একটা মণিহারি দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করে ফিরে গেল তার নিজের ফ্ল্যাটে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলাই সে ফোন করল ভ্যালেনসিয়ার সেরা হোটেল মেট্রোপোল-এ। সেখানে পনেরো দিন বাদে এক রাতের জন্য দুটো সিঙ্গেল রুম ভাড়া করল। একটা ঘর বুক করল ক্যালভি-র নামে, অপরটা তার নিজের পাসপোর্টে দেওয়া নামে। কথা দিল, সে তার লিখিত স্বীকৃতিপত্র যতদূর সম্ভব পাঠিয়ে দিচ্ছে। তারপর প্যারিস থেকে ভ্যালেনসিয়া যাওয়া এবং ফিরে আসার বিমানের টিকিটও বুক করে ফেলল টেলিফোনেই। বিমানটি ভ্যালেনসিয়া পেঁছবে যেদিন হোটেল বুক করা হয়েছে সেদিন সন্ধ্যায়। আবার পরের দিন সন্ধ্যাবেলা প্যারিসে ফিরে আসবে।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে সঙ্গে সঙ্গে হোটেল মেট্রোপোলকে চিঠি লিখে বুকিং নিশ্চিত করল ক্যালভি। সংক্ষিপ্ত চিঠিতে সে আরো জানাল, এই চিঠির স্বাক্ষরকারী এস ক্যালভি ভ্যালেনসিয়া পৌঁছনোর আগে বেশ কিছু জায়গা ঘুরবেন। তিনি স্পেনের ইতিহাস সংক্রান্ত একটি বইয়ের অর্ডার দিয়েছেন প্যারিসে। বইটি হোটেল মেট্রোপোলের ঠিকানায় তাঁর কাছে পাঠানো হবে। তাই মেট্রোপোল কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর অনুরোধ তিনি না পৌঁছানো পর্যন্ত হোটেল কর্তৃপক্ষ যেন বইটি তাঁদের হেফাজতে রাখেন।

ক্যালভি মনে মনে ভেবে নিল যে বইটি যদি ধরা পড়ে এবং খোলা হয়, তাহলে যে মুহূর্তে সে তার আসল নামে বইটি চাইবে। তখনই হোটেল ক্লার্কের মুখের অভিব্যক্তিতে বোঝা যাবে গোলমাল কিছু হয়েছে কিনা। তখন সে পালাবার সুযোগ পাবে। যদি ধরাও পড়ে, তখন সে নিরীহ সাজবে। বলবে এক বন্ধুর কথামত বইটা নিতে এসেছিল। বন্ধুর নাম এস ক্যালভি। ক্যালভির যে এর ভিতর অন্য কোন মতলব রয়েছে, এটা স্বপ্নেও ভাবেনি।

চিঠিটা লিখে সই করে, মুখ এঁটে, স্ট্যাম্প লাগিয়ে ফেলে দিল ডাকবাক্সে। তারপর সেদিন বিকেলে কেনা বইটা নিয়ে কাজ করতে বসল। বইটা স্পেনের ইতিহাসের উপর, বেশ দামি, ভারিও বটে। দামি কাগজে ছাপা, অনেক ছবিও দেওয়া রয়েছে। ফলে বইয়ের ওজন আরো বেড়েছে।

বইয়ের শক্ত মলাট দু'টো পিছনে মুড়ে একসাথে একটা স্থিতিস্থাপক ব্যান্ড দিয়ে এঁটে দিল সে। মাঝের ৪০০ পাতাকে রান্নাঘরের টেবিলের ধারে একটা ব্লকের মত করে চেপে ধরল। বইটা দু'টো ছুতোরের আংটা দিয়ে আটকে নিল ভাল করে। তারপর সেদিন বিকেলেই কেনা একটা অতি ধারালো ছুরি দিয়ে বইয়ের পাতার মাঝখানে কাটতে শুরু করল। প্রায় ঘণ্টাখানেক কাজ করার পর পাতার প্রত্যেক ধার থেকে ইঞ্চি দেড়েক দূরত্বে বইয়ের মাঝখানে একটা চৌকো গর্তের সৃষ্টি হল। লম্বায় ৭ ইঞ্চি, চওড়ায় ৬ ইঞ্চি, গভীরতায় ৩ ইঞ্চি। এই গর্তের মাঝখানে ভাল করে লাগিয়ে দিল আঠা। যতক্ষণ আঠাটা শুকোল ততক্ষণে দু'টো সিগারেট টেনে নিল। আঠাটা যখন শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেল। তখন দেখা গেল ঐ ৪০০ পাতা আর কোনদিনই খুলবে না।

এবারে কাটা কাগজের টুকরোগুলো রান্নাঘরে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করল ক্যালভি। দেড় পাউন্ড মত ওজন হল। সেই অনুযায়ী বইয়ের গর্তের ঠিক মাপে মাপে একটা ফোম রবারের টুকরো কেটে নিয়ে সেটা বইতে লাগিয়ে দিল।

তারপর বের করল তার ছোট্ট ৯ মিঃ মিঃ ব্রাউনিং অটোমেটিকটা। জিনিসটা মাসদুয়েক আগে বেলজিয়ামে গিয়ে সংগ্রহ করা। আগে ব্যবহার করত কোল্ট '৩৮। একটা কাজের পর সেটা অ্যালবার্ট ক্যানালে ফেলে দিয়েছে। ক্যালভি সতর্ক লোক, সাধারণত একটা বন্দুক দু'বার ব্যবহার করে না। ব্রাউনিং-এর নলের উপরটা আধ ইঞ্চি মত বাইরে বেরিয়ে সেখানে সাইলেন্সার লাগানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

টেলিভিশন থ্রিলারের শব্দগ্রাহকরা যাই বলুক না কেন, একটা অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্রে সাইলেন্সার কখনোই পুরোপুরি কাজ করে না। অটোমেটিকের ব্রিচ রিভলভারের মত চাপা নয়। তাই অটোমেটিকের বুলেট যখন নল দিয়ে বেরোয়, তার জ্যাকেটটা জোরে পিছিয়ে এসে শূন্য কার্তুজটা সরিয়ে দেয় এবং নতুন গুলি ভরে দেয়। এজন্যই এদের অটোমেটিক বলা হয়। কিন্তু শূন্য কার্তুজের খোলটা সরিয়ে ফেলতে যে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় লাগে, তাতেই খোলা ব্রিচের মাধ্যমে বিস্ফোরণের শব্দ অর্ধেক বেরিয়ে যায়। এই জন্যেই অটোমেটিকে সাইলেন্সার মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ কার্যকর হয়। ক্যালভিরও রিভলভারই পছন্দ, তাহলে কোন আওয়াজ হত না, কিন্তু বইয়ের গর্তে ঢোকাতে গেলে এবড়ো-খেবড়ো বন্দুক হলে চলবে না, সমান হতে হবে।

ব্রাউনিংটা বইয়ের গর্তে শুইয়ে পাশে রাখল সাইলেন্সারটা। দেখা গেল, তার অস্ত্রের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় অংশ প্রায় সাড়ে ছ'ইঞ্চি লম্বা। পেশাদার হিসেবে ক্যালভি জানে টেলিভিশনে শ্যাম্পেনের ছিপির সাইজের যেসব সাইলেন্সার দেখানো হয়, তার কার্যকারিতা নগণ্য। ভিসুভিয়াস পর্বতমালা অগ্ন্যুৎপাত শুরু করলে তা নেভানোর জন্য এক বালতি জলের যা কার্যকারিতা, এখানেও ব্যাপারটা প্রায় একই।

ফোম রবারের উপরে মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করে বন্দুকটা রাখল ক্যালভি। তার মধ্যে সাইলেন্সার এবং ম্যাগাজিনও রয়েছে। জিনিসটা ঠিক সুবিধে হচ্ছিল না, তাই শেষ পর্যন্ত ম্যাগাজিনটাকে অটোমেটিকের হাতলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। এতে খানিকটা জায়গা বাঁচল। এদের আয়তনগুলো সযত্নে একটা ফেল্ট-নিবের পেন দিয়ে দাগ কেটে মেপে নিল, তারপর ছুরি দিয়ে সেই মাপমত কাটতে লাগলো ফোম রবারের টুকরোটা। মাঝরাত নাগাদ দেখা গেল বন্দুকের অংশগুলো শান্তভাবে ফোম রবারের বিছানায় শুয়ে আছে। লম্বা সাইলেন্সারটা আনুভূমিক ভাবে রাখা, ঠিক বইয়ের বাঁধাইয়ের সমান্তরালে। আর বন্দুকের

নল, হাতল আর মাঝের অংশটা ভূমির সমান্তরালে পাতার উপর থেকে নিচে তিনটে স্তরে সযত্নে সাজিয়ে রাখা।

এবার বন্দুকের অংশ সমেত পুরো গর্তটা ফোম রবারের আর একটা পাতলা টুকরো দিয়ে ঢেকে ফেলল ক্যালভি। তারপর বইয়ের সামনের এবং পিছনের মলাট আরো আঠা দিয়ে একসঙ্গে সেঁটে দিল। তারপর বই বন্ধ করে প্রায় ঘণ্টাখানেক সেটাকে মেঝের উপর রেখে একটা টেবিল উল্টে চাপা দিয়ে রাখল। যখন তুলল, তখন বইটা একটা কঠিন পাথরের টুকরোর মত হয়ে গেছে। ছুরি দিয়ে না কেটে আর তার পাতা খোলা যাবে না। বইটা আবার ওজন করল ক্যালভি। আগে যা ওজন ছিল, তার চেয়ে মাত্র আধ আউন্স মত ভারি হয়েছে।

কাজ শেষ করার পর গোটা বইটাকে একটা শক্ত পলিথিনের খোলা খামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ক্যালভি। বড়, দামি বইগুলোকে ধুলো এবং আঁচড়ের দাগ থেকে বাঁচানোর জন্য প্রকাশকরা ঠিক এইভাবেই বই প্যাক করেন। বইটা চমৎকার ঢুকে গেল, তারপর খামের খোলা দিকটা গ্যাস স্টোভের উপর গরম করে ছুরির সাহায্যে দু'টো মুখ লাগিয়ে দিল। আশা করা যায় যদি কেউ এই পার্সেল খোলেও, সে দেখে আশ্বস্ত হবে যে স্বচ্ছ পলিথিনের ভিতরে নিরীহ একটা বই-ই রয়েছে।

এইবারে গোটা বইটাকে সে একটা বড় বইয়ের প্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে মুখটা একটা ধাতব ক্লিপ দিয়ে আটকে দিল। তার উপরে এক বিখ্যাত বুক স্টোরের একটা লেবেল দিল আটকে। তাতে প্রাপকের নাম ও ঠিকানা টাইপ করা—মঁসিয়ো আলফ্রেড ক্যালভি, হোটেল মেট্রোপোল, কল দ্য জাতিভা, ভ্যালেন্সিয়া, স্পেন। তারপর প্যাকেটের উপর ডাকটিকিট সেঁটে দিল।

পরদিন সকালে ক্যালভি চিঠিটা পাঠিয়ে দিল এয়ারমেলে, আর প্যাকেটটা পাঠাল সাধারণ ডাকে। অর্থাৎ এটা যাবে সাধারণ ট্রেনে, প্রায় দিন দশেক বাদে।

আইবেরিয়া কার্ভেই বিমানটা খানিক চক্কর কেটে যখন কাম্পো দ্য মানিসে বিমানবন্দরের মাটি ছুঁল, তখন সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। তখনো অস্বাভাবিক গরম। বিমানটিতে যে তিরিশজন যাত্রী এসেছে, তাদের অধিকাংশই প্যারিসের লোক। ভ্যালেন্সিয়ার কোথাও-না-কোথাও তাদের নিজস্ব ভিলা রয়েছে। ছ' সপ্তাহের ছুটি কাটাতে এসেছে তারা। যথারীতি কাস্টমসের হাত থেকে মাল খালাস হতে দেরি হতে লাগল, আর যাত্রীরাও কাস্টমসের লোকের আদ্য-

শ্রাদ্ধ শুরু করে দিল।

ক্যালভির মালপত্র বলতে একটা মাঝারি সাইজের স্যুটকেস। সেটা খুলে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করল কাস্টমসের লোকেরা, তারপর স্যুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ক্যালভি। চলে এল বিমান বন্দরের গাড়ি পার্ক করার জায়গায়। জায়গাটা গাছপালায় ঢাকা পড়ে গেছে বেশ। দেখে খুশি হল সে। গাছের নিচে সারি সারি গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে মালিকদের জন্য অপেক্ষা করছে। ঠিক করল, পরের দিন সকালে এসে এখান থেকেই গাড়ি নেবে। তারপর একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা চলে গেল হোটেলে।

হোটেল মেট্রোপোলের কেরাণিটি বেশ সহযোগিতাপূর্ণ। যেই মাত্র ক্যালভি তার আসল নাম এবং পরিচয় ব্যক্ত করল, সঙ্গে সঙ্গে খাতা, চিঠি সব বের করে, সইসাবুদ করিয়ে পিছনের একটা ঘর থেকে বইয়ের একটা প্যাকেট এনে দিল। দুঃখের সঙ্গে কার্সিকান জানাল যে তার বন্ধু ক্যালভি বিশেষ কারণবশত তার সঙ্গে আসতে পারেনি, তবে তাতে অসুবিধা নেই। যাবার সময় দু'টি ঘরের বিল সেই মিটিয়ে দিয়ে যাবে। ক্যালভির সই করা একটি চিঠিও সে দেখাল, যাতে স্পেনের ইতিহাস বইটি সংগ্রহ করার দায়িত্ব তার উপরেই ন্যস্ত হয়েছে। কেরাণি চিঠিটি একবার চোখ বুলিয়ে দেখল, দু'টি ঘরেরই বিল দিতে রাজি হওয়ায় কার্সিকানকে ধন্যবাদ জানাল, তারপর প্যাকেটি দিয়ে দিল তার হাতে।

ঘরে এসে ক্যালভি আগে খামটা পরীক্ষা করল। খামটা খোলা হয়েছিল, ধাতব ক্লিপটা বেঁকিয়ে খামের ভিতর দেখে আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে ভিতরে বইটা কেউ ছোঁয়নি, কারণ পলিথিনের প্যাকেটটা না ছিঁড়ে বা কেটে বইটা বের করা সম্ভব নয়।

প্যাকেটটা খুলে ছোট ছুরিটা দিয়ে বইয়ের মলাট দু'টো আলাদা করে বইটা খুলে ফেলল ক্যালভি। তারপর বন্দুকের অংশগুলো বের করে সেগুলো চটপট একসঙ্গে লাগিয়ে ফেলল। মুখে সাইলেন্সারটা লাগিয়ে ম্যাগাজিনের গুলিগুলো পরীক্ষা করল। সবকটা গুলিই যথারীতি জায়গা মতো রয়েছে। গুলিগুলো সাধারণ গুলি নয়, বিশেষভাবে তৈরি। বিস্ফোরণের আওয়াজ কমানোর জন্য তাদের ভিতর থেকে বেশ খানিকটা বিস্ফোরক কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে দশ ফুট দূরত্ব থেকে গুলি চালালে এই অর্ধেক শক্তি নিয়েও ৯ মিঃ মিঃ ব্রাউনিং-এর গুলি সোজা লক্ষ্যবস্তুর মাথায় ঢুকে যাবে।

আর ক্যালভি কখনই ১০ ফুটের বেশি দূরত্ব থেকে গুলি চালায় না।

বন্দুকটাকে ওয়ার্ডরোবের নিচে রেখে, চাবিটা পকেটস্থ করে ব্যালকনিতে বসে একটা সিগারেট ধরাল ক্যালভি। নিঃশব্দে সিগারেট খেতে খেতে ভাবতে লাগল আগামীকালের কথা। রাত ন'টা বাজতে নেমে এল নিচে, তেরাসা দেল রিয়ালতো-তে ডিনার খেল। তারপর ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল। ফেরার পথে হোটেলের কেরাণিটির কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে পরদিন সকাল আটটায় মাদ্রিদে যাবার প্লেন রয়েছে, তাকে ছ'টায় ডাকতে বলে দিল ক্যালভি।

পরদিন সকাল সাতটায় হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বিমান বন্দরে চলে গেল। গেটে দাঁড়িয়ে এক মনে নজর করতে লাগল গাড়িগুলোকে। প্রায় ডজনখানেক গাড়ি এল, প্রত্যেকটি গাড়ির নাম, নম্বর এবং ড্রাইভারের চেহারার বিবরণ সংক্ষেপে লিখে রাখতে লাগল ক্যালভি। সাতটা গাড়ি কোন যাত্রী না নিয়েই এল। বোধহয় ব্যবসায়িক কাজে এগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। বিমান বন্দরের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে ক্যালভি লক্ষ্য করল বহু যাত্রী মাদ্রিদের বিমান ধরার জন্য দৌড়চ্ছে। তার মধ্যে চারজন গাড়ির ড্রাইভারও রয়েছে। হাতের কাগজটার দিকে তাকাল সে। গাড়ি চারটির একটি সিমকা, একটি মার্সিডিজ, একটি জাগুয়ার এবং আর একটি স্প্যানিস ফিয়াট. ফিয়াট ৬০০-র স্থানীয় সংস্করণ।

মাদ্রিদের বিমান চলে যাবার পর ক্যালভি পুরুষদের পোষাক ছাড়ার ঘরে ঢুকে পড়ল। পরনের স্যুটটি ছেড়ে চটপট পরে নিল ক্রিম জিনস্, হাল্কা নীল রঙের স্পোর্টস শার্ট এবং নীলরঙের নাইলনের উইন্ডব্রেকার। সাজসজ্জা শেষ করে বন্দুকটা একটা তোয়ালেতে মুড়ে স্যুটকেস থেকে বের করল একটা নরম এয়ারলাইন ব্যাগ। তাতে সযত্নে বন্দুকটা ঢুকিয়ে রেখে স্যুটকেসটা লাগেজ ডিপোজিট অফিসে জমা দিয়ে দিল। তারপর সন্ধ্যাবেলা প্যারিসে ফেরার বিমানের বুকিং নিশ্চিত করে ব্যাগ কাঁধে এগিয়ে গেল কারপার্কের দিকে।

স্প্যানিস-ফিয়াটটাই পছন্দ হল ক্যালভির। কারণ স্পেনে এধরনের গাড়ি হামেশাই দেখা যায়। বিশেষ করে এর দরজার হাতল খোলা খুব সোজা। গাড়ি চোরেদের পক্ষে খুবই সুবিধা। আরো দু'টি লোক গাড়ি পার্ক করে চলে যাবার পর একটা লাল গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে। ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা ধাতব

দণ্ড বের করে দরজার হাতলে লাগিয়ে আস্তে নিচের দিকে মোচড় দিল একটা। অল্প একটু শব্দ করে হাতলটা খুলে গেল। ভিতরে হাতটা ঢুকিয়ে উপরের ঢাকনাটা সরিয়ে দিল। তারপর চালু করে দিল গাড়িটা, মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা রাস্তায় উঠে এল। তারপর এন ৩৩২ সড়ক ধরে দক্ষিণে আলিকান্তের দিকে এগিয়ে চলল।

ভ্যালেনসিয়া থেকে ওনডারা ৯২ কিলোমিটার রাস্তা, অর্থাৎ প্রায় ৫৫ মাইল। রাস্তাটি ভারি চমৎকার, গান্দিয়া এবং ওলিভা ধরে দু'ধারে শুধু কমলালেবুর বাগান। মাঝারি গতিতে গাড়ি চালিয়ে দু'-ঘণ্টায় গন্তব্যে পেঁছলো ক্যালভি। সমগ্র উপকূল অঞ্চল ঝলসে যাচ্ছে সূর্যের খরতাপে। প্রখর কিরণে ঝিকমিক করা বালিয়াড়িকে দূর থেকে দেখাচ্ছে একটা আঁকাবাঁকা সোনালি ফিতের মত। তার মাঝে মাঝে চলমান বিন্দুর মত সব তামাটে শরীর, আর ঝাঁপানো সাঁতারুরা। ভীষণ গরম, বাতাসের চিহ্নমাত্র নেই, সমুদ্র যেখানে দিগন্তে মিশেছে, সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে পাতলা, রহস্যঘন কুয়াশা।

ওনডারায় পেঁছে হোটেল পালমেরা পেরোল ক্যালভি। মনে পড়ল এখানে এখনো থাকেন ও এ এস-এর প্রাক্তন প্রধান জেনারেল রাউল সালানের প্রাক্তন একান্ত সচিব। স্মৃতিই তাঁর সম্বল এখন। এখানকার লোকজনের বেশ সাহায্যের মনোভাব আছে, জিজ্ঞেস করতেই বলে দিল, প্লায়া কালডেরা শহর থেকে মাইল দু'য়েক দূরে। ঠিক দুপুরের মুখে সেখানে পেঁছল ক্যালভি। সমুদ্রের পারে পর পর দাঁড়ানো রয়েছে ভিলা, অধিকাংশই বাইরে থেকে আসা বিদেশীদের। তাদের অনেকেই এখন স্পেনের নাগরিকত্ব নিয়ে নিয়েছে। ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে সান ক্রিসপিন ভিলাটি খুঁজতে লাগল সে। ছবিতে আগেই দেখা, কাজেই চিনতে অসুবিধা হবার কথা নয়। কাউকে জিজ্ঞাসা করাও চলবে না। বিশেষ একটি ভিলার কথা জিজ্ঞেস করলে সেটা কারুর না কারুর মনে থেকে যেতে পারে।

ঠিক বেলা একটার আগে হলুদ শাটার এবং সাদা রং করা টেরাকোটা দেওয়ালের বাড়িটা দেখতে পেল ক্যালভি। সামনের গেটের পাশে একটা থামের গায়ে পাথরের টুকরোয় লেখা নামটাও চোখে পড়ল তার। আরো ২০০ গজ এগিয়ে গাড়িটা পার্ক করল। তারপর আস্তে আস্তে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে হাঁটা শুরু করল, যেন সবে আসা কোন পর্যটক সমুদ্রতীরে যাচ্ছে। পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুরে ভিলার পিছনদিকের গেটের কাছে পেঁছল সে। জায়গাটা একটা

কমলালেবুর বাগান, গাছের আড়াল থেকে দেখতে পেল কমলালেবুর বাগান আর ভিলার বাগানের মধ্যে ভেদরেখা টেনেছে মাত্র একটা নিচু পাঁচিল। ভিলাটার পিছন দিকেও একটা হলুদ শাটার লাগানো। সেখানা ঘোরাফেরা করছে এক ব্যক্তি, নিঃসন্দেহে এই তার উদ্দিষ্ট শিকার। হাতে জলের ঝাঁঝরি নিয়ে গাছে জল দিচ্ছে। পিছনের বাগান থেকে একতলার ঘরে ঢোকার মুখে পরপর বসানো কয়েকটা ফ্রেঞ্চ উইনডো। সেগুলো সব খোলা, বোধহয় আলো-হাওয়া ঢোকার জন্য। অবশ্য হাওয়া আর কোথায়, যে ঢুকবে! ঘড়িতে সময় দেখল— এখন দুপুরের খাবার সময়। গাড়ি চালিয়ে চলে গেল ওনডারায়।

বার ভ্যালেন্সিয়া নামে একটা বারে বসে বেলা তিনটে পর্যন্ত কাটাল ক্যালভি। বড় বড় চিংড়ি মাছ ভাজার সাথে জমিয়ে দু'গ্লাস মদ খেল। মদটা স্থানীয়, সাদা রংয়ের, বেশ হালকাই মনে হল খেয়ে। তারপর দাম চুকিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

প্রায়াতে আবার যখন ফিরল ক্যালভি, তখন সমুদ্রের উপর থেকে মেঘের আস্তরণটা সরে গেছে। সমুদ্রের জল এখন তেলের মত মসৃণ, নিস্তরঙ্গ; মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে একটা অদ্ভুত গুরু গুরু ধ্বনি। জুলাইয়ের এই মাঝামাঝি সময়ে কোণ্টা ব্রাভায় ব্যাপারটা বেশ অস্বাভাবিক। গাড়িটাকে কমলালেবুর বাগানে যাবার রাস্তাটার কাছে পার্ক করল সে, ব্যাগ থেকে সাইলেন্সার লাগানো ব্রাউনিং অটোমেটিকটা বেল্টের ভিতরে পুরল। তারপর উইন্ডব্রেকারটা গলা পর্যন্ত তুলে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। কোথাও কোন আওয়াজ নেই, সব শান্ত, নিস্তরঙ্গ। এই গরমে স্থানীয়রা সবাই সমুদ্রে স্নানে মত্ত। নিচু দেওয়ালটা টপকে ভিলার বাগানে ঢুকে পড়ল ক্যালভি। দু'-এক ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, কমলালেবু গাছের পাতার উপর তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বেশ কয়েকটা বড় ফোঁটা তার নিজের কাঁধেও পড়ল। ফ্রেঞ্চ উইনডোগুলোর কাছে যখন পৌঁছলো, ততক্ষণে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভিলার ছাদের গোলাপি টালিগুলোর উপর তার শব্দ অনেকটা ড্রামের মত মনে হচ্ছে। খুশি হল ক্যালভি; যাক্, বাইরে কারুর আর কোন শব্দ শোনার কোন সম্ভাবনাই নেই।

ভিতরে ঢুকে শুনতে পেল বসার ঘরের বাঁদিকের একটা ঘর থেকে ক্রমাগত টাইপ করার শব্দ ভেসে আসছে। ধীরে বন্দুকটা বের করল ক্যালভি, তুলে দিল সেফটি ক্যাচটা। তারপর মেঝেতে পাতা কার্পেটের উপর দিয়ে এগিয়ে

গেল পড়ার ঘরের খোলা দরজাটার দিকে।

কী হল, বা কেন হল, তা কোনদিনই জানতে পারলেন না মেজর আর্চি সামার্স। মৃদু পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন তাঁর পড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একটা লোক। ব্যাপারটা কী জানতে সবে চেয়ার ছেড়ে অর্ধেক উঠে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় আগন্তুকের হাতে ধরা জিনিসটা চোখে পড়ল তাঁর। মুখটা খুলে গেল ভয়ে। সঙ্গে সঙ্গে খুব আস্তে পরপর দু'টো আওয়াজ হল। বাইরের বৃষ্টিতে তার কিছুই শোনা গেল না। দু'টো গুলিই গিয়ে লাগল বুকে। তৃতীয় গুলিটা দু'ফুট দূরত্ব থেকে আনুভূমিকভাবে ঠিক তাঁর মাথার মাঝখানে ছুঁড়ল। অবশ্য এটা না ছুঁড়লেও চলত, এটার জন্য আর কোন যন্ত্রণা পাননি মেজর সামার্স। মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কার্সি'কান, যেখানে নাড়ি থাকে সেখানটা আঙুল দিয়ে পরখ করল। মাথা ঝুঁকিয়ে যখন দেখছে নাড়িটা, হঠাৎই সে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে তাকাল বসার ঘরের দরজাটার দিকে……

পরের দিন সন্ধ্যায় রু্য দ্য মিওল্যার বারে মুখোমুখি হল খুনী এবং মক্কেল। আগের দিন রাতে ভ্যালেনসিয়া থেকে ফিরেছে ক্যালভি। সেদিন সকালেই টেলিফোন করে খবর জানিয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে স্যান্ডারসন। যখন ভাড়াটে খুনির সাফল্যের জন্য তার হাতে ৫০০০ পাউণ্ড-এর বাকি টাকাটা তুলে দিচ্ছে, তখনো বেশ নার্ভাস লাগছিল তার।

'কোন সমস্যা হয়নি তো?' ফের জিজ্ঞেস করলো স্যান্ডারসন। মৃদু হাসল কার্সি'কান। মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। বলল, 'নাঃ, কাজটা সহজই ছিল বলা যায়। আপনার মেজর মরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দু'টো বুলেট বুকে, একটা মাথায়।'

'কেউ তোমাকে দেখেনি তো?' আবার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন মক্কেলের, 'কোন সাক্ষী নেই?'

'না', উঠে দাঁড়াল কার্সি'কান, নোটের বাণ্ডিলটা ঢুকিয়ে রাখলো বুক পকেটে।

'তবে একেবারে শেষের দিকে একটা বাধা এসেছিল। খুব বৃষ্টি পড় ছিল, হঠাৎই একজন ঢুকে পড়ল। স্বাভাবিকভাবেই সে দেখতে পেল যে আমি একটা মৃতদেহ নিয়ে বসে আছি।'

আতঙ্কে প্রায় স্থবির হয়ে গিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মার্ক। মুখ দিয়ে

শুধু একটা কথাই বেরোল, 'লোকটা কে ?'

'এক মহিলা।'

'লম্বা ? মাথায় কালো চুল ?'

'হ্যাঁ। দারুণ দেখতে।' মক্কেলের মুখে নিদারুণ বিভীষিকার অভিব্যক্তি দেখে তার কাঁধ চাপড়ে অভয় দিল ক্যালভি। অসীম নিশ্চয়তার সঙ্গে বলল, 'ভয় পাবেন না, মঁসিয়ো, কেউ চিহ্নমাত্র পাবে না, মেয়েটাকেও গুলি করে মেরে দিয়েছি।'

বি বি সি-র মাইক্রোফোনের সামনে আমি যখনই দাঁড়াই, কেন জানি না আমাকে শুধু অনুরোধ করা হয় ভূতের গল্প বলতে। অনুরোধই বা বলি কেন, বলা যায় রীতিমতো আদেশ। আমি জিজ্ঞেস করি, 'কী রকম ভূতের গল্প?' উত্তর পাই, 'যা আপনার ভাল লাগে, তবে ঘটনাটা সত্যি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত হওয়া চাই।'

এতেই আমি পড়ে যাই মুশকিলে। না না, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-গুলো সত্যি নয়, তা ভাববেন না যেন। ঘটনা হল, অতিলৌকিক ব্যাপারে আমার ভাগ্যটা বেশ খারাপই বলা যায়। অথচ আমি যে এসবে বিশ্বাস করি না তা নয়, আমি শুধু চাই ভৌতিক ঘটনা যখন ঘটছে তখন সেখানে উপস্থিত থাকতে। শুধু শোনা কথায় ভরসা করা যায় না। কিন্তু কী বলব। ঐ যে আগেই বলেছি, এবিষয়ে ভাগ্যটা আমার তেমন ভাল নয়।

বহু লোক আমাকে বদলাতে চেষ্টা করেছে। বিশেষত এক মহিলা আমাকে অনেক প্ল্যানচেট, টেবিল টার্নিং ইত্যাদি ভৌতিক ক্রিয়াকলাপের আসরে টেনে নিয়ে গেছেন। কিন্তু ফলেন নাস্তি। আমি যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণ সেখানে কিছুই হয়নি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবছা আলোকিত ঘরে হাতে হাত ধরে টেবিল ঘিরে বসে থেকেছি। কিছুই হয় নি, প্ল্যানচেটে একটা শব্দ বেরোয়নি, টেবিলগুলো যেন কেউ স্ক্রু দিয়ে মেঝের সাথে এঁটে রেখেছে। প্রথম প্রথম লোকে বলত, প্রেতাত্মার সাড়া না মেলাটা নিছকই দুর্ঘটনা, কিন্তু পরে সবাই আমাকেই দোষারোপ করতে শুরু করল। একবার তো আমি নিজেই মজা করে একটা টেবিল-ট্যাপার বানিয়ে এক প্ল্যানচেটের আসরে প্রেতাত্মার হয়ে উত্তর দিলাম। আরো মজার ব্যাপার হল, সে আসর শেষ হবার পর উপস্থিত সবাই এসে আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'কী, এবার ভূতে বিশ্বাস হলো তো? আর কোন প্রমাণ লাগবে?' এসব ব্যাপার এজন্যই বললাম যে ভূতে আমি অন্ধ বিশ্বাস করি না, আবার অবিশ্বাসও করি না। তবে এটুকু বলা যায় যে প্ল্যানচেট বা টেবিল টার্নিং-এর মাধ্যমে লোককে ধোঁকা দেওয়াখুব সহজ।

তবে আজ আপনাদের যে ঘটনাটার কথা বলতে বসেছি, সেটা সম্পূর্ণ সত্য। এটা আমার নিজের জীবনেই ঘটেছে। যে ক্লাবে আমি রোজ যাই, সেখানে একটা সুইমিং পুল আছে। সবাই স্নান করে সেখানে। বেশ চমৎকার সাঁতার কাটার জায়গা, একদিকে বেশ গভীর অন্যদিকে অগভীর। পুলের ঠিক গায়ে লাগানো একটি হলঘর, তার এক পাশ জুড়ে বার। বারটা খুবই জনপ্রিয়, খাবার দাবারও পাওয়া যায় এখানে, দামেও বেশ সস্তা। বহু লোক এখানে খায়, বিশেষত মাসের শেষে তো বেশ ভিড় হয়। কোন ঝুটঝামেলা নেই, খাবার ইচ্ছে হলে কাউণ্টারে যাও, যা পছন্দ তুলে নিয়ে টেবিলে চলে এসো, মৌজ করে খাও। যখন খাওয়া শেষ হল, বারের মালিক জর্জের কাছে যাও, বলো কী কী নিয়েছে। জর্জ শুনে দাম বলে দেবে, দাম চুকিয়ে চলে এসো।

ব্যক্তিগতভাবে আমি পছন্দ করতাম সুইমিং পুলের দিকের একটা টেবিল, ওখানেই আমি সাধারণত বসতাম। টেবিলটা একটু নিচের দিকে ওখানে বসতে গেলে দু'-চার ধাপ সিঁড়ি নামতে হয়। তা হলেও জায়গাটা শান্ত ঝামেলাহীন, আশেপাশের গোলমালের কোন উত্তাপই তোমার গায়ে লাগবে না। যেভাবে লোকে এখানে অনবরত ধাক্কাধাক্কি করে ঢুকছে, বেরোচ্ছে, খাচ্ছে, তাতে এক এক সময় আমার হাঙরের ঝাঁকের কথা মনে পড়ে যায়। তুলনাটা আমার নয়; এই ক্লাবের আর এক সদস্যের। তার নামটা আমি আর বলছি না।

আমি ভিড়কে ভয় পাই। তাই আমি দেরি করে ভেতরে ঢুকি। তখন ভিড় থাকে না, বেশ শান্তিতে বসা যায়। বসে বসে দেখি, লোকে ডাইভিং অনুশীলন করছে। কারুর কারুরটা সত্যিই দেখার মত, তবে সবারটা নয়।

একদিন সবে খাওয়া শেষ করেছি, হঠাৎ একটা জলে ঝাঁপ দেবার আওয়াজ শুনলাম। একটা চিঠি পড়ছিলাম, তাই সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পারিনি, তবে অবাক হলাম যে জলে কোন বুদ্বুদ নেই। কেউ সাঁতারও কাটছে না। আবার চিঠিটা পড়তে শুরু করে দিলাম, এ নিয়ে আর কিছু মাথা ঘামালাম না। সেদিন আর কিছু ঘটল না।

সপ্তাহ দু-তিন বাদে ওই একই সময়ে আবার দুপুরের খাবার খাচ্ছি, আবার জলে ঝাঁপানোর শব্দ। এবার সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তাকালাম, দেখতে পেলাম বুদ্বুদও। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম ডাইভটা অসাধারণ হয়েছে, যেই দিক না কেন দিয়েছে একেবারে উপর থেকে। বুদ্বুদগুলো উঠছিল ঠিক সুইমিং পুলের মাঝখান থেকে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, লোকটি কখন জল

থেকে ওঠে। কিন্তু কেউ উঠল না, ভাবলাম বোধ হয় ডুবসাঁতার কাটছে। তাই টেবিল ছেড়ে উঠে সুইমিং পুলের ধারে গেলাম তাকে দেখতে। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেও কেউ উঠল না দেখে একটু ভয়ই পেলাম। হয়তো ডাইভ দিতে গিয়ে সুইমিং পুলের নিচে মাথায় ধাক্কা খেয়েছে। হয়তো অজ্ঞান হয়ে গেছে। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। তাই জামাকাপড় পরা অবস্থাতেই জলে ঝাঁপ দিলাম তাকে খোঁজার জন্য।

কিন্তু জলে কাউকেই পেলাম না। অথচ নিঃসন্দেহে কেউ না কেউ জলে আছে। একটা ড্রেসিংরুম থেকে এক বেয়ারা বেরিয়ে এসে আমাকে ওই অবস্থায় দেখে বোধহয় ভাবল, আমার মাথাটা খারাপ হয়েছে। তাকে ঘটনাটা বললাম বটে, কিন্তু সে বিশ্বাস করল বলে মনে হল না।

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটল প্রায় দিন পনের বাদে। এবার আমি গোটা জিনিসটাই স্পষ্ট দেখতে পেলাম। যথারীতি আমি টেবিলে বসে খাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম একটা লোক মই বেয়ে একেবারে উপরের ডাইভিং বোর্ডে উঠছে। উপরে উঠে সে পাটাতনের একদম প্রান্তে চলে এল। তারপর কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে হাত ঘষতে লাগল বুকে। অবশ্য সাধারণত ডাইভাররা এরকমই করে।

লোকটি বেশ লম্বা, শক্তপোক্ত চেহারা। গায়ের রং তামাটে, অল্প একটু গোঁফও রয়েছে। কিন্তু আমার বিশেষভাবে চোখে পড়ল তার বুকের একটা কাটা দাগ। দাগটা বিরাট, প্রায় ইঞ্চি ন'য়েক লম্বা হবে, বাঁদিকের কাঁধ থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে গিয়ে বুকের মাঝামাঝি। দেখে মনে হয় বেয়নেটের আঘাত। নিঃসন্দেহে দাগটা যন্ত্রণা দিয়েছে লোকটিকে।

কেন লোকটাকে অত খুঁটিয়ে দেখছিলাম জানি না, তবে দেখছিলাম। আর মজার ব্যাপার হল, লোকটাও যেন আমাকে একই রকম আগ্রহ নিয়ে দেখছিল। খুব অর্থপূর্ণ একটা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। কী সেই অর্থ আমি বুঝলাম না, তবে অনুভব করলাম সে দৃষ্টি শূন্য নয়, তাতে অর্থ আছে।

যখনই লোকটা বুঝল যে আমি তাকে দেখছি সঙ্গে সঙ্গে সে ঝাঁপ দিল জলে। এত ভাল ডাইভ আমি জীবনে দেখিনি। জল ছিটকাল সামান্য, আওয়াজও হল কম। যেন জলের বদলে তেলে ঝাঁপ দিল লোকটা, বুদ্বুদগুলোও মিলিয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মনে মনে ভাবছি, এরকম কয়েকটা ডাইভ দেখতে পেলে

নিজেও কিছু শিখতে পারব। অপেক্ষা করতে লাগলাম, লোকটা কখন ওঠে। কিন্তু অপেক্ষাই সার, লোকটার আর কোন চিহ্ন দেখলাম না।

সুইমিং পুলের ধারে গিয়ে আমি গোটা পুলটা একবার চক্কর দিলাম। নাঃ, জল ছাড়া কোথাও কিছু নেই। আর এইটুকু সময়ের মধ্যে আমার চোখে ধুলো দিয়ে লোকটা উঠে পড়বে, তাও হতে পারে না খুঁজে খুঁজে বের করলাম ড্রেসিংরুমের দেখভাল করা ছেলেটিকে। তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম বেলা বারোটার পর থেকে কেউ কস্টিউম কিংবা তোয়ালে জাতীয় কিছু চায়নি। তখন বাজে বেলা আড়াইটে। এমনকি শেষ সাঁতারুকে চলে পর্যন্ত যেতে দেখেছে ছেলেটি।

ব্যাপারটা আমাকে দুঃশ্চিন্তায় ফেলে দিল। লোকটা তো হঠাৎ হাওয়ার মিলিয়ে যেতে পারে না। আর এতক্ষণ ধরে ডুবসাঁতার দিচ্ছে, তাও হতে পারে না। সুতরাং হয় লোকটা একটা ভূত, নয়তো লাঞ্চের মদের প্রভাবটা আজ একটু জোরালো হয়ে পড়েছে। অবশ্য ভূত হওয়াটা অবাস্তব, ভূত সুইমিং পুলে ডাইভ দিতে আসছে, আজ পর্যন্ত এরকম কেউ শুনেছে ?

ফিরে গেলাম খাবার টেবিলে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, মদ খেয়েছি অতি সামান্য শুরুই করেনি বলতে গেলে। তাছাড়া মদটা এত হালকা যে ছ'বছরের একটা বাচ্চা ছেলেকে এক গ্যালন খাওয়ালেও তার কিছু হবে না। আর আমি নিজে তো আর ছ'বছরের বাচ্চা নই। তাই মদের প্রভাবও তেমন কিছু নয়। তাহলে কী ? স্থির করলাম, ব্যাপারটা দেখতে হবে। তারপর থেকে টেবিলে রোজই হাঁ করে বসে থাকতাম, কিন্তু ডাইভার বন্ধুটির আর দেখা পেলাম না।

এর প্রায় বছর দেড়েক বাদে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু, প্রিঙ্গল নাম, তবে মাঝে তাদের অনেকদিন দেখিনি, কারণ তারা এখন মেকসিকোতে থাকে। বেশি দূরে চলে গেলে লোকের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা যায় না। শীগ্গিরই তারা আবার চলে যাবে। যাবার আগে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে।

বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখলাম সেদিন আর এক ভদ্রলোকও আমার সঙ্গে আমন্ত্রিত, নাম মেলহুইশ। এ লোকটার মত বিরক্তিকর লোক আমি আর দেখিনি। এক একটা লোক থাকে যারা তুমি কিছু বলার আগেই যা বলতে চাইছ তার উল্টো কথা বলবে। এ লোকটাও ঠিক তাই করে। এরকম লোকের সামনে সভ্যভব্য হয়ে থাকাও মুশকিল। মেলহুইশ প্রিঙ্গলদের সঙ্গেই মেকসিকো

যাচ্ছে, তাদের একটা কারখানার ম্যানেজার হয়েছে সে। আরো অনেক কথা সে বলতে লাগল, কিন্তু আমি তখন একনিষ্ঠভাবে মনে করার চেষ্টা করে যাচ্ছি যে একে আগে কোথায় দেখেছি।

মাছ খেতে খেতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এই তো সেই সুইমিং পুলের ডাইভার! একবারই মাত্র দেখেছি তাকে, কিন্তু তবু সব মনে পড়ল। তখন থেকেই লোকটার প্রতি আগ্রহ বেড়ে গেল আমার। সে আমেরিকান, ইংল্যাণ্ডে এসেছে মাস দুয়েক হল। এখন কাজ খুঁজছে। জিজ্ঞেস করলাম সে আমেরিকা ছাড়ল কেন? প্রশ্নটা শুনতেই পেল না। তবে এটা নিশ্চিত বোঝা গেল যে এর আগে সে কোনদিন ইংল্যাণ্ডে আসেনি। তাই শেষ পর্যন্ত ঢিলটা ছুঁড়লাম।

'আচ্ছা কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি,' আমি বললাম, 'আপনার বুকে কী এরকম একটা দাগ আছে?' দাগের বর্ণনা দিলাম আমি. প্রিঙ্গলরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আর মেলহুইশকে দেখে মনে হল এখুনি মূর্ছা যাবে। যাহোক করে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী কখনো আমেরিকায় গিয়েছিলেন?'

আমি বললাম, 'না।' মেলহুইশ বলল, 'অদ্ভুত ব্যাপার, আমার সত্যিই বুকে একটা কাটা দাগ আছে।' তারপর বলল, কী ভাবে দাগটা হয়েছিল। অল্প বয়সে সে ডাইভিং অভ্যাস করত। ভাল ডাইভার ছিল, বহু পুরস্কারও পেয়েছে। একবার নদীতে ঝাঁপ দিতে গিয়ে জলের তলায় একটা খোঁজে লেগে ওই অবস্থা হয়। স্বভাবতই সবাই জানতে চাইল যে আমি কী ভাবে ব্যাপারটা জানলাম। খুব বলতে ইচ্ছা করছিল আসল ঘটনাটা, কিন্তু বললে নিশ্চয়ই সবাই আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠবে, তাই গল্প বানাতে শুরু করলাম। বোধ হয় কোন ছবিতেই দেখেছি, কাগজে বা আর কোথাও। যাইহোক আমার ব্যাখ্যায় মোটামুটি সবাই সন্তুষ্ট হল, আমিও উঠে চলে এলাম।

বাড়িতে এসেও জিনিসটা কিন্তু আমার মাথা থেকে গেল না। ঘোর সমস্যা, এই নিয়ে সারারাত জেগেই কাটল। কেন জানি না আমার মনে হচ্ছিল, এটা এক ধরনের হুঁশিয়ারি। যে লোকটা জলে ডাইভ দিয়ে আর উঠে আসে না, সে কিছুতেই আমার বন্ধুদের উপযুক্ত ভ্রমণসঙ্গী হতে পারে না। আমি আদৌ কুসংস্কারাচ্ছন্ন নই। হ্যাঁ, এটা ঠিক, যে আমি মইয়ের নিচে হাঁটি না।

অথবা একটা সিগারেট ধরানোর জন্য তিনবার দেশলাই জ্বালি না। কিন্তু সেটা করি এগুলো দুর্ভাগ্য ডেকে আনতে পারে বলে, কুসংস্কারবশত নয়।

যাই হোক্, পরের দিন প্রিঙ্গলদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমার বন্ধু ছিল না, তবে বন্ধুর স্ত্রী ছিল। তাকে আমি সব বললাম, ক্লাবে সেই ডাইভিং দেখা থেকে শুরু করে সব কিছু। এতেই কাজ হল। বন্ধুর স্ত্রীর তো চোখ ছানাবড়া। না, কোনমতেই সে আর মেলহুইশের সঙ্গে মেকসিকো ফিরছে না, যা শুনল, তারপরে আর যাওয়া যায়?

বন্ধুর স্ত্রী বন্ধুকে কীভাবে রাজি করাল জানি না, তবে ঘটনা হল প্রিঙ্গলরা মেকসিকো গেল না। মেলহুইশ মেকসিকোর উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

ট্রেনে মেকসিকো যেতে হলে একটা নদীর উপর তৈরি সেতু পার হতে হয়। সেতুটা ইস্পাতের তৈরি। এক সময় বেশ পোক্ত ছিল, কিন্তু একবার স্থানীয় দুটি সমাজবিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে গণ্ডগোলের সময় সেতুটির খানিকটা অংশ বিস্ফোরণে উড়ে যায়।

পরে যখন গোলমাল থেমে গেল, সেতুটিকেও আবার সারানো হল। কিন্তু সেটা আর আগের মত মজবুত হল না। দিনের বেলা কোন অসুবিধা হত না, কারণ প্রচণ্ড সূর্যকিরণে এবং গরমে ইস্পাত পুরোপুরি প্রসারিত হত। সেতুও পোক্ত থাকত। কিন্তু রাত্রে ঠাণ্ডার সময় ইস্পাতের রডগুলো খানিকটা সংকুচিত হত, ফলে দুটো মুখ এক জায়গায় মিলত না, একটু ফাঁক হয়ে থাকত।

ঘটনাক্রমে যে ট্রেনটিতে চেপে মেলহুইশ মেকসিকো যাচ্ছিল, সেটা সেতু পার হচ্ছিল রাত্রে। ট্রেনের ভার সে সহ্য করতে পারল না। যে জায়গাটা মেরামত করা হয়েছিল, সেটা আবার ভেঙে পড়ল। ইঞ্জিনসমেত দুটো কামরা পড়ে গেল নদীর জলে। চোদ্দ জন মারা গেল। তেরো জনকে আমি চিনি না। চোদ্দ নম্বর লোকটি হলেন মিঃ মেলহুইশ।

এ গল্পের কোন নীতিবাক্য আছে কি না, আমি জানি না। অনেক ভেবেও কিছু খুঁজে পাইনি। আপনারাও খুঁজুন, যদি পান আমাকে জানাবেন।

টিমথি হ্যানসন সমস্যার মুখে কখনই দিশেহারা হয়ে পড়েন না। যখনই তাঁর কোন সমস্যা আসে, অতি শান্তভাবে, মেপে মেপে পা ফেলে তার মোকাবিলা করেন। প্রথমে সমস্যাটা শান্তভাবে বিশ্লেষণ করেন। তারপর সবচেয়ে সুবিধাজনক সিদ্ধান্ত ও পথটা বেছে নেন, এবং সবশেষে সেই পথে নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে যান। এজন্য বেশ গর্বও মনে মনে রয়েছে তাঁর। এই ক্ষমতা তাঁর প্রভূত উপকার করেছে। আজ এই মধ্য বয়সে এসে ক্ষমতা এবং অর্থের চূড়ায় বসে আছেন তিনি।

সেদিন এপ্রিলের সকালে ডেভনশায়ার স্ট্রিটে একটি বাড়ির সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। জায়গাটা লণ্ডনের প্রথম শ্রেণীর ডাক্তারদের আবাসস্থল, অভিজাত এলাকা। পিছনের ঝকঝকে কালো দরজাটা সবে বন্ধ হয়েছে। দরজার সামনে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আপন মনে কি যেন ভাবছিলেন তিনি।

যে ডাক্তারের বাড়িতে তিনি এসেছিলেন, ভদ্রলোক তাঁর দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। যে কোন অপরিচিত লোকও সেদিন ডাক্তারের মুখ দেখে বলে দিতে পারত যে ডাক্তার খুবই শংকিত, বেদনাহত। তার উপর হ্যানসন তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু। সুতরাং শংকাটা আরও গাঢ়। এমনকি স্বয়ং রোগীর থেকেও ডাক্তারের দুঃখ স্পষ্টতই আরো বেশি। তিনি বলেছিলেন, 'টিমথি, আজ পর্যন্ত জীবনে মাত্র তিনবার আমাকে এই ধরনের খবর দিতে হয়েছে।' ডাক্তারের প্রসারিত হাতে তখন একটি ফোল্ডারে এক্স-রে প্লেট এবং তার রিপোর্ট, 'বিশ্বাস কর, একটা ডাক্তারের কাছে এর চাইতে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আর কিছু হয় না।'

হ্যানসন মাথা নেড়ে জানালেন যে তিনি ডাক্তারের প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করছেন।

'অন্য কেউ হলে হয়তো আমি মিথ্যে কথা বলতাম,' বললেন ডাক্তার, 'কিন্তু তোমাকে তো আমি চিনি, কি করে মিথ্যে বলি?'

প্রশস্তির জন্য ধন্যবাদ জানালেন হ্যানসন।

ডাক্তার নিজে তাঁকে চেম্বারের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'যদি কিছু করা যায়……বুঝতে পারছি কথাটা বোকার মত শোনাচ্ছে……

তবু বলছি……যদি কিছু করা যায়……'

'ডাক্তারের হাত চেপে ধরলেন হ্যানসন। মৃদু হাসলেন বন্ধুর দিকে তাকিয়ে। আর কিছুর দরকার নেই। যা জানার, তা তিনি জেনে নিয়েছেন।

সাদা কোট পরা রিসেপসনিস্ট পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে যাবার পর হ্যানসন প্রাণভরে শ্বাস নিলেন। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু সারারাত ধরে শহর জুড়ে ছেয়ে রয়েছে। ঠাণ্ডা, তাজা বাতাস। সারা রাস্তা ধরে সুন্দর সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ি, এখন অবশ্য তার অনেকগুলোই বাণিজ্যিক অফিস। কোনটা আবার আইনজীবীদের চেম্বার, কোনটায় ডাক্তারদের চেম্বার। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

ফুটপাত ধরে মেরিলিবোন স্ট্রিটের দিকে হেঁটে চলেছেন এক অল্পবয়সী ভদ্রমহিলা। দ্রুতগতির হাইহিলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সুন্দর চেহারা, ঝকঝকে চোখ, গালে গোলাপী আভা। হ্যানসনের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল, চকিত একটা হাসি ছুঁড়ে মাথাটা নাড়ালেন তিনি। মেয়েটি বিস্মিত হল প্রথমে, কিন্তু তারপরই সে বুঝল, তাদের মধ্যে আদৌ কোন পরিচয় নেই। এটা তার রূপের প্রশংসা হল। মৃদু হেসে মেয়েটি এগিয়ে চলল, নিতম্বের দুলুনি বাড়িয়ে দিল কিছুটা। হ্যানসনের ড্রাইভার রিচার্ডস কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, সবই তার চোখে পড়েছে, কিন্তু এমন ভাব দেখাল যেন সে কিছুই দেখেনি। বাইরে দাঁড়িয়ে একটা রোলস রয়েছে, তারই পিছনের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

সিঁড়ি বেয়ে হ্যানসন নেমে আসতে রিচার্ডস পিছনের দরজাটা খুলে ধরল। গাড়িতে উঠে হ্যানসন আরাম করে বসলেন। কোটটা খুলে সযত্নে ভাঁজ করে সিটের পাশে রাখলেন। তার উপরে রাখলেন কালো টুপিটা। রিচার্ডস স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে নিজের জায়গায় বসল।

'অফিসে যাবেন তো, স্যার?' সে প্রশ্ন করল।

'কেণ্টে' উত্তর দিলেন হ্যানসন।

রুপালি গাড়িটা দক্ষিণে মোড় নিয়ে গ্রেট পোর্টল্যাণ্ড স্ট্রীট ধরে নদীর দিকে এগিয়ে চলল। খানিক বাদে রিচার্ডস জিজ্ঞেস করল।

'হার্টে কোন গোলমাল নেই তো স্যার?'

'না। এখনো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।'

সত্যি সত্যিই হ্যানসনের হার্টে কোন গোলমাল নেই। সেদিক দিয়ে তিনি রীতিমতো শক্ত। কিন্তু এই সময়, এই জায়গায় বসে তিনি কী করে তাঁর ড্রাইভারকে বলেন যে কিছু পাগল, ক্ষুধার্ত জীবাণু তাঁর পেটের ভিতরটাকে কুরে কুরে খেয়ে শেষ করে ফেলছে। পিকাডিলি সার্কাসের ইরোসের মূর্তি পেরিয়ে গেল গাড়িটা, তারপর হেমার্কেটের গাড়ির অরণ্যে ঢুকে পড়ল।

সিটে হেলান দিয়ে বসে গাড়ির ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন হ্যানসন। কাউকে দু'মাসের জেল দিলে সে ভাবে। ওরে বাবা, এতো অনেক দিন! অথবা দু'টো পা ভেঙে গেলে কাউকে যদি দু'মাস হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হয় তার মনে হয় সে বোধহয় যুগ যুগান্ত ধরে শুয়ে আছে। কিন্তু কেউ যদি জানতে পারে তার জীবন শেষ হতে আর মাত্র ছ'মাস বাকি আছে তখন সেই সময়টাকে মোটেই দীর্ঘ বলে মনে হয় না। একেবারেই নয়।

তার মধ্যে ডাক্তার আবার বলেছেন, শেষ মাসটা হাসপাতালেই শুয়ে কাটাতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে, সে সময়টা পরিস্থিতি খুবই খারাপ হবে। তবে যন্ত্রণা প্রশমনের নানারকম ওষুধ তো এখন বেরিয়েছে, নতুন নতুন শক্তিশালী ওষুধ····

বাঁদিকে মোড় নিয়ে গাড়ি ঢুকল ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ রোডে. তারপর সরাসরি ব্রিজে। টেমস্-এর তীরে হ্যানসন দেখলেন, ক্রিম রং-এর কাউন্টি হল ক্রমশ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

নিজের অবস্থা চিন্তা করতে লাগলেন হ্যানসন। নতুন সমাজতন্ত্রী সরকার এসে নানারকম নতুন করের বোঝা চাপালেও টাকা-পয়সা তাঁর নেহাৎ মন্দ নেই। দুর্লভ, মূল্যবান মুদ্রা বিক্রির ডিলারশিপ আছে তাঁর। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, যে বাড়িতে তাঁর অফিস, সেটিরও যেমন খুশি ব্যবহারের অধিকার তাঁর আছে। সবচেয়ে বড় কথা গোটা ব্যবসাটা তাঁর নিজের, কোন অংশীদার বা শেয়ার-হোল্ডার নেই।

রোলস্ রয়েস তখন ছুটেছে ওল্ড কেন্ট রোডের দিকে। মেরিলিবোনের আভিজাত্য এখানে অদৃশ্য, এমনকি অক্সফোর্ড স্ট্রীটের বাণিজ্যিক প্রাচুর্যের চিহ্নও এখানে নেই। এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে গেলে কিছুই নেই। কেমন একটা বঞ্চনার ছাপ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। সমস্যা যে উপস্থিত, তার ছাপ ছড়িয়ে আছে চারদিকেই।

দুপাশের পুরনো ক্লান্ত বাড়িগুলোকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন হ্যানসন। গাড়ি চলছে দ্রুতগতিতে, মাইল প্রতি ১০ লক্ষ পাউন্ড খরচ হওয়া হাইওয়ে

ধরে। কেণ্টে নিজের প্রাসাদোপম বাড়ির কথা মনে এল তাঁর। যাচ্ছেন এখন সেখানেই। ২০ একর জায়গা জুড়ে বিশাল বাড়ি। গাছপালায় ভর্তি, দামীদামী সব গাছ। এই বাড়িটার কি হবে? তারপর মেফেয়ারে একটা বড় অ্যাপার্টমেণ্ট রয়েছে। কেণ্টে না গিয়ে মাঝে মাঝে সেখানেই রাত কাটান। এছাড়া বিদেশী খরিদ্দাররা এলে তাদের হোটেলে না তুলে এই অ্যাপার্টমেণ্টেই রাখেন। এখানে তাঁরা হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারেন, কোন রকম বিধিনিষেধও থাকে না। ব্যবসায়িক লেনদেনের পক্ষেও জিনিসটা সহায়ক হয়।

এসব ছাড়াও রয়েছে ব্যবসাটা, সেই সঙ্গে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত মুদ্রা সংগ্রহ। দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে এই সংগ্রহটি গড়ে তুলেছেন তিনি। তাছাড়া শেয়ার এবং স্টক এক্সচেঞ্জের প্রচুর কাগজপত্র রয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংকে জমা দেওয়া রয়েছে প্রচুর টাকা। রয়েছে গাড়িটা, যাতে চেপে এখন চলেছেন কেণ্ট।

হঠাৎই ওল্ড কেণ্ট রোডের একটা ক্রসিংয়ের সামনে এসে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করল রিচার্ডস। জানলা দিয়ে তাকালেন হ্যানসন। চারজন নান্-এর তত্ত্বাবধানে রাস্তা পার হচ্ছে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। সামনে রয়েছে দু'জন, বাকিরা সব পিছনে। লাইনে সবার শেষে থাকা একটা বাচ্চা ছেলে রাস্তা পার হতে হতে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁ করে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল রোলস রয়েসটার দিকে।

বাচ্চাটার মুখটা গোলগাল, মুখে একটা রাগত ভাব। নাকটা ভোঁতা। তার মাথার চুলের গুচ্ছ ঢাকা পড়েছে একটা টুপিতে, তার গায়ে লেখা রয়েছে 'সেণ্ট বি', বোঝাই যাচ্ছে আদ্যক্ষর। এক পায়ের মোজা গুটিয়ে গিয়ে কুঁচকে রয়েছে গোড়ালির কাছে। তার ইলাস্টিকটা বোধ হয় অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে কোথাও গেছে। মুখ তুলে বাচ্চাটা দেখল গাড়ির জানলার পিছন দিয়ে একটা রুপালি মাথা একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বিনা দ্বিধায় ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে মুখ কুঁচকে একবার ভেংচে দিল। তারপর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে নাক চেপে ধরে বাকি আঙুলগুলো নেড়ে নেড়ে দুয়ো দিল।

মুখের ভাব এতটুকু না বদলে টিমথি হ্যানসন তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে নিজের নাক চেপে ধরে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে একই ভঙ্গি করলেন। রিয়ার ভিউ মিররে জিনিসটা দেখে ফেলল রিচার্ডস, কিন্তু নিমেষে চোখ সরিয়ে সোজা উইণ্ডস্ক্রিন ভেদ করে তাকিয়ে রইল। রাস্তায় দাঁড়ানো

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। হাতখানা নিজের অজান্তেই নাক থেকে নেমে এল। তারপর প্রাণখোলা হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে, ঠিক সেই মুহূর্তেই একজন নাম এসে তার হাত ধরে রাস্তা পার করে নিলেন। আঁকাবাঁকা লাইনটা এখন আবার সোজা হয়েছে। রাস্তা থেকে একটু দূরে রেলিংঘেরা একটা বাড়ির দিকে তারা লাইন দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বাধা অপসারিত হতে রোল্‌স রয়েস আবার এগিয়ে চলল কেণ্টের দিকে।

আধঘণ্টা বাদে শেষ মফস্বল শহরটাও পেরিয়ে গেলো তারা। এম-২০ মোটরওয়ের মসৃণতা শুরু হয়ে গেছে। উত্তরাঞ্চলের ছন্নছাড়া, নোংরা মফস্বল আর নেই। তার জায়গা নিয়েছে কেণ্টের পাহাড়ের সারি এবং উপত্যকার পর উপত্যকা। এই সৌন্দর্যই তো কেণ্টকে গার্ডেন অব ইংল্যান্ড উপাধিতে ভূষিত করেছে। হ্যানসনের মনে এল তাঁর স্ত্রী-র কথা। প্রায় দশ বছর হল তিনি মারা গেছেন। বিয়েটা কিন্তু তাঁর সুখের হয়েছিল, সত্যিই সুখের হয়েছিল। অবশ্য কোন ছেলে-মেয়ে হয়নি। হয়তো কাউকে দত্তক নেওয়াই উচিৎ ছিল, এব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ট চিন্তাভাবনাও করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন, তাঁরাও বহুদিন হল গত হয়েছেন। আর তাঁর নিজের দিকে আছেন তাঁর এক বোন, যাকে তিনি সবচেয়ে ঘৃণা করেন। বোনের স্বামীটি যেমন শয়তান, ছেলেটিও তেমনি অসভ্য। গোটা পরিবারটাকেই অপছন্দ করেন তিনি।

মেডস্টোনের দক্ষিণ পর্যন্ত এসে মোটরওয়ে শেষ হয়ে গেল। আরও মাইল কয়েক এসে হ্যাবিরেটশ্যামে রিচার্ডস মল সড়ক থেকে নেমে পড়ে দক্ষিণে বাগান, মাঠ, বন, জঙ্গল, ঝোপে-ঝাড়ে ভরা রাস্তাটা ধরল। এই জায়গাটার নাম উইল্ড অপূর্ব সুন্দর এই জায়গাতেই টিমথি হ্যানসন তাঁর বাড়িটি কিনেছেন।

এছাড়া আছেন চ্যান্সেলর অব দ্য এক্সচেকার। দেশের আর্থিক লগ্নীর প্রধান ইনিই। হ্যানসন ঠিক করলেন এবার তাঁর নিজের ভাগটা চাইবেন। তা সেটাও প্রায় ভাল টাকাই হবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে, এবার তাঁকে একটা উইল করতেই হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন হ্যানসন।

* * *

'আসুন স্যার, মিঃ পাউণ্ড আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।' বলল সেক্রেটারি।

উঠে দাঁড়ালেন টিমথি হ্যানসন। এসেছেন মার্টিন পাউণ্ডের অফিসে।

পাউণ্ড, গোগার্টি আইনসংক্রান্ত সংস্থার সিনিয়র পার্টনার তিনি। ডেস্কের পিছন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আইনজীবী ভদ্রলোক স্বাগত জানালেন।

'এসো এসো, টিমথি, অনেক দিন বাদে দেখলাম তোমাকে।'

মধ্যবয়সী যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মতই হ্যানসন তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চার পরামর্শদাতার সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলেন। এঁরা হলেন আইনজীবী, দালাল, হিসাবরক্ষক এবং ডাক্তার। এঁদের সবার সঙ্গে তাঁর নাম ধরে ডাকার সম্পর্ক। যাই হোক্, আপাতত দু'জনেই বসলেন।

'তোমার জন্য কী করতে পারি, বলো?' জিজ্ঞাসা করলেন পাউণ্ড।

'মার্টিন, 'বললেন হ্যানসন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই তো তুমি আমাকে একটা উইল করতে বলছ।'

'নিশ্চয়ই' উত্তর দিলেন পাউণ্ড 'একটা ব্যবস্থা রেখে দেওয়া দরকার। আগেই করা উচিৎ ছিল।'

ব্রিফকেস খুলে একটা বড় ম্যানিলা খাম বের করলেন হ্যানসন। বেশ মোটা খাম, মুখটা গালা দিয়ে বন্ধ করা। বিস্মিত সলিসিটরের দিকে সেটা এগিয়ে দিলেন তিনি, বললেন, 'এই নাও, উইল।'

এমনিতে পাউণ্ডের মুখটা বেশ মসৃণ। কিন্তু এখন সেখানে খানিকটা বিমূঢ় ভাঁজ খেলে গেল। খামটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন—

'টিমথি, আমি আশা করি…মানে…তোমার এত বড় সম্পত্তি…'

'চিন্তার কিছু নেই।' বললেন হ্যানসন।' 'এটা একজন উকিলেরই তৈরি। সইসাবুদ করা, সাক্ষীও রয়েছে। অস্পষ্ট কোন ব্যাপার এতে নেই। এমন কিছু নেই যা নিয়ে ভবিষ্যতে মামলা-মোকদ্দমা হতে পারে।'

'ও, আচ্ছা', বললেন পাউণ্ড।

'তুমি রাগ কোরো না, মার্টিন। আমি জানি তুমি ভেবে অবাক হচ্ছ যে তোমাকে দিয়ে উইল না বানিয়ে আমি অন্য লোকের কাছে কেন গেলাম। কারণ আছে বিশ্বাস করো।'

'না না, সে ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন পাউণ্ড, 'তা নিয়ে কোন প্রশ্নই নেই। এখন তুমি কি চাও আমি এটা নিরাপদে রাখি?'

'হ্যাঁ, আর একটা কথা। এই উইলের অছি হিসেবে আমি তোমার নামই দিয়েছি। এটা কার্যকর করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। আমি জানি তুমি উইলটা দেখলে ভালো হত। তবে তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি অছি হিসেবে

তোমার এমন কোন কাজ করতে হবে না, যাতে পেশগত ভাবে, বা ব্যক্তিগত ভাবে তোমার বিবেক আহত হয়। তুমি রাজি ?'

দু'হাতে খামটার ওজন দেখলেন পাউণ্ড। বললেন, 'ঠিক আছে। কথা দিলাম, যাই হোক্, এসব তো সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার। তোমায় দেখাচ্ছে কিন্তু দারুণ। হয়তো দেখা গেল, আমার থেকে তুমিই বেশিদিন বাঁচলে। তখন কি করবে ?'

রসিকতাটা উপভোগ করলেন হ্যানসন। মিনিট দশেক বাদে তিনি বেরিয়ে এসে পা রাখলেন গ্রেজ ইন রোডে। সে মাসের সূর্য তখন চারিদিকে কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত টিমথি হ্যানসন খুবই ব্যস্ত রইলেন। বেশ কয়েক বার কণ্টিনেণ্টে যেতে হল তাঁকে, লণ্ডনে তো অনবরত আসতে হল। যেসব মানুষ অসময়ে মারা যান, তাঁরা তাঁদের সব জিনিস গুছিয়ে রেখে যাবার সুযোগ পান না। হ্যানসন চান, যাবার আগে সব জিনিস নিজের মনোমত গোছগাছ করে রেখে যেতে।

১৫ সেপ্টেম্বর তিনি রিচার্ডসকে বাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। রিচার্ডস এবং তার স্ত্রী—আজ বারো বছর ধরে হ্যানসনের দেখাশোনা করছে। লাইব্রেরীতে হ্যানসনকে খুঁজে পেল রিচার্ডস।

'একটা কথা তোমায় বলার আছে, 'বললেন হ্যানসন, 'এ বছরের শেষে আমি অবসর নেব ঠিক করেছি।'

বিস্মিত হল রিচার্ডস, তবে তা প্রকাশ করল না। বুঝল, আরো কিছু বক্তব্য আছে।

'আমি দেশও ছাড়ব বলে ঠিক করেছি', বললেন হ্যানসন।

'এমন কোথাও যাব সেখানে সূর্যের দেখা পাওয়া যাবে। সেখানে ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকব।'

এই তাহলে ব্যাপার, ভাবল রিচার্ডস। যাই হোক্, তবু তো হ্যানসন মাস তিনেক আগে জানিয়ে দিয়েছেন। হাতে খানিকটা সময় পাওয়া গেল। অবশ্য বাজারের যা অবস্থা, তাকে এখন থেকেই চাকরি খুঁজতে হবে। শুধু চাকরিটাই তো নয়, তার সাথে সাথে সুন্দর ছোট কটেজটাও তো চলে যাচ্ছে।

'টেবিল থেকে একটা খাম তুলে নিলেন হ্যানসন। রিচার্ডসের দিকে বাড়িয়ে দিলেন সেটা ; রিচার্ডসও বিনা বাক্য ব্যয়ে তা গ্রহণ করল।

'রিচার্ডস', বললেন হ্যানসন, 'যদি এবাড়ির ভবিষ্যত মালিকেরা তোমাকে বা মিসেস রিচার্ডসকে দিয়ে কাজ করাতে না চান, তাহলে তো তোমাকে অন্য কোন চাকরি খুঁজে নিতে হবে।'

'হ্যাঁ, স্যার', বলল রিচার্ডস।

'যাবার আগে অবশ্য আমি তোমায় যথাসম্ভব ভালো পরিচিতি পত্র দিয়ে যাবো ; জানালেন হ্যানসন, 'তবে তোমার কাছে আমার অনুরোধ, খুব প্রয়োজন না হলে এটা তুমি গ্রামের কাউকেই দেখিও না ; সম্ভব হলে কোথাও কাউকে দেখিও না। আমি আরো খুশি হব যদি তুমি অন্তত পয়লা নভেম্বর পর্যন্ত কোথাও চাকরি না খোঁজো। সোজা কথায়, আমি চাই না, আমার চলে যাবার খবর এখনই ছড়িয়ে পড়ুক।'

'তাই হবে, স্যার', বলল রিচার্ডস। হাতে তার তখনো পুরু খামটা ধরা।

'এবার শেষ কথায় আসছি', বললেন হ্যানসন, 'ওই খামটা। গত বারো বছর ধরে তুমি এবং মিসেস রিচার্ডস খুব ভালোভাবে আমার দেখাশোনা করেছ। তোমার জানা দরকার যে এতে আমি মুগ্ধ বরাবরই।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

'আমি খুব খুশি হব যদি আমি চলে যাবার পরও তোমরা আমার স্মৃতির প্রতি একই রকম অনুগত থাকো। আমি জানি আরো দু'সপ্তাহ চাকরি খুঁজতে বারণ করে আমি তোমাকে অসুবিধায় ফেলে দিলাম। তাছাড়া, তোমার ভবিষ্যত সম্পর্কেও কিছুটা চিন্তাভাবনা আমি করেছি। ওই খামে দশ হাজার পাউণ্ড রয়েছে। পুরোটাই ব্যবহৃত, পুরোনো নোটে।'

এতক্ষণে রিচার্ডসের আত্মনিয়ন্ত্রণ ভেঙে পড়ল। তার ভুরু দু'টো উপরে উঠে গেল। কোনমতে বলল, 'ধন্যবাদ, স্যার।'

'কাউকে যেন এব্যাপারে কিছু বোলো না,' বললেন হ্যানসন, 'টাকাটা এভাবে নগদে দিলাম কারণ আর সবার মত আমিও চাই না আমার উপার্জনের একটা বড় অংশ ট্যাক্সের লোকেদের হাতে তুলে দিই।'

'সে তো ঠিকই', মন থেকে বলল রিচার্ডস। খামের ভিতরে কাগজের নোটগুলো সে খুব সহজেই অনুভব করতে পারছিল।

জানাজানি হলে এই টাকায় উপর তোমাকে অনেক টাকা গিফ্‌ট ট্যাক্স দিতে হবে। আমার উপদেশ, তুমি টাকাটা ব্যাংকে রেখো না। অন্য কোন নিরাপদ জায়গায় রেখে। আর ছোট ছোট ভাগে টাকাটা খরচ কোরো, তাহলে আর কারুর

দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। আশাকরি আগামী কয়েক মাস এই টাকাটা তোমাদের দু'জনকেই সাহায্য করবে।'

'কোন চিন্তা করবেন না, স্যার', বলল রিচার্ডস, 'আমি সাবধানে থাকব। আমাদের দু'জনের তরফে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

উঠোনটা পার হয়ে নতুন রোলস রয়েসটা ফের পালিশ করার কাজে মন দিল রিচার্ডস। মনটা তার দারুণ খুশি। এমনিতেই তার মাইনে বেশ ভাল ছিল, বেশ কিছু টাকা সে জমাতে পেরেছে। থাকার খরচও তার লাগত না, কটেজে থাকত। তার উপর নতুন করে এই টাকাটা পাওয়ায় তার আরও সুবিধা হল। হয়ত আর তাকে নতুন কাজ খুঁজতে হবে না। ওয়েলসে তার বাড়ি। সেখানে পোর্টকলে একটা ছোট বোর্ডিং হাউসের সন্ধান সম্প্রতি পেয়েছে সে আর মেগান, সেখানেই……

পয়লা অক্টোবর ভোরে সূর্য ওঠার আগেই টিমথি হ্যানসন শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সকালবেলা মিসেস রিচার্ডসের আসার কথা প্রাতঃরাশ তৈরি করতে, ঘর দোর পরিষ্কার করতে। তবে তার এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি আছে।

আরও একটা ভয়াবহ রাত তাঁর কেটেছে। বিছানার পাশের চাবি দেওয়া ড্রয়ারে যে বড়িগুলো তিনি রাখেন, তারাও এখন যুদ্ধে হার স্বীকার করতে শুরু করেছে। তলপেটের নিচের দিকে তীব্র যন্ত্রণাটা তাঁর গোটা শরীরটাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছে। চেহারাটা ধূসর হয়ে যাচ্ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে। বয়সের তুলনায় এখন অনেক বেশি বয়স্ক দেখায় তাঁকে। নিজেও বুঝতে পারছেন, আর কিছু করার নেই। সময় হয়ে এসেছে।

মিনিট দশেক ব্যয় হল তাঁর। রিচার্ডসকে উদ্দেশ্য করে একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখলেন। তাতে পনের দিন আগে বাধ্য হয়ে বলা মিথ্যা কথাগুলোর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন এবং বললেন, মার্টিন পাউন্ডকে যেন তাঁর বাড়িতে সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করে রিচার্ডসকে বললেন, সেদিন সকালে মিসেস রিচার্ডস-এর আর আসার দরকার নেই। তবে রিচার্ডস যেন আধঘণ্টার মধ্যে লাইব্রেরীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

সব শেষ করে ড্রয়ারের চাবি খুলে শটগানটা বের করলেন হ্যানসন। এটাকে সহজে বয়ে বেড়ানোর জন্য এর ব্যারল থেকে ইঞ্চি দশেক ছেঁটে নিয়েছেন। বন্দুকটায় দু'টো গুলি ভরলেন। তারপর গেলেন লাইব্রেরীতে।

বরাবরই টিমথি সব ব্যাপারে সতর্ক, যত্নবান। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হল না। নিজের প্রিয় বাটনব্যাক লেদারের হাতলওলা চেয়ারটা একটা ভারি কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। এসব জিনিস এখন অন্যের, আর তাঁর নিজের নয়। বন্দুকটা কোলে নিয়ে চেয়ারে বসলেন, শেষ বারের মত চোখ বুলিয়ে আর একবার দেখে নিলেন তাঁর প্রিয় বইগুলোকে। দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার সংগ্রহ ধরে রাখা ক্যাবিনেটগুলোকে। তারপর বন্দুকটা তুলে নলটা নিজের বুকের দিকে ফেরালেন। কাঁপা হাতে ধরলেন ট্রিগারটা এক বুক নিঃশ্বাস নিয়ে নিজের হৃৎপিণ্ডে গুলি চালিয়ে দিলেন টিমথি হ্যানসন।

অফিস ঘরের লাগোয়া কনফারেন্স রুমের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে লম্বা টেবিলের মাথার দিকে নিজের আসনে এসে বসলেন মার্টিন পাউণ্ড। টেবিলের মাঝামাঝি ডানদিকে বসে আছেন মিসেস আর্মিটেজ। ভদ্রমহিলা পাউণ্ডের বন্ধু এবং মক্কেল টিমথি হ্যানসনের বোন, এঁর কথা তিনি আগেও শুনেছেন। পাশেই তাঁর স্বামী বসে। দু'জনেই কালো পোশাক পরে আছেন। টেবিলের উল্টোদিকে বসে আছে তাঁদের ছেলে টাকু'ইন। বছর বিশেক বয়স তার, ভাবভঙ্গি কেমন যেন নিস্পৃহ, উদাসীন। নিবিষ্ট মনে নাকে আঙুল ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে যাওয়া ছাড়া তার যেন আর কোন বিষয়েই আগ্রহ নেই। চশমাটা ঠিক মত এঁটে নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন পাউণ্ড।

'আপনারা হয়তো জানেন যে প্রয়াত টিমথি হ্যানসন আমাকেই তাঁর উইলের অছি মনোনীত করে গেছেন। পরিস্থিতি সাধারণ হলে আমি হয়তো মৃত্যুর পরই উইলটা পড়ে ফেলতাম, বিশেষত অনেক সময় উইলে তাৎক্ষণিক কিছু নির্দেশ দেওয়া থাকে, যেমন ধরুন শেষকৃত্যের ব্যাপারটা।'

'উইলটা আপনি তৈরি করেননি?' প্রশ্ন করলেন মিঃ আর্মিটেজ।

'না', পাউণ্ড জবাব দিলেন।

'তাহলে তো উইলে কী আছে তা আপনিও জানেন না', বলল টাকু'ইন।

'না', বললেন পাউণ্ড, 'মারা যাবার আগে একটি চিঠি লিখে তিনিই তা বারণ করে গেছেন। যে ঘরে মারা গেছেন, সে ঘরেই ম্যান্টেলপিসের উপর চিঠিটি পাওয়া গিয়েছিল, আমাকেই লেখা ব্যক্তিগত চিঠি। তাতে বেশ কয়েকটা বিষয়ও পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন তিনি। সেগুলোই এখন আপনাদের জানাব।'

'উইলটা পড়লেই ভালো হয়', বলে উঠল টাকু'ইন।

কোন কথা না বলে চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন পাউণ্ড।

'টাকুইন, চুপ করো', মৃদু ধমক লাগালেন মিসেস আর্মিটেজ।

আবার শুরু করলেন পাউণ্ড, 'প্রথম কথা, টিমথি হ্যানসন কিন্তু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিজেকে হত্যা করেননি। দুরারোগ্য ক্যানসারের শেষ পর্যায়ে পেঁছেছিলেন তিনি। ব্যাপারটা জেনেছিলেন গত এপ্রিল থেকেই।'

'বেচারা', বললেন মিঃ আর্মিটেজ।

'পরে আমি চিঠিটা কেণ্টের কাউণ্টি করোনারকে দেখিয়েছিলাম। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসকও ক্যানসারের ব্যাপারটা নিশ্চিত করেছেন। তাছাড়া অটোপসি রিপোর্ট তো আছেই। সুতরাং ডেথ সার্টিফিকেট, তদন্ত, সমাধিস্থ করার অনুমতি এগুলো সব দিন পনেরোর মধ্যেই সেরে নেওয়া গেছে। দ্বিতীয়তঃ, চিঠিতে তিনি পরিষ্কার বলে গেছেন যে এসব আনুষ্ঠানিক ব্যাপার শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন কোনভাবেই উইল খুলে তা পড়া না হয়। আর সবশেষে তিনি বলেছেন যে উইল পড়তে হবে তাঁর একমাত্র জীবিত আত্মীয়, তাঁর বোন মিসেস আর্মিটেজ, তাঁর স্বামী ও ছেলের উপস্থিতিতে।'

ঘরে উপস্থিত তিনজন আরো অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে চাইলেন।

'এখানে তো শুধু আমরাই আছি', বলল টাকুইন।

'ঠিক তাই', পাউণ্ড বললেন।

'তাহলে নিশ্চয়ই সব কিছু আমরাই পেয়েছি', বললেন মিঃ আর্মিটেজ।

'এমন কোন কথা নেই', বললেন পাউণ্ড। 'আপনারা যে আজ এখানে এসেছেন তা শুধু আমার প্রয়াত মক্কেলের চিঠি অনুসারেই।'

'আমাদের নিয়ে মজা করছে কি না কে জানে!' বললেন মিসেস আর্মিটেজ। মুখে কেমন একটা ভাঁজ খেলে গেল তাঁর।

'উইলটা কি তাহলে পড়ব?' জিজ্ঞাসা করলেন পাউণ্ড।

'হ্যাঁ, পড়ুন', বলে উঠল আর্মিটেজ জুনিয়র।

একটা সরু লেটার ওপেনার নিয়ে মোটা খামটার প্রান্ত সযত্নে কেটে ফেললেন মিঃ পাউণ্ড। তার ভেতর থেকে বের করলেন আর একটা মোটা খাম এবং একটা তিন পাতার দলিল। সরু সবুজ সুতো দিয়ে সে দুটো বাঁধা। সুতো খুলে মোটা খামটা একপাশে সরিয়ে রেখে গুটোনো দলিলটা মেলে ধরলেন পাউণ্ড। তারপর পড়তে শুরু করলেন, 'আমি, টিমথি জন হ্যানসন, এটাই আমার শেষ উইল। আমার ঠিকানা...'

'ওসব আমাদের জানা আছে', বলে উঠলেন আর্মিটেজ সিনিয়র।

'ওগুলো বাদ দিয়ে যান', বললেন মিসেস আর্মিটেজ।

চশমার ফাঁক দিয়ে দুজনের দিকেই বিরসবদনে চাইলেন পাউণ্ড। তারপর পড়ে যেতে লাগলেন, 'আমি ঘোষণা করছি যে আমার এই উইল ইংরেজ আইন মোতাবেক প্রণয়ন করা হয়েছে। দুই, আমি এতদ্বারা আমার পূর্বের সমস্ত উইল ও নথিবদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করছি....'

টার্কুইন এমন সজোরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, যার অর্থ একটাই, তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে বসেছে।

'তিন, আমি সলিসিটর পাউণ্ড, গোগার্টি সংস্থার মার্টিন পাউণ্ডকে আমার উইলের অছি মনোনীত করছি এবং আমার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা এবং তৎসংক্রান্ত কর ইত্যাদি যথাযথভাবে দেবার সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাঁর হাতেই অর্পণ করছি। চার, আমার অছিকে অনুরোধ করছি এই দলিলের সঙ্গে যুক্ত খামটি খোলার। তাতে কিছু অর্থ পাওয়া যাবে। তা দিয়ে আমার শেষকৃত্যের খরচ, আমার সলিসিটরের পাওনা অর্থ এবং ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য অন্য যেকোন রকম ব্যয় সংকুলান হবে। এরপরও যদি কিছু অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে উইলের অছির প্রতি আমার অনুরোধ, তাঁর পছন্দ মতো কোন সমাজ সেবামূলক সংস্থায় তিনি যেন সে অর্থ দান করে দেন।'

উইলটি নামিয়ে রেখে আবার চিঠি খোলার সরু ছুরিটি তুলে নিলেন পাউণ্ড। তারপর খামের ভিতর থেকে ২০ পাউণ্ড নোটের পাঁচটি বাণ্ডিল বের করে আনলেন। নতুন, চকচকে নোটের বাণ্ডিল, ব্রাউন পেপারে মোড়া, যা থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রত্যেক বাণ্ডিলে ১000 পাউণ্ড করে অর্থ রয়েছে। গোটা ঘরে তখন সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা। এমনকি আর্মিটেজ জুনিয়র পর্যন্ত নিজের নাকের প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে একদৃষ্টে টাকার বাণ্ডিলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। আবার উইলটা তুলে নিলেন মার্টিন পাউণ্ড।

'পাঁচ, দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের খাতিরে অছির প্রতি আমার অনুরোধ। আমার শেষকৃত্যের পরের দিন যেন উইল অনুযায়ী—তিনি সব বিলিব্যবস্থা করেন।'

আবার চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালেন পাউণ্ড। বললেন, 'সাধারণ অবস্থায় আমি হয়তো এতদিনে মিঃ হ্যানসনের যেসব ব্যবসাপত্র বা অন্যান্য সম্পত্তি রয়েছে। সেগুলো ঘুরে দেখে আসতাম, যাতে সেগুলো ভালভাবে কাজকর্ম

চালিয়ে যেতে থাকে বা ঠিকভাবে সেগুলোর দেখাশোনা করা হয়; বা তাদের কোন রকম অবহেলার ফলে যাঁরা সেগুলো পাবেন, তাঁরা যেন কোন রকম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন না হন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে অছি হিসেবে আমার নিয়োগের কথা আমি সবেমাত্র জেনেছি। তাই এখনো কোন কাজ করে উঠতে পারিনি। আর এখন যা দেখছি, শেষকৃত্যের পরের দিন ছাড়া কাজ শুরুই করতে পারব না।'

'আচ্ছা এই যে আপনি অবহেলার কথা বললেন, এতে সম্পত্তির মূল্য কমে যেতে পারে কি?' প্রশ্ন করলেন সিনিয়র আর্মিটেজ।

'সেটা বলা মুশকিল', বললেন পাউন্ড, 'তবে এখানে মনে হয় তা হবে না। ব্যবসায় মিঃ হ্যানসনের অসাধারণ কিছু সহযোগী আছে। আর তাঁদের আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততাও প্রশ্নাতীত।'

'তবু, আপনি একবার দেখে এলে ভাল হত না?' বললেন মিঃ আর্মিটেজ।

'শেষকৃত্যের পরের দিনই যাব', বললেন পাউন্ড।

'ঠিক আছে, শেষকৃত্যের ব্যাপারটা তাহলে যতশীঘ্র সম্ভব মিটিয়ে ফেলুন', বললেন মিসেস আর্মিটেজ।

'যা বলবেন', 'পাউন্ডের উত্তর 'আপনারাই সবচেয়ে কাছের লোক।'

আবার তিনি পড়তে শুরু করলেন। 'দৃঢ়, আমি জানাচ্ছি…'

এই থামটায় মার্টিন পাউন্ড একটু থেমে চোখ পিটপিট করলেন বারকয়েক, যেন পড়তে একটু অসুবিধা হচ্ছে তাঁর। তারপর একটা ঢোঁক গিলে পড়ে চললেন, '…যে আমার যা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে, তার সবই আমি আমার প্রিয় বোনকে দিয়ে যাচ্ছি। আমি আশা করি এই সম্পত্তি সে তার চমৎকার স্বামী নম্যান এবং সুপুত্র টার্কুইনকে নিয়ে ভালভাবে দেখাশোনা করবে এবং উপভোগ করবে।'

ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়েছে। একটা চরম নিস্তব্ধতা। একটা রুমাল দিয়ে খুব আলতোভাবে চোখ মুছলেন মিসেস আর্মিটেজ। না, জল মোছার জন্য নয়, ঠোঁটের কোণে একটা ঝিলিক ফুটে উঠেছিল তাঁর, সেটাই চাপা দিলেন। রুমালটা সরিয়ে চোখের কোণ দিয়ে একবার স্বামী-পুত্রকে দেখে নিলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি তখন সেই বুড়ি মুরগীর মত যে নিতম্বের একপাশ তুলে দেখেছিল নিচে একটা খাঁটি সোনার ডিম পড়ে রয়েছে। আর্মিটেজ বংশের দুই প্রতিনিধির তখন বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেছে অনেক কষ্টে সিনিয়র আর্মিটেজ

মুখ খুললেন, 'মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত ?'

'ঠিক বলতে পারলাম না', বললেন পাউণ্ড।

'সে কি, আপনি নিশ্চয়ই জানবেন।' বলল টার্কুইন, 'মোটামুটি কত হতে পারে আপনিই তো সব ব্যাপারগুলো দেখতেন।'

'প্রায় সবই', বললেন পাউণ্ড।

'তাহলে…?'

একটু ভেবে নিলেন পাউণ্ড। এই আর্মিটেজরা যতই বিরক্তিকর হোক না কেন, তাঁর প্রয়াত বন্ধুর উইল অনুযায়ী সম্পত্তির মালিক এখন এরাই। বললেন, 'আমার মনে হয় বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী সব সম্পত্তি যদি একত্রিত করা যায়, তাহলে আড়াই থেকে তিন মিলিয়ন পাউণ্ডের কাছাকাছি হবে।'

'বাব্বা…', বলে উঠলেন নর্ম্যান আর্মিটেজ, 'মৃত্যু কর কত দিতে হবে ?' তাঁর মনে এখন নানারকম কল্পনার উদয় হচ্ছে।

'তা…অনেক টাকা।'

'কত ?'

'এত বড় সম্পত্তি, মূল অংশটার উপর সবচেয়ে বেশি হারেই কর ধার্য হবে। ধরুন পঁচাত্তর শতাংশের মত। সব মিলিয়ে আমার মনে হয় পঁয়ষট্টি শতাংশ কর দিতে হবে।'

'তাহলেও তো এক মিলিয়ন পাউণ্ড থাকছে।' বলল টার্কুইন।

'আমি সবটাই আন্দাজে বললাম', অসহায়ের মত বললেন পাউণ্ড। বন্ধু হ্যানসনের কথা মনে পড়ল তাঁর—মার্জিত, রসিক, তীক্ষ্ণধী মানুষ ছিলেন তিনি। কেন টিমথি, এ কাজ করলে কেন ? জোর করে মনকে সরিয়ে আনলেন পাউণ্ড। বললেন, 'এবার সপ্তম অনুচ্ছেদ।'

'পড়ুন, কি আছে !' বললেন মিসেস আর্মিটেজ। হঠাৎই যেন দিবাস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি।

আবার পড়তে শুরু করলেন পাউণ্ড। 'সারাজীবন আমি একটা ভয় নিয়ে কাটিয়েছি। যেদিন আমি মাটির তলায় যাব সেদিন কীটপতঙ্গেরা হয়তো আমার দেহটাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলবে। তাই আমি নিজের জন্য একটা সীসে দিয়ে ঘেরা কফিন বানিয়েছি। সেটা অ্যাশফোর্ডে বেনেট অ্যাণ্ড গেইন্স-এর দোকানে আছে। এটার মধ্যেই শেষ বিশ্রাম নেব আমি। দ্বিতীয়ত,

আমি চাই না যে ভবিষ্যতে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক, বা আর কেউ আমার মৃতদেহ খুঁড়ে তুলুক। তাই আমাকে যেন সমুদ্রে সমাধিস্থ করা হয়। ডেভন উপকূলের কুড়ি মাইল দক্ষিণে আমাকে যেন সমাধিস্থ করা হয়। কারণ নৌবাহিনীর অফিসার হিসেবে এখানেই আমি কাজ করতাম। সবশেষে, আমার শেষ ইচ্ছা জানাচ্ছি। আমার বোন ভগ্নীপতি সারাজীবন আমাকে সম্মান করে এসেছে। তাই আমার নির্দেশ, এরা দু'জনেই যেন আমার কফিনটা সমুদ্রে নিয়ে যায়। অস্থির প্রতি আমার নির্দেশ, সম্পত্তির প্রাপকরা যদি আমার কোন নির্দেশ অগ্রাহ্য করে। অথবা আমার ইচ্ছা পূরণ হবার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে আমার পূর্ব লিখিত সমস্ত নির্দেশ বাতিল বলে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে আমার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি চ্যান্সেলর অব দ্য এক্সচেকারের অফিসে জমা দিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি।'

মুখ তুলে তাকালেন পাউন্ড। প্রয়াত বন্ধুর ভীতি এবং কল্পনার কথা জেনে খুবই অবাক হয়েছেন তিনি। তবে বাইরে তার কোন প্রকা ঘটল না। বললেন, 'মিসেস আর্মিটেজ নিয়মমাফিক আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আপনার প্রয়াত ভাইয়ের ইচ্ছা সম্পর্কে আপনার কোন আপত্তি আছে?'

'অর্থহীন', বলে উঠলেন মিসেস আর্মিটেজ। 'সমুদ্রে কবর দেওয়া··· কোন মানে হয়? এরকম অনুমতি দেওয়া হয় কি না, তাই তো জানি না।'

'খুব কমই হয়, তবে ব্যাপারটা বেআইনি নয়।' উত্তর দিলেন পাউন্ড। 'এরকম একটা কেসের কথা আমি জানি।'

'অনেক খরচ পড়ে যাবে', বলল টার্কুইন, 'মাটিতে কবর দেবার থেকে অনেক বেশি। যা হোক্ করে দিলেই তো হত!'

'শেষকৃত্যের খরচ সম্পত্তি থেকে দিতে হবে না', 'দাঁত চেপে বললেন পাউন্ড। 'খরচটা এখান থেকেই উঠে আসবে। সামনে রাখা ৫000 পাউন্ডের নোটের বান্ডিলের গায়ে টোকা মারলেন তিনি। 'আপনাদের কী আপত্তি আছে?'

'আসলে, আমি জানি না····' মিসেস আর্মিটেজ কী একটা বলতে গেলেন।

'যদি আপত্তি থাকে, তাহলে আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকার বাতিল হয়ে যাবে।'

'তার মানে?'

'সরকার সম্পত্তি নিয়ে নেবে', বললেন মিঃ আর্মিটেজ।

'ঠিক তাই', পাউন্ড বললেন।

'কোন আপত্তি নেই', বললেন মিসেস আর্মিটেজ। 'তবে আমি মনে করি ব্যাপারটা হাস্যকর।

'তাহলে শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করার অনুমতি আপনি আমাকে দিচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলেন পাউণ্ড।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন মিসেস আর্মিটেজ।

'যত তাড়াতাড়ি চুকে যায় ততই ভাল', বললেন তাঁর স্বামী। 'তাহলে সম্পত্তির ব্যাপারে আইনসংক্রান্ত বিষয়গুলো মিটিয়ে নেওয়া যাবে।'

উঠে পড়লেন পাউণ্ড। যথেষ্ট হয়েছে, আর সহ্য করা যাচ্ছে না। বললেন, 'এটাই উইলের শেষ অনুচ্ছেদ। এতে যথাবিধি সইসাবুদ করা আছে। প্রতি পাতায় দু'জন করে সাক্ষীর সই আছে। আমার মনে হয় আর অলোচনার কিছু নেই। সব ব্যবস্থা করে আমি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। ধন্যবাদ।'

নিতান্ত অতি উৎসাহী না হলে অক্টোবরের মাঝামাঝি কেউ ইংলিশ চ্যানেলের মাঝ বরাবর যায় না। বন্দরের সীমানা পেরোনোর আগে আর্মিটেজ দম্পতিও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে উৎসাহ তাঁরাও খুব একটা বোধ করছেন না।

প্রচণ্ড বাতাস বইছে। সবাই কেবিনে ঢুকে গেছে। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিঃ পাউণ্ড। আর সবার সঙ্গে কেবিনে যেতে হয়নি বলে তিনি খুবই খুশি। সব ব্যবস্থাপত্র করতে তাঁর সপ্তাহ খানেক সময় লেগেছে। ডেভনের ব্রিক্সহ্যাম থেকে একটা ট্রলার ঠিক করেছেন। মাছ ধরার ট্রলার, তিনজন জেলে সেটাকে চালায়। ভালো টাকার লোভ দেখাতেই তারা রাজি হয়ে গেছে, ইংলিশ চ্যানেল থেকে মাছ ধরে আজকাল আর বেশি টাকা রোজগার করা যায় না। তাদের এটাও বোঝানো হয়েছে যে তারা কোন বেআইনি কাজ করছে না।

কফিনটাও ট্রলারে আনা হয়েছে বেশ কাঠখড় পুড়িয়ে। প্রথমে কেণ্টের যে দোকানে এটি রাখা ছিল, সেখান থেকে কাঠের মোটা গুঁড়ি এবং কপিকলের সাহায্যে তাকে তোলা হয় একটা খোলা ভ্যানে। কফিনের ওজন সবশুদ্ধ আধটন। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল বরাবর গাড়ি চালিয়ে সকালবেলা এটিকে বন্দরে আনা হয়। সারাক্ষণ তাকে অনুসরণ করে আসে একটি কালো লিমুজিন। তার তাতে বসে সারাক্ষণ অনুযোগের পর অনুযোগ করে যায় আর্মিটেজরা। ব্রিক্সহ্যামে এসে ভ্যানটা বন্দরের পাশে দাঁড়ালে ট্রলারের নিজস্ব

টেনে তোলার দণ্ড দিয়ে কফিনটা ট্রলারে তোলা হয়। এখন সেটা ডেকে দু'টো বড় কাঠের তক্তার উপর আড়াআড়ি রাখা আছে। ওক কাঠের তৈরি দামি কফিন, ওপরে মোমপালিশ করা। তার উপরে পালিশ করা পেতলের কাজ। শরতের আকাশের নিচে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠছে কফিনটা।

টাকুইন আর্মিটেজ ব্রিক্সহ্যাম পর্যন্ত লিমুজিনে চেপে সবার সঙ্গে এসেছিল। কিন্তু সমুদ্রের দিকে একবার তাকিয়েই ঠিক করে, সেখানে যাবার চাইতে শহরের একটা হোটেলের গরম বিছানা অনেক বেশি আরামপ্রদ। তাছাড়া সমুদ্রে সমাধিস্থ করার ব্যাপারে তাকে খুব একটা দরকারও নেই। শেষকৃত্য করার জন্য নৌবাহিনীর যাজক বিভাগ থেকে একজনকে খুঁজে পেতে বের করে এনেছেন পাউণ্ড। সামান্য কাজের বিনিময়ে ভালো টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় তিনিও বেশ খুশি। ছোট কেবিনটায় তিনি বসে আছেন, গায়ে সাদা সুতির আঙরাখার উপর একটা পুরু ওভারকোট চাপানো।

ট্রলারের চালক এসে পাউণ্ডের কাছে দাঁড়াল। পাউণ্ডের সামনে সমুদ্রের একটা ম্যাপ মেলে ধরল সে, অবশ্য মেলে ধরাও মুশকিল। বাতাসে প্রচণ্ড জোরে উড়তে লাগল ম্যাপটা। দক্ষিণে বিশ মাইল দূরে একটা জায়গার উপর আঙুল দিয়ে নির্দেশ করল সে। ভুরুটা একবার তুলল। নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন পাউণ্ড।

'বেশ গভীর জল', বলল চালক। তারপর কফিনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'আপনি চেনেন?'

'ঘনিষ্ঠভাবে', বললেন পাউণ্ড।

গলা ঝাড়ল চালক। এক ভাই আর এক সম্পর্কিত ভাইকে নিয়ে সে ট্রলারটা চালায়। এদিককার জেলেরা অধিকাংশই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তিনজনই ডেভনের অধিবাসী, কঠোর সংগ্রামে অভ্যস্ত। সমুদ্রে থাকতে থাকতে হাত-মুখের রং ঘন বাদামী হয়ে গেছে। এদের পূর্ব পুরুষরা যখন থেকে মাছ ধরছে, তখনও বোধ হয় ক্যাপ্টেন ড্রেক জাহাজ আর সমুদ্রের তফাৎ করতে শেখেন নি।

যাবার আগে চালক বলে গেল, 'ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব।'

জায়গাটায় পৌঁছে চালক ইঞ্জিনটা থামিয়ে ট্রলারটা দাঁড় করাল। আর একজন নিয়ে এল একটা বিরাট তক্তা। তিনটে তক্তা নাট-বল্টু দিয়ে জুড়ে, নিচে আড়াআড়ি ভাবে দু'টো মোটা কাঠের পাটাতন আটকে তিন ফুট চওড়া

তক্তাটা বানানো হয়েছে। সেটা ট্রলারের ডানদিক বরাবর পেতে দেওয়া হল। ট্রলারের ফালি করা কাঠের ঠেকনো পেরিয়ে প্রায় অর্ধেকটা তক্তা বাইরে বেরিয়ে রইল। ফলে অর্ধেক রইল ডেকের উপর, অর্ধেক গর্জমান সমুদ্রের উপর ঝুলে রইল। ক্যাপ্টেনের ভাই টেনে তোলার দণ্ডের মোটরের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। আর সম্পর্কিত ভাই কফিনের চারটে পেতলের আংটার মধ্য দিয়ে হুক গলিয়ে দিল।

ইঞ্জিন পাক দিতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তোলন দণ্ডও কফিনটাকে তুলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে ডেক থেকে উপরে উঠে গেল কফিনটা। তিন ফুট উপরে মোটর চালক কফিনটাকে থামাল। তারপর অতি সুকৌশলে ওক কাঠের কফিনটাকে তক্তার উপর নামাল। কফিনের মাথার দিকটা সমুদ্রের দিকে রেখে সে মাথা নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মোটর চালক ধীরে ধীরে কফিনটাকে নামিয়ে আনতে শুরু করল এবং সেটা সরাসরি নেমে এসে কাঠের ঠেকনোর উপর দাঁড়িয়ে গেল। মোটর চালক ইঞ্জিন থামিয়ে দিল। কফিনটাও ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে তক্তার উপর জায়গা মত বসে গেল। তার অর্ধেক রইল ট্রলারের ভিতরে, বাকি অর্ধেক ট্রলারের বাইরে। সম্পর্কিত ভাই কফিনটা সোজা করে ধরে রইল। মোটর চালক নিচে নেমে এসে শেকলগুলো সরিয়ে তক্তার ভিতরের দিকটা তুলতে হাত লাগাল। ক্রমশ সেটা সমুদ্রের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে গেল। কফিনটারও তখন ভিতরে-বাইরে সমান ভার। ফলে দু'জনের কারুর উপরই তেমন চাপ পড়ল না। পরবর্তী পর্যায়ের জন্য তাদের একজন পাউণ্ডের দিকে তাকাল। কেবিন থেকে যাজক এবং আর্মিটেজদের ডেকে আনলেন পাউণ্ড।

নিঃশব্দে ডেকের উপর পাশাপাশি দাঁড়ালেন ছ'টি মানুষ। বড় বড় ঢেউ এসে পড়ছে ট্রলারের গায়ে, তার জলের ছিটে সবার গায়ে লাগছিল। বেশ দুলছিল ট্রলারটা, কোনমতে তার উপর ভারসাম্য রেখে সবাই দাঁড়ালেন। পরিস্থিতি অনুধাবন করে যাজকও শেষ পর্যায়ের ক্রিয়া যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করলেন। তিনি নিজেও সমস্যায় পড়ছিলেন। একে তো ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন; তার উপর তাঁর লম্বা সাদা চুল এবং সাদা আঙরাখা প্রচণ্ড হাওয়ায় বারবার তাঁর মুখেচোখে এসে পড়ছিল। নর্ম্যান আর্মিটেজেরও মাথা খালি, শীতে প্রায় কুঁকড়ে আছেন। বেশ অসুস্থ দেখাচ্ছে তাঁকে। কর্পুর, সীসে এবং ওকের স্তরের মধ্যে বন্দী হয়ে মাত্র কয়েক ফুট দূরে তাঁর যে মৃত

আত্মীয় শুয়ে আছেন, তাঁর সম্বন্ধে তিনি কি ভাবছেন তা বোধ হয় সহজেই আন্দাজ করা যায়। আর মিসেস আর্মিটেজের ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া, তীক্ষ্ন নাকটা ছাড়া শরীরের আর কোন অংশই দেখা যাচ্ছে না। ফারের কোট, টুপি এবং উলের স্কার্ফের আড়ালে তাঁর গোটা শরীরটাই অদৃশ্য।

যাজক নিজের মনে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন। উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন পাউন্ড। আকাশে একটা গাংচিল নিশ্চিন্তে উড়ছে। ঝোড়ো বাতাস, আর্দ্রতা, শীতলতা, দুর্গন্ধ সবকিছুর প্রতিই সে উদাসীন, নির্লিপ্ত। তার সম্পদ করের চিন্তা নেই, উইল করার চিন্তা নেই, আত্মীয়-স্বজনের চিন্তা নেই। সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী ভাবে নিজের মনে সে বায়বীয় স্তরে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে। একবার চট্ করে কফিনটার দিকে তাকিয়ে ফের সমুদ্রের দিকে তাকালেন। খারাপ নয় পরিকল্পনাটা, বিশেষত এসব ব্যাপারে যারা একটু আবেগপ্রবণ। তাদের ক্ষেত্রে ভালই বলা যায়। অবশ্য নিজের মৃত্যুর পর কি হবে, তা নিয়ে তিনি আদৌ কোন চিন্তা ভাবনা করেন না। হ্যানসনও যে চিন্তা করতেন, তা তিনি এতদিন জানতেন না। তবে চিন্তা যারা করে, তাদের পক্ষে সমাধিস্থ হবার উপযুক্ত স্থান নিঃসন্দেহে সমুদ্র। পাউন্ড খেয়াল করলেন। সমুদ্রের ঢেউয়ের জলের ছিটে ওক কাঠের কফিনটার গায়ে পড়ছে, কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারছে না। বন্ধু টিমথি, নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকো। কেউ তোমার বিরক্ত করবে না মনে মনে ভাবলেন পাউন্ড।

'..... সুতরাং আমাদের এই ভাই টিমথি জন হ্যানসনকে তোমার কোলেই চিরকালের জন্য তুলে দিলাম। আমাদের প্রভু জিসাস ক্রাইস্টের মাধ্যমে। আমেন।'

চমক ভাঙল পাউন্ডের। মন্ত্রপাঠ শেষ হয়েছে। আর্মিটেজদের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলেন তিনি। দু'জন জেলে কফিনের নিচে রাখা তক্তাটা ধরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের পাশে গিয়ে আর্মিটেজ দম্পতি কফিনের পিছনে হাতটা ঠেকালেন। আবার ইঙ্গিত করলেন পাউন্ড। জেলে দু'জন ধীরে ধীরে তাদের দিকের তক্তাটা উপরের দিকে ঠেলে তুলল। অন্য দিকটা নেমে গেল সমুদ্রের দিকে। শেষ পর্যন্ত কফিনটাও নড়ল। আর্মিটেজরা জোরে একটা ধাক্কা দিলেন। জোরে নড়ে উঠল কফিনটা। তারপর দ্রুত অন্যদিকে নেমে

গেল। কেঁপে উঠল ট্রেলারটা। একটা ভারী আওয়াজ করে ঢেউয়ের মধ্যে পড়ল গিয়ে কফিনটা। পড়েই ডুবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাউণ্ড উপরে ইঞ্জিন-ঘরে দাঁড়িয়ে থাকা চালকের দিকে তাকালেন। লোকটি হাত তুলে ফেরার রাস্তার দিকে নির্দেশ করল। আবার মাথা নাড়লেন পাউণ্ড। ইঞ্জিন চালু হল। বড় তক্তাটা ততক্ষণে ভিতরে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর্মিটেজরা এবং যাজক আবার কেবিনে ঢুকে পড়েছেন। বাতাসের বেগ বাড়ছে।

ব্রিক্সহ্যামে পেঁছিতে পেঁছিতে অন্ধকার নেমে এল। বন্দরের পিছনের বাড়িগুলোতে ক্রমশ আলো জ্বলে উঠছে। যাজকের গাড়িটা কাছেই পার্ক করা ছিল, তাতে চেপে তিনি চলে গেলেন। ট্রেলার চালকের টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিলেন পাউণ্ড। খুব খুশি সে। এক সপ্তাহের রোজগার আজ তার একদিনে হয়ে গেছে। লিমুজিনটা কাছেই অপেক্ষা করছিল। পাশে ব্যাজার মুখ করে দাঁড়িয়ে টার্কুইন আর্মিটেজ। পাউণ্ড গাড়িটায় আর্মিটেজদের তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। নিজে একা একাই ট্রেনে চেপে লণ্ডনে ফিরবেন বলে ঠিক করলেন।

'আপনি তাহলে মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত দাঁড়াচ্ছে সেটা হিসেব করে ফেলুন।' জোর দিয়ে বললেন মিসেস আর্মিটেজ, 'তাছাড়া উইলের সরকারি প্রতিলিপির আবেদনও দাখিল করে দিন। এসব নাটক-টাটক অনেক হয়েছে। এবার কাজটা এগিয়ে নিন।'

'ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কোন সময় নষ্ট হবে না।' শীতল স্বরে উত্তর দিলেন পাউণ্ড। 'আমি যোগাযোগ করব।' টুপিটা তুলে স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। মনে মনে চিন্তা করলেন ব্যাপারটায় খুব একটা সময় নেবে না। টিমথি হ্যানসনের সম্পত্তির মোট পরিমাণ এবং বিস্তারিত খুঁটিনাটি তিনি ইতিমধ্যেই জেনেছেন। সব কিছু ঠিকঠাক জায়গা মত থাকতে বাধ্য। বরাবরই হ্যানসন অত্যন্ত সতর্ক এবং হিসেবি লোক ছিলেন।

নভেম্বরের মাঝামাঝি পাউণ্ড আর্মিটেজদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ইচ্ছে করলে আরো আগেই করতে পারতেন। কিন্তু করেননি। গ্রেস ইন রোডে নিজের অফিসে শুধুমাত্র মিসেস আর্মিটেজকেই ডেকেছিলেন। কারণ উইলের একমাত্র উত্তরাধিকারী তিনিই। কিন্তু মিসেস আর্মিটেজ যথারীতি স্বামী-পুত্র সহ হাজির হলেন।

'একটা অদ্ভুত অবস্থায় পড়েছি', বললেন পাউণ্ড।

'কি নিয়ে ?'

'আপনার স্বর্গত ভাইয়ের সম্পত্তি নিয়ে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি। মিঃ হ্যানসনের সলিসিটর হিসেবে আমি মোটামুটি জেনেছি যে তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত বা সেগুলো কোথায় কী আছে। সেগুলো সবই মোটামুটি পরীক্ষা করেও নিয়েছি।'

'কি কি আছে ?' আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস আর্মিটেজ।

কিন্তু পাউণ্ড আর প্যাঁচে পড়তে রাজি নন। কোন তাড়াহুড়োও নেই তাঁর। ধীরে ধীরে বলে চললেন। 'তাঁর মোট সম্পত্তি সাতটি প্রধান ভাগে ভাগ করা রয়েছে। তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিকানার ৯৯শতাংশ রয়েছে এভাবে। প্রথমতঃ, তাঁর মূল্যবান, দুর্লভ মুদ্রা বিক্রির ব্যবসা। এটা পুরোপুরি ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে ব্যবসা। তিনিই ব্যবসার একমাত্র মালিক। এ ব্যবসার প্রতিষ্ঠাতা তিনি নিজের হাতে একে গড়ে তুলেছেন। তাছাড়া কোম্পানির মাধ্যমে কোম্পানির বাড়িটিরও মালিক তিনিই। যুদ্ধের পর বাড়ির দাম যখন খুবই কম ছিল, তখন তিনি এই বন্ধক দেওয়া বাড়িটি কেনেন। বন্ধকী টাকা অনেক দিনই শোধা হয়ে গেছে। কোম্পানি এখন বাড়িটির মালিক এবং কোম্পানির মালিক তিনি।'

'এর মোট দাম কি রকম হতে পারে ?' প্রশ্ন করলেন মিঃ আর্মিটেজ।

'সেটাও হিসেব করা হয়েছে', বললেন পাউণ্ড, 'বাড়ি, ডিলারশিপ, শেয়ার, অস্থাবর সম্পত্তি, কোম্পানির সুনাম ইত্যাদি রয়েছে। বাড়ির খানিকটা অংশ তিনটে সংস্থাকে ভাড়া দেওয়া রয়েছে। ভাড়া না বলে লিজ দেওয়া হয়েছে বলা ভাল, তারও সময় এখনো পেরোয়নি। সব মিলিয়ে বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড।'

দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিস দিয়ে উঠল টার্কুইন। মুখটা হাসিতে ভরে উঠল।

'আপনি এত সঠিক ভাবে জানলেন কী করে ?' জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ আর্মিটেজ।

'কারণ তিনি ওই টাকার বিনিময়ে পুরো সম্পত্তিটা বিক্রি করে দিয়েছেন।'

'কি করেছেন ?'

'মারা যাবার তিন মাস আগে তিনি ওই কোম্পানি যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর

সম্পত্তি সমেত এক ডাচ ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। ভদ্রলোক অনেকদিন ধরেই কোম্পানিটা কেনার জন্য ঘুরছিলেন, ধনী লোক। ওই টাকাতেই কেনা-বেচা হয়েছে।'

'কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তো ওই কোম্পানিতেই কাজ করে গেছেন', আপত্তি জানালেন মিসেস আর্মিটেজ। 'এ ব্যাপারটা আর কে কে জানে?'

'কেউ না', জানালেন পাউন্ড। 'এমনকি কর্মীরাও জানে না। ব্যাপারটার লিখিত চুক্তিপত্র যে উকিলকে দিয়ে করানো হয়েছে তিনিও কিছু বলেননি। ঠিকই করেছেন। বাকিটা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ব্যক্তিগত চুক্তি হয়েছে। কিছু শর্তও তাতে আছে। যেমন, যে পাঁচজন কর্মী এতে কাজ করেন। তাঁদের চাকরি বজায় থাকবে। হ্যানসন নিজে হয় একছরের শেষ পর্যন্ত নয় আমৃত্যু—এর একমাত্র ম্যানেজার থাকবেন, যেটা আগে হয়, সেই পর্যন্ত। বোঝাই যায়, ক্রেতা এসব শর্তকে সামান্য কথার কথা ভেবেই এগিয়েছেন।

'আপনার সঙ্গে ভদ্রলোকের দেখা হয়েছে?' প্রশ্ন করলেন মিসেস আর্মিটেজ।

'মিঃ ডি জং? হ্যাঁ, হয়েছে। ভদ্রলোক আমস্টারডামের সুবিখ্যাত মুদ্রা ব্যবসায়ী। তাছাড়া লিখিত চুক্তিপত্রও আমি দেখেছি। সব কিছু একদম নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ।'

'তাহলে টাকাটা নিয়ে উনি কি করলেন?' জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ আর্মিটেজ।

'ব্যাংকে জমা দিয়েছেন।'

'ঠিক আছে। কোন অসুবিধা নেই', মন্তব্য করল ছেলে।

'পরবর্তী অ্যাসেট হল কেন্টের বাগানবাড়ি। খুব সুন্দর বাড়ি, কুড়ি একর জায়গা জুড়ে সম্পত্তি। গত জুনে তিনি এই সম্পত্তি বন্ধক দেন পঁচানব্বই শতাংশ ফেরতের কড়ারে। মৃত্যু পর্যন্ত মাত্র একটা কিস্তি তিনি দিয়েছেন। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর বিল্ডিং সোসাইটি ওই বাড়ির আইনসঙ্গত মালিক হয় এবং তারাই এখন বাড়ির দলিল ও অন্যান্য নথিপত্রের অধিকার নিজের হাতে নিয়েছে। গোটা ব্যাপারটাই আইনসিদ্ধ, সঠিক।'

'এটার জন্য কত পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস আর্মিটেজ।

'দু' লক্ষ দশ হাজার পাউন্ড', বললেন পাউন্ড।

'এটাও ব্যাংকে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ। তারপর ধরুন, মেফেয়ারে একটা ফ্ল্যাট ছিল। সেটাও ব্যক্তিগত চুক্তির ভিত্তিতে ওই একই সময়ে বিক্রি করেছেন। এটার জন্য অন্য একজন উকিলকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বিক্রি করে পেয়েছেন এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। সেটাও ব্যাংকে রেখেছেন।'

'তাহলে, এ তো গেল তিনটে সম্পত্তি। আর কি আছে?' এবার প্রশ্ন টাকুইনের।

'এ তিনটে ছাড়া মূল্যবান, দুর্লভ মুদ্রার একটা ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল। এটা বেশ কয়েক মাস ধরে কোম্পানির মাধ্যমে কিছু কিছু করে বিক্রি করেছেন। এর হিসেবপত্র আলাদা করে তাঁর বাগানবাড়ির সিন্দুকে রাখা ছিল। সবকিছু নিখুঁত, প্রতিটি লেনদেনের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। প্রত্যেকবার বিক্রির পর টাকাটা ব্যাংকে রেখেছেন। তারপরে, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী, তাঁর শেয়ার দালাল আগস্টের আগেই তাঁর যাবতীয় শেয়ার বিক্রি করে টাকা তুলে নিয়েছেন। আর শেষমেশ তাঁর ছিল একটা রোলস্ রয়েস গাড়ি। সেটা আটচল্লিশ হাজার পাউণ্ডে বিক্রি করে দিয়ে নতুন একটা ভাড়া করেছিলেন। মৃত্যুর পর সেটা আবার পুরনো মালিকের কাছে চলে গেছে। তাছাড়া বিভিন্ন ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত ছিল। তাঁর সব সম্পত্তি মিলিয়ে মোট পরিমাণ দাঁড়াবে, আমার ধারণা, ৩০ লক্ষ পাউণ্ডের কিছু উপরে। আমি নিশ্চিত যে কিছুই আমার চোখ এড়িয়ে যায়নি।'

'আপনি বলতে চাইছেন', বললেন আর্মিটেজ সিনিয়র। 'যে মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর প্রতিটি সম্পত্তি বিক্রি করে বা নগদে পরিণত করে গোটা টাকাটা ব্যাংকে রেখেছেন, অথচ কাউকে কিছু বলেননি বা যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেন, কিংবা তাঁর পরিচিত, তাঁদের মনে সন্দেহের কণামাত্র দেখা দেয়নি?'

'ঠিক তাই। চমৎকার ধরেছেন', বললেন পাউণ্ড।

'যাক্‌গে, সেসব আমাদের অত দেখার দরকার নেই।' বলল টাকুইন। 'আমাদের টাকাটা পেলেই হল। এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে জীবনের শেষ কয়েকটা মাস মিঃ হ্যানসন আপনার কাজগুলো আপনারই জন্য করে গেছেন। যাক্‌গে, টাকাগুলো হিসেব করে ফেলুন। দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিন। কর-টর কি দিতে হবে দিয়ে দিন, বাকি টাকাটা আমাদের হাতে চলে আসুক।'

'দুঃখিত, সেটা পারছি না', বললেন পাউণ্ড।

'কেন?' মিসেস আর্মিটেজের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভের সূক্ষ্ম ছোঁয়াটা পাউণ্ডের

কান এড়াল না।

'যে টাকাটা সম্পত্তি বেচে তুলে উনি জমা রেখেছিলেন—'

'হ্যাঁ, সেটার কী হয়েছে?'

'উনি আবার সেটা তুলে নিয়েছেন।'

'কি করেছেন?'

'প্রথমে জমা করেছিলেন। তারপর পুরোটাই আবার তুলে নিয়েছেন। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে। ধাপে ধাপে, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে টাকাটা তুলেছেন। পুরোটাই। এবং নগদে।'

'তিরিশ লক্ষ পাউণ্ড কখনো নগদে তোলা যায়?' মিঃ আর্মিটেজের গলায় অবিশ্বাস স্পষ্ট।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যায়', বললেন পাউণ্ড। 'অবশ্যই পুরোটা এক সঙ্গে তুলতে পারবেন না। তবে বড় বড় ব্যাংকগুলোতে আগাম নোটিশ দিয়ে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত নগদে তুলতে পারেন। বহু ব্যবসায় নগদ অর্থ প্রচুর লাগে। যেমন ধরুন ক্যাসিনোতে, বাজি ধরার জায়গায়। আর যে কোন সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ব্যবসার ক্ষেত্রে তো লাগেই…'

পাউণ্ডের কথা মাঝপথেই থেমে গেল। ঘরে তখন প্রচণ্ড গোলমাল। মোটা হাত দিয়ে টেবিল চাপড়াচ্ছেন মিসেস আর্মিটেজ। তাঁর ছেলে আঙুল উঁচিয়ে কি একটা বলছে। তাঁর স্বামী এমন একটা ভঙ্গী করে বসে আছেন, যেন উনি কোন কড়া বিচারক। এক্ষুনি একটা কঠোর শাস্তি কিছু দেবেন। সবাই উত্তরোত্তর গলা বাড়িয়ে চলেছে।

'এটা কিছুতেই হতে পারে না……ছেড়ে দেওয়া যায় না……কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই রেখেছে…খুঁজে বের করুন…আপনারা দু'জনে ষড়যন্ত্র করে এটা করেছেন…'

শেষ মন্তব্যটা মার্টিন পাউণ্ডের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাল।

'চুপ করুন', গর্জে উঠলেন পাউণ্ড। শান্ত মানুষটির এই ফেটে পড়া এতই আকস্মিক, যে তিনজনই নিমেষে চুপ করে গেল। টার্কুইনের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন পাউণ্ড। 'এই যে, আপনি…আপনার শেষ মন্তব্যটা এখনই ফিরিয়ে নিতে হবে। আমার কথাটা কানে গেছে?'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল টার্কুইন। বাবা-মায়ের দিকে একবার তাকাল। দু'জনেই জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। বলল, 'দুঃখিত, মিঃ

পাউণ্ড।'

'এখন কথা হচ্ছে', বললেন পাউণ্ড। 'এই কৌশল আগেও অনেকে ব্যবহার করেছে। সাধারণত ট্যাক্স ফাঁকি দিতে এটা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে টিমথি হ্যানসন বলেই আমি অবাক হচ্ছি। ব্যাপারটায় কাজ খুব একটা হয় না। আপনি টাকাটা নগদে তুলে নিতে পারেন ঠিকই, কিন্তু সেটা খরচ করা তো দুঃসাধ্য ব্যাপার। অবশ্য টাকাটা তুলে উনি কোন বিদেশী ব্যাংকে জমা দিতে পারেন, কিন্তু এক্ষেত্রে উনি জানতেন যে ওনার মৃত্যু হতে চলেছে। কাজেই ও কাজটা এক্ষেত্রে অযৌক্তিক। ধনী ব্যাংকারদের আরো ধনী করার কোন ইচ্ছেই তাঁর ছিল না। উঁহু, টাকাটা উনি অন্য কোথাও রেখেছেন। অথবা ওটা দিয়ে কিছু একটা কিনেছেন। তবে যাই করে থাকুন, খুঁজে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। হয়তো বড় জোর খানিকটা সময় লাগবে। যদি কোথাও জমা রাখেন, খুঁজে বের করা যাবে আর যদি অন্য কিছু কিনে থাকেন তাও খুঁজে পাওয়া যাবে। তাছাড়া আর কিছু হোক না হোক, সম্পত্তি বিক্রি করলে বা সম্পত্তি কিনলে তার উপরে কর তো দিতেই হবে। অতএব অভ্যন্তরীণ রাজস্ব দপ্তরও ব্যাপারটা সম্পর্কে খোঁজখবর করতে চাইবে।'

'তা আপনার পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে কী কী করা সম্ভব?' প্রশ্ন করলেন মিঃ আর্মিটেজ।

'এখনও পর্যন্ত আমি ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করছি। উইল অনুযায়ী সে ক্ষমতাও আমার রয়েছে। আজকালকার দিনে সবই কম্পিউটারভিত্তিক। কিন্তু এখনো পর্যন্ত টিমথি হ্যানসনের নামে কোন ডিপোজিটের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাছাড়া দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলোতে এসম্পর্কে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, তারও এখনো পর্যন্ত কোন উত্তর আসেনি। হ্যানসনের প্রাক্তন ড্রাইভার মিঃ রিচার্ডসের সঙ্গেও দেখা করেছি, তিনি এখন দক্ষিণ ওয়েলসে থাকেন। কিন্তু উনিও কোন সাহায্য করতে পারেননি। তিনি কোনদিনই এক সঙ্গে প্রচুর নোট নগদে হ্যানসনের কাছে দেখেননি। অথচ এক্ষেত্রে দু'-একটা টাকা তো নয়, প্রচুর-প্রচুর টাকার ব্যাপার, কারুর না কারুর চোখে তো পড়তই। সুতরাং এখন প্রশ্ন হল, আর কি কি আমার করা উচিৎ বলে আপনারা মনে করেন?'

ঘরে উপস্থিত সবাই চুপ। সবাই চিন্তা করছে।

প্রয়াত বন্ধুর আচরণে পাউণ্ড নিজে মনে মনে যারপরনাই দুঃখিত হয়েছেন।

বোঝাই যাচ্ছে, ওনার উদ্দেশ্য কি ছিল। প্রয়াত আমার উদ্দেশ্যে পাউণ্ড এই প্রশ্নই করে যাচ্ছেন যে কেন তিনি এরকম কাজ করলেন? কী ভাবে তিনি চিন্তা করলেন যে তিনি পার পেয়ে যাবেন? অভ্যন্তরীণ রাজস্ব দপ্তরের দক্ষতার কথা কি তিনি জানেন না? নিজের আত্মীয় বলে পরিচিত সামনের ওই লোভী, সংকীর্ণমনা লোকগুলোকে কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ভয় ওই করবি ভাগের লোকগুলোকেই। এরা কাজে অক্লান্ত, অদম্য। এরা থামতে শেখেনি। এদের কাজের জন্য টাকার অভাব হয় না। যেখানে যা লুকোনো থাকুক, আমরা সবাই যখন হাল ছেড়ে দিই, ওরা ঠিক খুঁজে বের করে। যতদিন না লুকোনো জিনিসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন তারা খুঁজেই যাবে, খুঁজেই যাবে। না জানা পর্যন্ত থামবে না। সব খোঁজখবর নিয়ে, জেনে যদি দেখে যে ব্যাপারটা ব্রিটেনের বাইরে এবং তাদের আয়ত্বের বাইরে একমাত্র তখনই তারা এ সংক্রান্ত ফাইল বন্ধ করবে।

'আপনি ব্যাপারটা খোঁজ করে যেতে পারেন না?' জিজ্ঞাসা করলেন সিনিয়র আর্মিটেজ। গলায় সমীহ স্পষ্ট।

'কিছুদিন নিশ্চয়ই পারি', বললেন পাউণ্ড। 'তবে এটুকুও বলতে পারি যে আমি আমার যথাসাধ্য করেছি। তাছাড়া আমার নিজের প্র্যাকটিস আছে। সুতরাং পুরো সময় আমি তো ব্যয় করতে পারব না।'

'তাহলে এখন কি করতে বলেন?' প্রশ্ন করলেন নম্যান আর্মিটেজ।

'অভ্যন্তরীণ রাজস্ব দপ্তর তো আছেই', ধীরে ধীরে বললেন পাউণ্ড। 'আজ না হোক্ কাল আমাদের সব ব্যাপার জানাতেই হবে ওদের।'

'ওরা খুঁজে পাবে?' ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন মিসেস আর্মিটেজ, 'অবশ্য খুঁজে পেলে ওদেরও সুবিধা।'

'খুঁজে ওরা পাবেই', বললেন পাউণ্ড। 'ওদের অংশ ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ওদের পিছনে আছে।'

'কতদিন সময় লাগবে?' জিজ্ঞেস করলেন সিনিয়র আর্মিটেজ।

'তা একটু লাগবে', বললেন পাউণ্ড। 'অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি সাধারণত কোন ব্যাপারে ওরা তাড়াহুড়ো করে না। ভগবানের যাঁতাকলের মত, ধীরে ধীরে পিষে মারে...'

'কয়েক মাস লাগবে বোধ হয়?' এবার প্রশ্ন টার্কুইনের।

'মাস নয়, বছর', বললেন পাউণ্ড। 'ওরা হালও ছেড়ে দেবে না। আবার

তাড়াহুড়োও করবে না।'

'কিন্তু আমরা তো অতদিন অপেক্ষা করতে পারব না', চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস আর্মিটেজ। তাঁর সযত্নরক্ষিত মার্জিত আচরণের প্রলেপ ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। 'একটা না একটা রাস্তা খুঁজে বের করতেই হবে।'

'আচ্ছা, কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগালে হয় না?' বলল টার্কুইন।

কথাটা লুফে নিলেন মিসেস আর্মিটেজ। 'আপনি কি পারবেন কোন' প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে যোগাযোগ করতে?'

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ নয়, আমি বলি ব্যক্তিগত তদন্তকারী', বললেন পাউন্ড, 'হ্যাঁ, এটা সম্ভব। এর আগে নিখোঁজ উত্তরাধিকারী খুঁজে বের করার জন্য একজনকে কাজে লাগিয়েছিলাম। এই পেশায় খুবই সম্মানীয়। তবে তফাৎটা হল, অন্য জায়গায় সম্পত্তি থাকে, উত্তরাধিকারীদের খুঁজে বের করতে হয়। আর এখানে উত্তরাধিকারী রয়েছে, কিন্তু সম্পত্তি খুঁজে বের করতে হবে। তবুও...'

'ঠিক আছে, ওর সাথে যোগাযোগ করুন', বললেন মিসেস আর্মিটেজ।

'খুঁজে বের করতে বলুন কোথায় লোকটা টাকাগুলো রেখে গেল।'

লোভী আর কাকে বলে, ভাবলেন পাউন্ড। হ্যানসন কি ঘুণাক্ষরেও কোন দিন ভেবেছিলেন যে এরা এত লোভী?

'ঠিক আছে। তবে ভদ্রলোকের টাকা-পয়সার একটা ব্যাপার আছে। আর খরচ-খরচার ব্যাপারে আমার কাছে যে পাঁচ হাজার পাউন্ড ছিল, তার আর অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। বুঝতেই পারছেন, খরচ যা হবে ভেবেছিলাম, তার চেয়ে কিছু বেশিই হয়েছে। এই তদন্তকারীর ফি-ও একটু বেশি। অবশ্য, সেরা ইনিই...'

স্বামীর দিকে তাকালেন মিসেস আর্মিটেজ, 'নম্যান।'

ঢোক গিললেন সিনিয়র আর্মিটেজ। নতুন গাড়ি, গরমকালে ছুটি কাটানো...সব ছবি তখন একেএকে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেগুলো ভেস্তে যাবে? মাথা নাড়লেন নম্যান, 'ঠিক আছে' ওই পাঁচ হাজার পাউন্ডের বাকি টাকাটা শেষ হয়ে গেলে আমিই ওনার ফি দেবার দায়িত্ব নেব।'

'খুব ভাল', উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন পাউন্ড, 'ভদ্রলোকের নাম ইউসট্যাস মিলার। আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব। শুধু তাঁর সঙ্গেই। তিনি যে হারানো সম্পত্তি খুঁজে পাবেনই, এতে আমার কোন সন্দেহই নেই।

আজ পর্যন্ত কোন কাজে উনি ব্যর্থ হননি।'

তিন আর্মিটেজকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নিজের অফিস ঘরে ঢুকে গেলেন পাউন্ড। ইউসট্যাস মিলারকে ফোন করতে হবে এখনই।

চার সপ্তাহ ধরে মিঃ মিলারের কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কিন্তু আর্মিটেজরা থামার পাত্র নন। প্রশ্নে প্রশ্নে পাউন্ডকে প্রায় জর্জরিত করে ফেললেন তাঁরা। কোথায় গেল টাকাগুলো? উবে গেল নাকি? এ তো এখন তাঁদেরই সম্পত্তি। প্রাপ্য টাকা গেল কোথায়? প্রশ্নের চোটে জেরবার পাউন্ড। শেষ পর্যন্ত মিলারের কাছ থেকে খবর এল। তিনি জানিয়েছেন, যে তদন্ত চালিয়ে তিনি নির্দিষ্ট কিছু সূত্রে পেঁছেছেন। এতদিন ধরে কতটা এগোলেন তার একটা নির্দিষ্ট রিপোর্ট তিনি পেশ করতে চান।

এতদিনে পাউন্ডের নিজের কৌতূহলও শেষ সীমায় পেঁছেছে। তাই নিজের অফিসে তিনি একদিন বৈঠকের আয়োজন করলেন।

তদন্তকারী মিলার সম্পর্কে আর্মিটেজ পরিবারের বেশ উঁচু ধারণা তৈরি হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন মিলারের চেহারাটা জনপ্রিয় গোয়েন্দাদের ধাঁচে বেশ লম্বা-চওড়া, শক্তপোক্ত হবে। অনেকটা ফিলিপ মার্লো ধরণের। কিন্তু সামনাসামনি দেখে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়লেন। ইউসট্যাস মিলারের চেহারা ছোটখাট্টো, গোলগাল। কেমন একটা পবিত্র ভাব ছড়িয়ে রয়েছে মুখ-মণ্ডলে। মাথাভর্তি টাক, শুধু দু'পাশে ক'গাছি করে সাদা চুল রয়েছে। চোখে অর্ধেক লেন্সের চশমা। পরিধানে সুন্দর একটা স্যুট। ওয়েস্টকোটে জড়িয়ে রয়েছে সোনার ঘড়ি লাগানো চেন। সবাই আসার পর রিপোর্ট পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন মিলার।

চশমার উপর দিয়ে সবাইকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে মিলার শুরু করলেন, 'তিনটে সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে আমি তদন্ত শুরু করেছিলাম। প্রথমতঃ, মৃত্যুর আগে কয়েকমাস ধরে মিঃ হ্যানসন এই কাজগুলো করেছিলেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় চিন্তাভাবনা করে এবং নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। দ্বিতীয়তঃ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিঃ হ্যানসনের আসল উদ্দেশ্য তাঁর স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি না দেওয়া এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব দপ্তরকেও সম্পত্তির কানাকড়ি ছুঁতে না দেওয়া—'

'শালা বুড়ো বেজম্মা', ফুঁসে উঠল টার্কুইন।

'তোমার রেগে লাভ কি? তোমাকে তো আর কিছু দেয়নি', ধীর স্বরে

বললেন পাউন্ড, 'হ্যাঁ, বলুন মিঃ মিলার।'

'ধন্যবাদ। তৃতীয়তঃ, মিঃ হ্যানসন টাকাটা পুড়িয়েও ফেলেননি; কিংবা অথবা ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে পাচার করতেও যাননি। কারণ নগদে ওই টাকা নিতে গেলে অজস্র নোটের দরকার। সেটা সম্ভব নয়। সোজা কথায়, আমার ধারণা এই টাকাটা দিয়ে উনি কিছু কিনেছিলেন।

'সোনা? হীরে?' প্রশ্ন করলেন মিঃ আর্মিটেজ।

'নাঃ, সেসব সম্ভাবনা আমি খতিয়ে দেখেছি। তদন্ত করে সেসব সম্ভাবনা আমি নাকচ করে দিয়েছি। কিন্তু তারপরেই একটা জিনিসের কথা আমার মাথায় আসে। দারুণ মূল্যবান, কিন্তু আয়তন অল্প। তখন আমি জনসন ম্যাথি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করি। এঁরা সব মূল্যবান ধাতু বিক্রি করে থাকেন। সেখানেই আমি ওটা পেয়ে গেছি।'

'টাকাটা?' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল তিন আর্মিটেজ।

'উঁহু, উত্তরটা', বললেন মিলার। বোঝা যাচ্ছিল মুহূর্তটা দারুণ উপভোগ করছেন তিনি। অ্যাটাচি কেস থেকে এক বাণ্ডিল কাগজ বের করলেন মিলার।

'এগুলো লেনদেনের কাগজপত্র। জন ম্যাথির দোকান থেকে মিঃ হ্যানসন মোট আড়াইশ' প্ল্যাটিনামের বাট কিনেছেন। প্রতিটি বাট পঞ্চাশ আউন্সের। অত্যন্ত উচ্চমানের ৯৯.৯৫ শতাংশ বিশুদ্ধ প্ল্যাটিনাম।'

টেবিলের চারধার জুড়ে তখন নিস্তব্ধতা। বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে সবাই।

'তবে কাজটাকে খুব একটা বুদ্ধিমানের মত বলা যাচ্ছে না', দুঃখের সাথে বললেন মিলার। 'এক্ষেত্রে ক্রেতা তাঁর সব কাগজপত্র নষ্ট করে ফেললেও বিক্রেতা তারটা করেননি। করবেনও না। এই যে সেগুলো।'

'আচ্ছা, প্ল্যাটিনাম কিনলেন কেন?' মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন পাউন্ড।

'সেটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এখনকার লেবার গভর্ণমেন্টের আইন অনুযায়ী সোনা কিনতে গেলে বা রাখতে গেলে আপনাকে লাইসেন্স নিতে হবে। হীরে সহজেই চিনে ফেলা যায়। সেটা বিক্রি করাও সহজ নয়। যদিও থ্রিলারের বইগুলো পড়লে তা মনে হয় না। সেগুলো ভুল তথ্য। প্ল্যাটিনামের ক্ষেত্রে লাইসেন্স লাগে না। এখন তার দামও প্রায় সোনার সমান। প্ল্যাটিনাম এবং রেডিয়ামই এখন বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু। এটি কেনার সময়

মিঃ হ্যানসন খোলা বাজারের দাম দিয়েছেন। প্রতি আউন্স ৫০০ মার্কিন ডলার।'

'এটা কিনতে উনি মোট কত খরচ করেছেন?' জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস আর্মিটেজ।

'নিজের সব সম্পত্তি বেচে উনি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড পেয়েছিলেন। তার প্রায় পুরোটাই', বললেন মিলার। 'অবশ্য হ্যানসনের কেনা-বেচা সবটাই ছিল মার্কিন ডলারে। মোট ৬৫ লক্ষ ডলারের প্ল্যাটিনাম কিনেছেন অর্থাৎ সাড়ে বারো হাজার আউন্স। অথবা, আগে যা বলেছি, প্রতিটি পঞ্চাশ আউন্স ওজনের আড়াইশ' প্ল্যাটিনামের বাট।'

'সেগুলো নিয়ে রেখেছেন কোথায়?' চেঁচিয়ে উঠলেন মিঃ আর্মিটেজ।

'তাঁর কেণ্টের বাগানবাড়িতে', বললেন মিলার। নিজেকে সত্যিই উপভোগ করছিলেন তিনি। আস্তিনের তলায় তাঁর আরো তাস লুকোনো আছে। একে একে বেরোবে সেগুলো। ভেবেই পুলকিত হচ্ছেন তিনি।

'কিন্তু সেখানে তো আমি গিয়েছিলাম', বললেন পাউণ্ড।

'গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সবকিছুই দেখেছেন একজন আইনজীবীর চোখ দিয়ে। আমি দেখেছি তদন্তকারীর চোখে', বললেন মিলার।

'তাছাড়া আমি জানতাম যে আমি ঠিক কি খুঁজছি। তাই আমি বাড়ির ভিতরে কিছু খোঁজার চেষ্টাই করিনি। আমি বাইরের দিকের ঘরগুলো দিয়ে শুরু করেছিলাম। আপনি কি জানেন যে আস্তাবলের ঠিক পিছনে মিঃ হ্যানসনের নিজস্ব একটা কাঠের কাজের ওয়ার্কশপ ছিল? দারুণ সব অধুনিক যন্ত্রপাতিতে ভরা?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই', বললেন পাউণ্ড। 'এটাই ওর নেশা ছিল।'

'ঠিক তাই', বললেন মিলার। 'এখানেই আমি মনোযোগ দিলাম। গিয়ে দেখি জায়গাটা ঝকঝকে-তকতকে, সব পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। সম্ভবত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করা হয়েছিল।'

'রিচার্ডসই বোধহয় করেছে। হ্যানসনের শোফার। সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল ওর', বললেন পাউণ্ড।

'হয়তো, কিন্তু বোধহয় নয়। অত পরিষ্কার করার পরেও কাঠের মেঝেতে কিছু নোংরা দাগ লেগে ছিল। সেই জায়গার কাঠের কয়েকটা টুকরো আমি পরীক্ষা করিয়েছি। ডিজেল জ্বালানি। রহস্যের গন্ধই পেলাম। নিশ্চয়ই এখানে

কোন মেশিন ছিল, ইঞ্জিন বা ওই ধরণের কিছু। এর বাজার ছোট, কাজেই সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই উত্তরটা পেয়ে গেলাম। গত মে মাসে মিঃ হ্যানসন একটি ডিজেল চালিত শক্তিশালী বৈদ্যুতিক জেনারেটর কিনে তাঁর ওয়ার্কশপে বসিয়েছিলেন। মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি এটি বিক্রি করে দেন। সেকেন্ডহ্যান্ড দামে।'

'নিশ্চয়ই বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রগুলো চালানোর জন্যই কিনেছিলেন?' বললেন পাউন্ড।

'না, ওগুলো বৈদ্যুতিক লাইন থেকেই চলত। সেটা নয়, অন্য কিছু চালানোর জন্যই ওগুলো কিনেছিলেন। এমনকিছু, যা চালানোর জন্য প্রচন্ড শক্তি দরকার। আরো এক সপ্তাহ পর আমি সেটাও বের করে ফেলেছি। একটা ছোট্ট, আধুনিক, দক্ষ চুল্লি। সেটাও আগেই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। এবং আমি নিশ্চিত হাতা, চিমটে, গ্লাভস ইত্যাদি কোন নদী বা হ্রদের নিচে পড়ে আছে। তবে মিঃ হ্যানসনের থেকেও আমার চোখটা একটু বেশি তীক্ষ্ণ। তাই মেঝেতে কাঠের দুটো তক্তার মাঝে আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। জায়গাটা সাধারণ দৃষ্টির অগম্য; কাঠের গুঁড়ো দিয়ে ঢাকা ছিল। কাজ করার সময়ই জিনিসটা মেঝেতে পড়েছিল। এই যে সেটা।'

এটাই মিলারের তুরুপের তাস। তাই ধীরে সুস্থে বের করলেন সেটা। অ্যাটাচি কেস থেকে একটা সাদা কাগজ বের করে ধীরে ধীরে মোড়কটা খুললেন। ভেতর পাতলা, জমাট বাঁধা একটা ধাতুর ফালি বেরিয়ে আলো লেগে চকচক করতে লাগল। বোঝাই যাচ্ছে জিনিসটা হাতার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে। জমাট বেঁধে গেছে। সবাই হ্যাঁ করে সেটা দেখতে লাগল। মিলার অপেক্ষা করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে বললেন, 'জিনিসটা আমি বিশ্লেষণ করিয়েছি। ৯৯.৯৫ শতাংশ খাঁটি উঁচুমানের প্ল্যাটিনাম।'

'পুরোটাই খুঁজে পেয়েছেন?' ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস আর্মিটেজ।

'না ম্যাডাম, এখনো পাইনি। তবে পাব। ভয় পাবেন না। প্ল্যাটিনাম কেনা স্থির করে মিঃ হ্যানসন কিন্তু একটা ভুল করেছিলেন। প্ল্যাটিনামের একটা ধর্মের কথাকে বোধহয় তিনি তেমন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ওজন। এখন অন্ততঃ আমি নিশ্চিত ভাবে জানি যে ঠিক কোন্ জিনিসটা আমরা খুঁজছি। অতি সাধারণ দেখতে একটা কাঠের বাক্স,

কিন্তু···এটাই মূল কথা···তার ওজন হবে, ধরুন আধ টনের একটু কম···'

একটা আহত জন্তুর মত গর্জন করে অদ্ভুত ভাবে চিৎকার করে উঠলেন মিসেস আর্মিটেজ। মাথাটা ছিট্‌কে উঠল তাঁর। প্রায় ফুটখানেক লাফিয়ে উঠলেন মিলার। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন মিঃ আর্মিটেজ। রাগে লাল হয়ে উঠে দাঁড়াল টাকু'ইন আর্মিটেজ, চিৎকার করে উঠল। 'শালা শুয়োরের বাচ্চা বেজন্মা!'

হতভম্ব মিলারের দিকে অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন পাউন্ড। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'হে ভগবান, ও তো ওর সঙ্গেই সব নিয়ে গেছে।'

দিন দু'য়েক বাদে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব দপ্তরকে সব তথ্য জানালেন পাউন্ড। তারা সব কাগজপত্র পরীক্ষা করল, বোঝাই গেল খুবই অখুশি হয়েছে তারা। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনরকম আগ্রহ তারা দেখাল না।

বেশ খুশিমনে, দ্রুত পদক্ষেপে ব্যাংকের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল বার্ণি স্মি। আর একটু বাদেই বড়দিনের ছুটি শুরু হয়ে যাবে। তবে বার্ণি নিশ্চিত, তার আগেই সে ব্যাংকে পেঁছে যাবে। খুশির কারণটা গোঁজা রয়েছে তার বুক-পকেটে—বেশ বড় অংকের একটা চেক। গত কয়েকমাস ধরেই সে এরকম চেক পেয়ে আসছে। এটাই অবশ্য শেষ। বার্ণি পেশায় ব্যবসায়ী। মনিরত্ন ব্যবসায় পুরনো মাল কেনাবেচা করাই তার ব্যবসা। বেশ ঝুঁকির ব্যবসা। তবে গত কয়েকমাসে যে টাকা সে রোজগার করেছে, কুড়ি বছর ধরে ব্যবসা করেও অত টাকা তার রোজগার হয়নি।

অবশ্য এই ঝুঁকিটা নেওয়া ঠিক সিদ্ধান্তই ছিল। মনে মনে নিজেকে অভিনন্দন জানায় বার্ণি। তবে ঝুঁকিটাও ছিল বিরাট, তাছাড়া আজকাল প্রায় সবাই ট্যাক্সের বোঝা এড়াতে চায়। এক্ষেত্রেও বিক্রেতা শুধু নগদে কারবার করতে চেয়েছিল। শুধু সেইজন্য এমন একটা সৌভাগ্যের উৎস ছেড়ে দেওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হত? রুপোলি চুলওয়ালা লোকটা নিজের নাম বলেছিল রিচার্ডস। প্রমাণ হিসেবে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখিয়েছিল সে। তার কথা বুঝতে বার্ণির কোন অসুবিধাই হয়নি। লোকটা বহুদিন আগে ৫০ আউন্সের প্ল্যাটিনাম বাটগুলো কিনেছিল। তখন দামও সস্তা ছিল। এগুলো যদি খোলা বাজারে জনসন ম্যাথির মাধ্যমে বিক্রি করত, তাহলে নিঃসন্দেহে দাম কিছু বেশি পেত। কিন্তু সম্পদ কর? তাতে যে কত যেত, কে জানে!

যাই নিক্, বার্ণি'র অত খোঁজ খবরে দরকার কি ?

তাছাড়া নগদ ব্যবসারই এখন রমরমা এসব লাইনে। বাটগুলো খাঁটি। জনসন ম্যাথি থেকে যে এগুলো কেনা হয়েছিল, তা বোঝা যায় বাটের গায়ে কোম্পানির চিহ্ন দেখে। তবে ক্রমিক সংখ্যাগুলো তুলে দেওয়া হয়েছে। এতে নিঃসন্দেহে লোকটার ক্ষতি হয়েছে, কারণ ক্রমিক সংখ্যা না থাকায় খোলা-বাজারের দামের থেকে অনেক কম পাচ্ছে সে। বার্ণি' তাকে কেনা দাম দিচ্ছে, আউন্সপ্রতি ৪৪০ মার্কি'ন ডলার। তবে ক্রমিক সংখ্যা না তুললে আবার অভ্যন্তরীণ রাজস্ব দপ্তর মালিককে খুঁজে বের করে ফেলত। যাই হোক্ না কেন, লোকটা নিজের ভাল নিশ্চয়ই বোঝে।

ধীরে সুস্থে পঞ্চাশটা বাটই বিক্রি করে দিয়েছে বার্ণি' স্মি। নিজেও আউন্স প্রতি দশ ডলার করে লাভ রেখেছে। পকেটে যে চেকটা আছে সেটা শেষ দু'টো বাট বিক্রির টাকা। কিন্তু বার্ণি' স্মি জানে না যে ব্রিটেনের আরো চারটি জায়গায় তারই মতো আরো চারজন গোটা শরৎকাল জুড়ে ৫০টা করে ৫০ আউন্সের প্ল্যাটিনাম বাট বিক্রি করে চলেছে সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কে'টে। বিক্রির টাকা চলে যাচ্ছে সেই রুপোলি চুলের বিক্রেতার কাছে। সাইড স্ট্রিট দিয়ে ঘুরে ওল্ড কেণ্ট রোডে পড়ল বার্ণি' স্মি। রাস্তার মোড়েই একটি লোক ট্যাক্সি থেকে নামছিল। দু'জন মুখোমুখি ধাক্কা খেল। দু'জনেই দুজনের কাছে ক্ষমা চাইল, শুভ বড়দিন উপলক্ষে অভিনন্দন জানাল। নিজের রাস্তায় চলে গেল বার্ণি' স্মি।

অন্য লোকটি পেশায় সলিসিটর, গের্ন'সে-তে থাকে। ট্যাক্সি থেকে নেমে সামনের বাড়িটির দিকে তাকাল সে। টুপিটা ঠিক করে নিল, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দশ মিনিট বাদেই দেখা গেল লোকটি একটি ঘরে বসে সেই অনাথ আশ্রমের মাদার সুপিরিয়রের সঙ্গে কথা বলছে।

'আচ্ছা মাদার সুপিরিয়র, আপনাদের এই সেণ্ট বেনেডিক্টস্ অরফ্যানেজ কি চ্যারিটি অ্যাক্ট-এর অধীনে রেজিস্টার্ড' ?

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বললেন মাদার সুপিরিয়র।

'বাঃ', বললেন সলিসিটর। 'তাহলে তো আর কোন অসুবিধাই নেই। আপনাদের ক্ষেত্রে সম্পত্তি হস্তান্তর করা-ও প্রযোজ্য নয়।'

'কি প্রযোজ্য নয় ?'

'উপহার কর, বলা হয় সাধারণত', একটু হেসে বললেন সলিসিটর।

'একটা আনন্দের খবর জানাচ্ছি আপনাকে। এক ভদ্রলোক, আমারই মক্কেল, আপনার অনাথ আশ্রমে এক বিশাল অংকের টাকা দান করেছেন। অবশ্য তাঁর পরিচয় আপনাকে জানাতে পারছি না। আইনজীবী মক্কেল লেনদেনে অনেক সময়েই অনেক গোপন ব্যাপার থাকে। সেগুলো বজায় রাখতে হয়।'

প্রতিক্রিয়ার জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন সলিসিটর। কিন্তু শ্বেতকেশ বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী তখন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছেন।

'আমার মক্কেলের নামটা জানাতে পারছি না। তবে তিনি আমায় স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে ঠিক আজকের দিনে। ক্রিসমাস ঈভে আমি যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি এবং এই খামটা আপনাকে দিই।'

ব্রিফকেস থেকে একটা মোটা খাম বের করে মাদার সুপিরিয়রের হাতে তুলে দিলেন সলিসিটর। মাদার খামটা হাতে নিলেন, কিন্তু খোলার কোন চেষ্টাই করলেন না।

সলিসিটর বলে চললেন, 'এতে একটা সার্টিফায়েড ব্যাংক চেক আছে। গের্নসে-র একটি খ্যাতনামা মার্চেন্ট ব্যাংক থেকে চেকটি নেওয়া হয়েছে। ভাঙানোও যাবে সেই ব্যাংকেই। চেকটি কাটা হয়েছে সেন্ট বেনেডিক্টস্ অরফ্যানেজের নামে। ভিতরে কি আছে তা আমি দেখিনি। আমার ওপর ওইটুকুই নির্দেশ ছিল।'

মাদার সুপিরিয়রের হতভম্ব ভাব তখনো কাটেনি। হাতে খামটা ধরে শুধু বললেন, 'কোন উপহার কর লাগবে না?' আসলে, দান জিনিসটা তো আর ঘন ঘন আসে না, আসে অনেক দেরি করে করে। তাও লড়াই করে করে নিয়ে আসতে হয়।

'এই চ্যানেল আইল্যাণ্ডে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের মূল এলাকা থেকে কিছুটা আলাদা' শান্তস্বরে বললেন সলিসিটর। 'এখানে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর কর নেই। তাছাড়া এখানকার ব্যাংকে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। গের্নসেতে বা চ্যানেল আইল্যাণ্ডে দানের উপর কোন কর ধার্য হয় না। যে দান গ্রহণ করবে, সে যদি ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের মূল ভূ-খণ্ডের বাসিন্দা হয়, তাহলে সে সেখানকার কর আইনের আওতায় পড়বে। যদি না তা ইতি মধ্যেই মকুব করা হয়। যেমন ধরুন চ্যারিটি আইন অনুসারে অনেক-সময়েই কর মকুব হয়ে থাকে। যাই হোক্, আপনি এই রসিদে একটা সই করে দিন, যে একটা খাম পেয়েছেন, ভিতরে কি আছে তা অজ্ঞাত। তাহলে আমার

কাজ চুকে যায়। আমার দক্ষিণা আমি এর মধ্যেই পেয়ে গেছি, সামনে বড়দিন তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাই।'

মিনিট দুয়েক বাদেই মাদার সুপিরিয়র ঘরে একা। আস্তে আস্তে ছুরি দিয়ে খামটা কাটলেন। ভিতর থেকে বের করলেন একটা সার্টিফায়েড চেক। চেকের উপর লেখা অঙ্কটা যখন দেখলেন, তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর জপের মালাটা টেনে এনে জোরে জোরে ঘোরাতে লাগলেন আর প্রার্থনা করতে লাগলেন। নিজেকে খানিকটা সামলে নেবার পর দেওয়ালের সামনে রাখা—পবিত্র ক্রুশের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রায় আধঘণ্টা ধরে প্রার্থনা করতে লাগলেন মাদার সুপিরিয়র।

প্রার্থনা সেরে নিজের ডেস্কে যখন ফিরে এলেন মাদার সুপিরিয়র, তখনও তাঁর মনে হচ্ছিল, শরীরটা যেন দুর্বল লাগছে। চেকটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ২৫ লক্ষ পাউণ্ড! এই পৃথিবীতে এত টাকা কারুর থাকে? মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন এত টাকা নিয়ে কী করবেন? একটা সময়-ভিত্তিক বীমা করা যায়। একটা ট্রাস্ট ফাণ্ড করা যায়। অনাথ আশ্রমের আজীবনের ব্যবস্থা হয়ে গেল, এটা ঠিক। অন্তত তাঁর জীবনের একটা উচ্চাকাঙ্খা পূর্ণ হবে এবার। তাঁর দীর্ঘদিনের ইচ্ছে, অনাথ আশ্রমটাকে লণ্ডনের বস্তি থেকে বের করে এনে কোন গ্রামে খোলামেলা জায়গা দেখে স্থাপন করা। সেক্ষেত্রে অনাথ আশ্রমে আরো বেশি শিশুদের ঠাঁই দিতে পারবেন। তাছাড়া……

নাঃ, আর পারা যাচ্ছে না। একটার পর একটা চিন্তা ভিড় করে আসছে। ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে আসতে চাইছে তারা। কি যেন জিনিসটা? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, গত সপ্তাহেই রবিবারের কাগজে বিজ্ঞাপনটা দেখেছিলেন। চোখে পড়েছিল বিজ্ঞাপনটা, দেখেই মনে হয়েছিল এরকমই দরকার। হ্যাঁ, এটাই উপযুক্ত, এখানেই যাবেন তিনি। এটা কিনে নেবার মত অর্থও এখন তাঁর হাতে আছে। একটা স্বপ্ন সফল হবে। বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল কাগজের সম্পত্তি সংক্রান্ত স্তম্ভে। একটা বাগানবাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন। কেণ্টে ২০ একর জায়গা জুড়ে একটা বাগানবাড়ি……

'আপনাকে কিছু বলার জন্য জোরাজুরি করা হবে না ঠিকই, তবে আপনি যা বলবেন তা লিখে নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে তা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।'

সন্দেহভাজন আসামীকে সরকারিভাবে সতর্ক করার সময় ব্রিটিশ ও আইরিশ পুলিসবাহিনীতে এই ধরনের বাক্যই ব্যবহার করা হয়।

মোড়টা পেরিয়ে এসে পুলিসের বড় গাড়িটা পুলিস কর্ডন থেকে ফুট পঞ্চাশেক দূরে ব্রেক কষে দাঁড়াল। গোটা রাস্তাটাই পুলিস ঘিরে রেখেছে উৎসাহী দর্শকদের ঠেকানোর জন্য। ক্রমাগত ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। ড্রাইভার ইঞ্জিনটা চালু রেখে দিল। ওয়াইপার দুটো কাচের উপর থেকে বৃষ্টির জল পরিষ্কার করেই চলেছে। গাড়ির পিছনের সিট থেকে চিফ পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট উইলিয়াম জে. হ্যানলি বন্ধ কাচের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকালেন। পুলিস কর্ডনের বাইরে শুধু উৎসাহী দর্শকের মুখ। ভিতরে সরকারি কর্মীদের বিরস বদন।

'এখানেই দাঁড়াও', ড্রাইভারকে বললেন হ্যানলি। খুশি হল ড্রাইভার; গাড়ির ভিতরটা বেশ গরম, আরামদায়ক। আজকের মত একটা দিনে এই বৃষ্টির মধ্যে বস্তির রাস্তায় হাঁটাচলা করাটা খুব একটা আরামদায়ক নয়। সে মাথা নেড়ে ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিল।

গাড়ি থেকে নেমে দরজাটা সজোরে বন্ধ করলেন পুলিস সুপার। গাঢ় নীল রং-য়ের ওভারকোটটা দিয়ে আরো ভালোভাবে মুড়ে নিলেন শরীরটা। তারপর হাঁটতে শুরু করলেন পুলিস কর্ডনের দিকে। জনতা যেখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, তার মাঝে এক জায়গায় খানিকটা ফাঁক। সর্বাঙ্গ ভিজে এক পুলিস অফিসার সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যানলিকে দেখে দ্রুত একটা স্যালুট করে সে সরে দাঁড়াল। ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি।

বিশালদেহী বিল হ্যানলি সাতাশ বছর ধরে পুলিসে আছেন। রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে আজকের অবস্থানে উঠে এসেছেন। চেহারাটা এখনো দেখার মত ভারি। ৬ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বা, শক্ত গুঁড়ির মত চেহারা। তিরিশ বছর আগে আয়ার্ল্যাণ্ডের রাগবি ফুটবল টিমের

অন্যতম সেরা সদস্য ছিলেন তিনি। সেই অবস্থাতেই পুলিসে যোগদেন, তারপরেও খেলা চালিয়ে গেছেন অনেকদিন। তাতে তাঁর পদোন্নতিও আটকায়নি।

কাজটা খুবই পছন্দ তাঁর, পুলিসের কাজ। খুব তৃপ্তি পান কাজ করে। অবশ্য মাইনে খুব একটা ভাল নয়, থানায় থাকতেও হয় অনেকক্ষণ। তবে সব কাজেই এমন কিছু কিছু ব্যাপার থাকে যা আদৌ উপভোগ্য নয়। যেমন আজ সকালের কাজটা। একজনকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা।

এই এলাকাটায় আগে ছোট ছোট, গায়ে গায়ে লাগানো কয়েকটা একঘরের বাড়ি ছিল। কয়েকটার উপরেও একটা করে ঘর ছিল। খুবই ঘিঞ্জি জায়গা। নাম ছিল গ্লস্টার ডায়মণ্ড। গত দু'বছর ধরে ডাবলিনের সিটি কাউন্সিল এই ছোট ছোট বাড়িগুলো ভেঙে আসছে।

কেন যে জায়গাটাকে গ্লস্টার ডায়মণ্ড নামে ডাকা হত, তা এক রহস্য। গ্লস্টারের ইংরেজ রাজবাড়ির যে সৌন্দর্য, আদবকায়দা রয়েছে, তার কিছুই এখানে নেই। স্রেফ কলকারখানায় ঘেরা ঘিঞ্জি বস্তির মত জায়গাটা। এখন অধিকাংশ বাড়িই ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এখানকার পুরনো বাসিন্দাদের ছোট ছোট খুপরির মত কাউন্সিল অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে স্থান দেওয়া হয়েছে। বাড়িগুলো দেখলেই কেমন যেন অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে আধমাইল দূর থেকেও সেগুলো দেখা যায়।

বিল হ্যানলের এলাকার মধ্যেই বাড়িগুলো পড়ে। তাই সকালের কাজটা যতই ঘৃণ্য হোক না কেন, এটা তাঁরই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

গোটা মেয়ো রোড জুড়ে থিকথিক করছে লোক। দু লাইন ধরে দু'টো শেকল তৈরি হয়েছে যেন। মাঝখানের দৃশ্যটা থমথমে, গম্ভীর। রাস্তার একধারে ভাঙা ইট-পাথরের একটা স্তূপ পড়ে আছে। খানিক বাদেই মাটি খোঁড়ার লোকেরা সেখানে আসবে। শুরু হবে নতুন শপিং কমপ্লেক্সের ভিত খোঁড়ার কাজ। তবে আপাতত মনোযোগটা অন্যদিকে। সামনে অন্তত ১০০ ফুট জায়গার মধ্যে কোন বাড়ি অবশিষ্ট নেই। গোটা জায়গাটা বড়াভাজার মত দেখতে লাগছে। নতুন করে দু'-একর জায়গা জুড়ে গাড়ি পার্ক করার জায়গা করা হয়েছে। পাশেই তৈরি হবে নতুন নতুন সব অফিসবাড়ি। সমস্ত জায়গাটা ন'ফুট উঁচু তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। অথবা বলা ভাল, প্রায় পুরো জায়গাটা।

কারণ ঠিক মাঝখানে, মেয়ো রোডের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে একটা মাত্র বাড়ি। ঠিক যেন সুন্দর, মসৃণ বাড়িতে একটা মাত্র ভাঙা দাঁত। আশেপাশের সব বাড়িগুলো ভাড়া হয়ে গেছে। এই বাড়িটারও দু'দিক মোটা কাঠের বিম দিয়ে ঠেকনো দিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়িটার তিনদিক ঘিরে রয়েছে কার পার্কিং জোন। আজ সকালের তৎপরতার প্রধান লক্ষ্য এই বাড়িটি এবং তার অধিবাসী এক সদাভীত বৃদ্ধ ভদ্রলোক। রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন এদের নিয়েই মজা দেখার প্রত্যাশায় রয়েছে। এরাও আগে আশেপাশের বাড়িগুলোয় থাকত, এখন নতুন অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে উঠে গেছে। শেষ প্রতিবেশীটিকে কীভাবে উচ্ছেদ করা হয়, তা দেখার জন্যই এরা ভিড় করে এসেছে।

নিঃসঙ্গ বাড়িটার সামনের দরজাটার ঠিক উল্টোদিকেই সরকারি কর্তারা সব দাঁড়িয়ে। সেদিকেই এগিয়ে গেলেন হ্যানলে। সবাই তখন বাড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। শেষ পর্যন্ত সময় এসেছে। কিন্তু যখন এসেছে তখন কেউই বুঝতে পারছে না, কাজটা কীভাবে করা হবে। দেখার মত বিশেষ কিছুই নেই। সামনে খানিকটা চাতাল, তার পাশেই নিচু ইটের দেওয়াল। তার পাশে বাগানের মত কিছু একটা রয়েছে, তবে তাতে কোন গাছ নেই, স্রেফ কিছু বুনো ঝোপঝাড় হয়ে রয়েছে। বাড়ির একপাশে সামনের দরজা, তার নানা জায়গা ফাটা, দোমড়ানো। বহু ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয়েছে দরজাটার গায়ে, তারই চিহ্ন। হ্যানলে জানেন যে ওই বন্ধ দরজাটার পিছনে চৌকো একটা বারান্দা আছে, সেটা ধরে সোজা এগিয়ে গেলে সরু সিঁড়ি পড়বে। বারান্দার ডানদিকে দরজা, বসবার ঘরের। একটাই ঘর, জানালাগুলো ভাঙা, কোনরকমে পিচবোর্ড দিয়ে তাপ্পি দেওয়া রয়েছে। এই দুইয়ের মাঝখানে ছোট্ট, নোংরা রান্নাঘর। তার পাশে বাইরে বেরোনোর দরজা। বসার ঘরে আগে বোধহয় একটা ফায়ারপ্লেস ছিল। কারণ চিমনিটা এখনো আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটার পিছন দিকে একটা উঠোন মত আছে, ২৫ ফুট লম্বা এবং বাড়িটার সমান চওড়া। উঠোনটা ৬ ফুট উঁচু কাঠের তক্তা দিয়ে ঘেরা। অনেকেই তক্তার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে, তারা হ্যানলেকে বলেছে গোটা উঠোনটা মুরগির পায়খানায় ভরা। বৃদ্ধ মানুষটি উঠোনের গায়ে একটি খাঁচা বানিয়ে চারটি মুরগি পুষত। ব্যস্, এই, আর কিছুই নেই।

বৃদ্ধের জন্য অনেক চেষ্টা করেছে সিটি কাউন্সিল। তাকে ঝকঝকে,

পরিচ্ছন্ন নতুন কাউন্সিল ফ্ল্যাটে উঠে যাবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, এমনকি অন্য কোথাও ছোট একটি বাড়ি করে দেবার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। সমাজসেবী, উদ্ধারকারী, চার্চের লোকজন অনেকেই তার সঙ্গে দেখা করেছে। তারা নানারকম যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে, ভাল ভাল কথা বলেছে, একটার পর একটা চূড়ান্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বুড়ো কোথাও নড়বে না। কিছুতেই না। তার বাড়ির আশপাশের বাড়িগুলো একটার পর একটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তবু বৃদ্ধ অটল, অনড়। এদিকে কাজ শুরু হয়ে গেছে, কার পার্ক তৈরি করে তার বাড়ির তিনদিক ঘিরে বেড়া উঠে গেছে। তবু তাকে ওঠানো যায়নি।

বুড়োকে নিয়ে স্থানীয় খবরের কাগজগুলোর লাফালাফির শেষ নেই। তার নাম দেওয়া হয়েছে, 'মেয়ো রোডের সাধক।' স্থানীয় বাচ্চাগুলোরও মজা করার লক্ষ্য ওই বুড়ো। বাড়ির প্রায় সব জানলাগুলো ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারা ভেঙে দিয়েছে। জানলার কাচ ভাঙার শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভেসে আসত বুড়োর অশ্রাব্য গালাগাল। খুব মজা পেত বাচ্চারা।

শেষ পর্যন্ত নগর পরিষদ উচ্ছেদের নোটিস জারি করল। ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন, জোর করে বের করে দেওয়া হোক বাড়ির অধিবাসীকে। সেই হুকুমের পরই শহরের যাবতীয় শক্তি এই ভিজে নভেম্বরের সকালে বুড়োর বাড়ির সামনে জড়ো হয়েছে।

হ্যানলেকে অভ্যর্থনা জানালেন চিফ হাউসিং অফিসার। 'বড়ই দুঃখের কাজ, কী বলুন', বললেন তিনি, 'ব্যাপারটাই খারাপ। এই উচ্ছেদ করা জিনিসটাকে আমি ঘৃণা করি।'

'ঠিকই', বললেন হ্যানলি। লোকগুলোকে একবার দেখে নিলেন তিনি। কাজটা করার জন্য সরকারের তরফে বাড়ি ভাঙার দু'জন লোকও হাজির হয়েছে। বিশালদেহী দু'টো লোক। কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তারা যথেষ্ট অস্বস্তিতে রয়েছে। এছাড়াও নগর পরিষদের দু'জন প্রতিনিধি, হ্যানলের অধঃস্তন দুই পুলিসকর্মী, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিভাগের একজন, এক স্থানীয় ডাক্তার এবং আরো কেউ কেউ হাজির রয়েছে। স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রবীণ ফোটোগ্রাফার বার্ণ কেলেহার যথারীতি হাজির। সঙ্গে এক অল্পবয়সী রিপোর্টার। স্থানীয় প্রেসের সঙ্গে হ্যানলের সম্পর্ক সবসময়েই ভাল। বিশেষত পুরনো যেসব সাংবাদিক বা ফোটোগ্রাফার রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি বরাবরই সুসম্পর্ক

রেখে চলেন, তবে নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব বজায় রেখে যে যার কাজ করে। কাজেই সম্পর্ক নষ্ট করে, ঝগড়া করে লাভ কারুরই নেই। বার্ণি চোখ টিপল, হ্যানলেও মাথা নাড়লেন। কথা বলতে এগিয়ে এল রিপোর্টারটি। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি জোর করে ভদ্রলোককে উচ্ছেদ করে দেবেন?'

বার্ণি কেলেহার তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল রিপোর্টারের দিকে। হ্যানলে নিমেষের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ায় ধূসর চোখদু'টো দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। পিছিয়ে গেল রিপোর্টার। না বললেই ভাল ছিল কথাটা। গম্ভীর গলায় হ্যানলে বললেন, 'যথাসম্ভব ভদ্র আচরণ করারই চেষ্টা করব আমরা।' তীব্রগতিতে লিখতে লাগল রিপোর্টার, এত ছোট একটা বাক্য তার মনে থাকবে না, তা নয়, কিন্তু অন্য একটা কিছুর দিকে আপাতত মনটা নিবদ্ধ রাখা দরকার।

ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে বলা হয়েছে, ঠিক ন'টার সময়ে উচ্ছেদ করতে হবে। এখন ন'টা বেজে দু'মিনিট হয়েছে। চিফ হাউসিং অফিসারের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলেন হ্যানলে, 'শুরু করুন।'

অফিসার বাড়িটার দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে জোরে দরজায় ধাক্কা মারলেন। কোন সাড়া নেই। এবার চিৎকার করে ডাকলেন।

'মিঃ লারকিন, ভিতরে আছেন কি?'

কোন সাড়া নেই। হাউসিং অফিসার তাকালেন হ্যানলের দিকে।

হ্যানলেও মাথা নাড়লেন। গলা খাঁকারি দিয়ে অফিসার এবার জোরে জোরে উচ্ছেদের নোটিসটা পড়তে লাগলেন, যাতে ভিতর থেকে জিনিসটা শোনা যায়। এবারও কোন উত্তর নেই। নোটিসটা পড়ে তিনি আবার ফিরে এলেন রাস্তায়।

'মিনিট পাঁচেক সময় দেওয়া যাক, কী বলুন?' বললেন তিনি।

'বেশ', বললেন হ্যানলে। গ্রস্টার ডায়মণ্ডের প্রাক্তন বাসিন্দাদের ভিড়ে ততক্ষণে কিঞ্চিৎ গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত পিছনের দিকে একজন মোটামুটি সাহস সঞ্চয় করে উঠল।

'ওকে ছেড়ে দিন', চিৎকার করে লোকটা বলে উঠল, 'বুড়ো মানুষ, কোথায় যাবে?'

ধীর পদক্ষেপে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেলেন হ্যানলে। প্রত্যেকের চোখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলেন। প্রায় সবাই চোখ সরিয়ে নিল;

সবাই চুপ করে রইল।

'আপনারা কি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন ?' নরম সুরে প্রশ্ন করলেন হ্যানলে। 'এই সহানুভূতির জন্যই কি জানলার সবক'টা কাচ গত শীতে ভেঙেছে ? ঠাণ্ডায় লোকটা জমে গেছে প্রায়। এই সহানুভূতির জন্যই কি লোকটার দিকে ইট-পাটকেল, কাদার গোলা এসব ছোঁড়া হয়েছে ?' দীর্ঘ নীরবতা। 'সবাই চুপ করে দাঁড়ান, কথা বলবেন না', বলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন হ্যানলে। বাড়ি ভাঙার জন্য নিয়ে আসা লোকদু'টি তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিল। তাদের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, 'যাও, শুরু করো।'

দু'জনের হাতেই একটা করে শাবল। একজন হেঁটে বাড়িটার একপাশে চলে ড্রাইভার বুড়োটায় পিছনের বেড়া এবং বাড়ির একটা কোণ একজায়গায় মিশে বসাল। বুড়ো [illegible]ব্রায় শাবলের চাড় দিয়ে সে বেড়ার তিনটে তক্তা খুলে ফেলে [illegible]ন্দনে টাঙানো খাদ্য ও [illegible] পড়ল। তারপর পিছনের দরজাটার সামনে গিয়ে জোরে [illegible]মালিকও ভিজে [illegible]। সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা তার সংগী শব্দটা শুনে [illegible] [illegible]জাতেও ধাক্কা মারল। তবু কোন শব্দ নেই। সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি শাবলের ধারালো দিকটা দু'টো দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে নিমেষে দরজাটা খুলে ফেলল। ইঞ্চি তিনেক খুলে কিন্তু আটকে গেল দরজাটা। দরজার গায়ে আসবাবপত্র ঠেস দিয়ে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। বিষন্নভাবে মাথা নাড়ল লোকটি, তারপর শাবলের চাড় দিয়ে দু'টো দরজাই পুরোপুরি খুলে দিল। দরজাগুলো তুলে রেখে দিল সামনের বাগানে। দরজার গায়ে চেয়ার-টেবিলের স্তূপ করা রয়েছে। আস্তে আস্তে সেগুলো সরাতে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত বারান্দায় ঢুকে লোকটি ডাকল, 'মিঃ লারকিন ?' ঠিক সেই সময়ে আবার দরজা ভাঙার শব্দ পাওয়া গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তিও রান্নাঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েছে।

রাস্তা পুরোপুরি নিশ্চুপ। লোক দু'টো একতলায় খুঁজে বেড়াতে লাগল। এমন সময় দোতলার শোবার ঘরের জানলায় একটা বিবর্ণ মুখ উঁকি মারল। জনতার চোখে পড়ে গেল সেটা।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একসঙ্গে তিন-চারটে কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে উঠল। 'ওই তো, ওইখানে রয়েছে।' ঠিক যেন শিকারীর পিছন পিছন আসা শিকারী কুকুর-গুলো হঠাৎ তাড়া খাওয়া শেয়ালের সন্ধান পেয়েছে। এরাও সাহায্য করতে চাইছে। সামনের দিকে দাঁড়ানো বাড়ি ভাঙার লোকটি ঘুরে তাকালো।

উপরের শোবার ঘরের জানলার দিকে ইঙ্গিত করলেন হ্যানলে। দু'জনেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো। জালনা থেকে বিবর্ণ মুখটাও অদৃশ্য হয়ে গেলো। কোন ধ্বস্তাধ্বস্তি হলো না। মিনিটখানেক বাদেই লোক দু'টি নেমে এলো; সামনের লোকটি পাঁজাকোলা করে শীর্ণ, বৃদ্ধ লোকটিকে নিয়ে নামল। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এসে তাকাতে লাগল এদিক ওদিক। একজন তাড়াতাড়ি একটা কম্বল নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধের গায়ে জড়িয়ে দিল। বাড়ি ভাঙতে আসা লোকটিও এবার বুড়োকে নামিয়ে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিল। পুরোপুরি অনাহারক্লিষ্ট চেহারা, খানিকটা যেন হতচকিত হয়ে গেছে। তবে সবচেয়ে বেশি পেয়েছে ভয়। মনস্থির করে ফেললেন হ্যানলে। নিজের গাড়ির দিকে ফিরে গাড়ির ড্রাইভারকে ডাকলেন তিনি। বাড়ি [illegible] ব্যাপারে তাঁর প্রয়োজন আছে ঠিকই, তবে সেটা পরে হলেও চল[illegible] সবার আগে লোকটাকে ভালো করে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে এক[illegible] সময়ে উচ্ছেদ করতে [illegible]ওয়াতে হবে। [illegible]এনটা নিবন্ধ [illegible]উসিং অফিসারের দি[illegible]

বুড়োকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে [illegible], 'ওকে গাড়ির পিছনে তুলে দাও।' নরম উষ্ণতার মধ্যে বুড়ো [illegible]ম করে গাড়িতে বসার পর হ্যানলে উঠে তার পাশে গিয়ে বসলেন।

'চলো, এখান থেকে বেরোনো যাক্', ড্রাইভারকে বললেন হ্যানলে, 'আধমাইল দূরে রাস্তার দ্বিতীয় মোড়টায় একটা কাফে রয়েছে। সেখানেই চলো।'

বেড়া পেরিয়ে, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা লোকগুলোর পাশ দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে আসার পর হ্যানলে তাঁর পাশে বসে থাকা বিচিত্র অতিথিটির দিকে তাকালেন। বুড়োর পরনে নোংরা একটা প্যাণ্ট, গায়ে বুক খোলা জামার উপর একটা পাতলা জ্যাকেট। বোঝাই যাচ্ছে, বছরের পর বছর শরীরের কোন যত্ন নেওয়া হয়নি। সারা মুখময় খোঁচা খোঁচা দাগ, গাল তোবড়ানো, গাড়ির পিছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে সে চুপচাপ সামনের দিকে চেয়ে আছে। হ্যানলের দিকে একবারও তাকাল না সে।

ধীর স্বরে হ্যানলে বললেন, 'একদিন না একদিন এটা হতই, আজ হোক্, আর কাল হোক্। আপনিও তো সেটা জানতেন।'

হ্যানলে চেহারাতেও বিশাল, ক্ষমতাতেও অসীম। তাঁকে দেখলে অনেক দুঁদে ক্রিমিন্যালের প্যাণ্ট ভিজে যায়। তবু তিনি পারতপক্ষে রূঢ় ব্যবহার

করেন না। বরং অভিজ্ঞতা বলে, সহানুভূতি দেখিয়ে, ভাল ব্যবহার করে ফল অনেক ভাল হয়। হ্যানলেও তাই করেন, যদিও তাঁর মাংসল মুখ এবং দু'বার ভাঙা নাক দেখে তা মনে হয় না। এবারেও তাঁর কথা শুনে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

'বাড়ি নিয়ে চিন্তা নেই।' আবার বললেন হ্যানলে, 'ওরা আপনাকে ভাল একটা জায়গায় বাড়ি দেখে দেবে। শীতে সেখানটা গরম থাকবে, ভাল খাবার পাবেন। দেখবেন, ভালই হবে আপনার।'

গাড়িটা কাফের সামনে দাঁড়াল। হ্যানলে গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে বললেন, 'ওকে ভিতরে নিয়ে এসো।'

গরম কাফেতে ঢুকে কোণের একটা ফাঁকা টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করলেন হ্যানলে। ড্রাইভার বুড়োকে সঙ্গে করে টেবিলের নিয়ে গিয়ে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে বসাল। বুড়ো কিছুই বলল না, না ধন্যবাদ, না প্রতিবাদ। কাউন্টারের পিছনে টাঙানো খাদ্য ও মূল্য তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন হ্যানলে। কাফের মালিকও ভিজে তোয়ালেটা দিয়ে হাতটা মুছে জিজ্ঞাসু চোখে চাইল।

'দুটো ডিম, বেকন, টোম্যাটো, সসেজ আর চিপ্স,' অর্ডার দিলেন হ্যানলে, 'ওই কোণের দিকে বুড়ো লোকটাকে। আর আগে এক কাপ গরম চা দিন।' কাউন্টারে দু'-পাউন্ডের একটা নোট দিলেন হ্যানলে, বললেন 'পরে এসে চেঞ্জটা নিয়ে যাব।'

বুড়োকে টেবিলে বসিয়ে ড্রাইভার কাউন্টারে ফিরে এলো। হ্যানলে বললেন, 'এখানে থেকে লোকটার দিকে একটু নজর রাখো। আমি নিজেই গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।'

খুশিই হল ড্রাইভার। শুভদিন আজ। প্রথমে গরম গাড়ি, তারপর গরম কাফে। এখন দরকার এক কাপ চা খেয়ে সিগারেটে বেশ মৌজ করে কয়েকটা টান।

'ওর সঙ্গে বসে থাকতে হবে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল সে, 'আসলে ওর গায়ে খুব গন্ধ!'

'না, ঠিক আছে, শুধু চোখটা রাখো।' বললেন হ্যানলে। তারপর নিজেই গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন মেয়ো রোডের বাড়ি ভাঙার জায়গায়।

গোটা দল তখন তৈরি। সময় নষ্ট করা চলবে না। কনট্রাক্টরের লোকেরা দলে দলে বাড়ির ভিতরে ঢুকছে, বাইরে বেরোচ্ছে। বাড়ির ভিতরের সব নোংরা

জিনিসপত্রগুলো বের করে এনে সেই বৃষ্টির মধ্যেই ডাঁই করে রেখেছে রাস্তার উপর। হাউসিং অফিসার ছাতা মাথায় দিয়ে সব দেখছেন। কার পার্ক চত্বরে দুটো যান্ত্রিক গাঁইতি অপেক্ষা করছে। সময় হলেই তাদের রবারের চাকাগুলো সচল হবে, ভাঙা শুরু হবে বাড়ির পিছন দিকটা। তাদের পিছনে অপেক্ষা করছে একটা ট্রাক, বাড়ি ভাঙা হলে ইট-কাঠ পাথরের স্তূপ বয়ে নিয়ে যাবার জন্য। জলের লাইন, বিদ্যুৎ সংযোগ, গ্যাস—এসব মাসখানেক আগেই কেটে দেওয়া হয়েছে। ফলে বাড়িটা আরো নোংরা, আরো স্যাঁতসেতে হয়েছে। নর্দমা-টর্দমা কোনদিনই এখানে ছিল না, তাই বাইরে সেপটিক ট্যাংক হিসেবে যেটা করা হয়েছিল, সেটা এবার বুজিয়ে ফেলে কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করে দেওয়া হবে। হ্যানলে গাড়ি থেকে নেমে আসার পর পরিষদের হাউসিং অফিসার তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। কাউন্সিলের ভ্যানের পিছনে খোলা দিকটার দিকে হাত তুলে দেখালেন তিনি।

'ঘরের মধ্যে অনেক কিছু ছিল যার হয়তো খানিকটা সেন্টিমেন্টাল মূল্য রয়েছে।' বললেন তিনি, 'পুরনো ছবি, মুদ্রা, ফিতে জড়ানো মেডেল, কাপড়-চোপড়, একটা সিগার বক্সে কিছু ব্যক্তিগত কাগজপত্র এই সব রয়েছে। আর আসবাবপত্র……।' কিছুদূরে একটা স্তূপের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, 'ওই যে সব রয়েছে। মেডিক্যাল অফিসার পরামর্শ দিয়েছেন ওগুলো পুড়িয়ে ফেলতে। ওর বদলে একটা কানাকড়িও পাওয়া যাবে না।'

'হুঁ', আওয়াজ বেরোলো হ্যানলের মুখ দিয়ে। হাউসিং অফিসার ঠিকই বলেছেন, তবে এটা তাঁর সমস্যা। ভদ্রলোক বোধহয় নৈতিক সমর্থন চাইছেন।

'এগুলোর জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে?' জানতে চাইলেন হ্যানলে।

'নিশ্চয়ই', বললেন অফিসার। তাঁর দপ্তর যে একেবারে হৃদয়হীন পশু নয়, এটা বোঝাবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব। বললেন, 'বাড়িটা নিজস্ব সম্পত্তি। তার তো ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবেই, তাছাড়া আসবাবপত্র, অন্যান্য জিনিস, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যে কোন কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা ধ্বংস হলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তাছাড়াও এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার জন্য একটা স্থানান্তর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়ে থাকে……যদিও সত্যি কথা বলতে গেলে এতদিন ধরে বাড়িটা আঁকড়ে পড়ে থেকে ভদ্রলোক আমাদের অনেক টাকা ক্ষতি করে দিয়েছেন, ক্ষতিপূরণে চাইতে বেশিই হবে সেটা।'

এই সময় একজন লোক বাড়ির একটা কোণ থেকে বেরিয়ে এলো, তার দু'হাতে দু'টো মুরগি ধরা রয়েছে।

'এগুলোকে নিয়ে কী করব?' লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

ওদিকে বার্ণি কেলেহার সঙ্গে সঙ্গে পটাপট ছবি তুলে ফেলল। ভাল ছবি হবে, মনে মনে চিন্তা করল বার্ণি। মেয়ো রোডের সাধকের শেষ বন্ধু। ক্যাপশনটাও দুর্ধর্ষ। কন্ট্রাকটরের একজন লোক বলল, সে মুরগি পোষে। এদু'টোকেও সে নিয়ে যেতে পারে। তখন কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স যোগাড় করে ভিজে মুরগি দু'টোকে তার মধ্যে পুরে ফেলা হল। আপাতত তাদের রাখা হল কাউন্সিল ভ্যানে, পরে তারা ওই কর্মীর বাড়িতে চলে যাবে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। ছোট বাড়িটার সব জিনিস পুড়িয়ে ফেলা হল। ঘাম চকচকে শরীরে এক বিশালদেহী ফোরম্যান এসে দাঁড়াল হাউসিং অফিসারের সামনে।

'এবার তাহলে শুরু করি?' সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের মালিক চান যত দ্রুত সম্ভব কার পার্কটা শেষ করে বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে। আজ রাতের মধ্যে গাঁথনিটা শেষ করে ফেলতে পারলে কাল রং করে দেব।'

হাউসিং অফিসার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'ঠিক আছে, শুরু করুন।' ফোরম্যান এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে চলমান ক্রেনের দিকে হাত নাড়িয়ে ইঙ্গিত করল। ক্রেন চালু হল, ঘুরতে শুরু করল আধ টন ওজনের লোহার বল। ধীরে ধীরে ক্রেনটা বাড়িটার দিকে এগোলো, তারপর এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াল। হাইড্রলিক ফিট্-এর উপর ভর দিয়ে, হিস্ হিস্ আওয়াজ করে ক্রেনটা এবার উঁচু হয়ে উঠল। লোহার বলটা প্রথমে আস্তে আস্তে ঘুরতে শুরু করল, কিন্তু ক্রমশ তার জোর এবং ঘোরার পরিধি দুইই বাড়ল। জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। ঠিক এইভাবেই তারা নিজেদের বাড়িগুলোকেও গুঁড়িয়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু অন্যের বাড়ি ভাঙতে দেখার দৃশ্যটা আরো আকর্ষণীয়। শেষ পর্যন্ত ভারী লোহার বলটা গিয়ে চিমনির কাছে বাড়িটার দেওয়ালে আঘাত করল। প্রায় ডজনখানেক ইট খসে পড়ল সেইসঙ্গে বাড়িটার দেওয়ালে লম্বালম্বি দু'টো ফাটল দেখা দিল। জনতার মধ্যে একটা উত্তেজনার আওয়াজ উঠল—'আঃ···হাঃ···' অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা হন্দ হয়ে গেছে, একঘেয়েমিটা কাটানোর জন্য বাড়ি ভাঙার দৃশ্যটা খুবই কার্যকর। পর পর চারবার ঘা খাবার পর ওপরের জানলা

দ্'টো ফ্রেম থেকে খসে নিচে কার পার্কে পড়ে গেল। বাড়িটার একটা কোণা অন্য অংশের থেকে আলাদা হয়ে গেল। তারপর নিজে নিজেই খানিকটা দ্লে পিছনের দিকের উঠোনে পড়ে গেল। মিনিটখানেক বাদেই চিমনির শক্ত-পোক্ত ইটের গাঁথনিটা ঠিক মাঝখান থেকে ভেঙে গেল; আর ওপরের অংশটা বাড়ির ছাদ ভেঙে মেঝেতে হ্ড়ম্ড়িয়ে পড়ল। দীর্ঘদিনের প্রনো বাড়িটা অবশেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। দার্ণ উপভোগ করছে জনতা। হ্যানলে গাড়িতে উঠে ফিরে গেলেন কাফেতে।

আবহাওয়া আগের থেকে গরম হয়েছে আরো; খানিকটা স্যাঁতসেঁতেও হয়েছে। হ্যানলের ড্রাইভার বার কাউণ্টারে এক কাপ ধ্মায়মান চা নিয়ে বসে আছে। হ্যানলে ভিতরে ঢুকতে সে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে চেপে টুল থেকে উঠে দাঁড়াল। বৃদ্ধ তখনো কোণের টেবিলে ব্যস্ত।

'খাওয়া শেষ হয়েছে?' প্রশ্ন করলেন হ্যানলে।

'ভীষণ দেরি করছে স্যার', বলল ড্রাইভার, 'এতো মাখন মাখানো র্টি খেয়ে চলেছে, যেন আজই ওর জীবনের শেষ খাওয়া।'

হ্যানলে তাকালেন বৃদ্ধের দিকে। আরো এক টুকরো সাদা, নরম র্টি ম্খে চলে গেল। ম্খ নড়তে শ্র্ করল।

'এই র্টিগ্লো অতিরিক্ত চার্জ পড়বে', বলল কাফের মালিক, 'এর মধ্যে উনি তিন প্লেট খেয়ে ফেলেছেন।'

হ্যানলে ঘড়ির দিকে দেখলেন। এগারোটা বেজে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি একটা টুলে বসলেন। তারপর ওয়েটারকে ডেকে এককাপ চা দিতে বললেন।

স্বাস্থ্য অফিসারকে হ্যানলে বলে এসেছেন আধঘণ্টা বাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বৃদ্ধকে পরিষদের দায়িত্বে নিয়ে নিতে। তারপর তিনি অফিসে ফিরে কাজকর্ম করতে পারবেন। এ ব্যাপারটা থেকে সরে আসতে পারলে বাঁচা যায়।

বার্ণ কেলেহার এবং তার সঙ্গী রিপোর্টার ভিতরে ঢুকল।

'ওনাকে ব্রেকফাস্ট খাওয়াচ্ছেন?' প্রশ্ন করল বার্ণ।

'পরে দাম নিয়ে নেব', হ্যানলে বললেন। কিন্তু বার্ণ জানে, হ্যানলে তা নেবে না। হ্যানলে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছবি-টবি তুললে?'

বার্ণ কাঁধ নাচাল। 'তুলেছি কয়েকটা, ম্রগির ছবিটা ভাল হয়েছে।

চিমনির উপরের অংশটা ভেঙে পড়ার ছবিটাও তুলেছি তারপর বুড়োকে কম্বলে জড়িয়ে বের করে আনার ছবিটা। একটা যুগের অবসান। আমার মনে পড়ছে একসময় ডায়মণ্ডে দশ হাজার লোক থাকত। সবাই কাজ করত। রোজগার বেশি করত না ঠিকই কিন্তু তবু কাজ করত। তখনকার দিনে একটা বস্তি তৈরি হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর লাগত। এখন পাঁচ বছরেই তৈরি হয়ে যায়।'

হ্যানলে হাসলেন, 'উন্নতির লক্ষণ', বললেন তিনি।

আরো একটা পুলিসের গাড়ি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। একজন অল্পবয়সী অফিসার গাড়ি থেকে নামলেন। ইনি মেয়ো রোডেই দাঁড়িয়েছিলেন। কাঁচের দরজা দিয়ে অফিসার দেখলেন, হ্যানলে প্রেসের সঙ্গে কথা বলছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি থেমে গেলেন, রিপোর্টার এখনো এটা দেখেনি। বার্ণি কেলেহার দেখেছে, কিন্তু এমন ভান করল যেন দেখেনি। হ্যানলে টুল থেকে উঠে দরজার কাছে গেলেন। বাইরে বৃষ্টি তখনো পড়ছে। তার মধ্যে তরুণ অফিসার হ্যানলেকে বললেন, 'আপনি একবার আসুন স্যার। ওরা··· একটা জিনিস পেয়েছে।'

ড্রাইভারকে ডাকলেন হ্যানলে, সে বাইরে এলো। হ্যানলে বললেন, 'আমি একটু বেরোচ্ছি। বুড়োর ওপরে নজর রেখো।' তিনি আবার কাফের দিকে দেখলেন।

কোণের টেবিলে বুড়োর খাওয়া তখন থেমে গেছে। এক হাতে একটা কাঁটাচামচ ধরা, আর এক হাতে রুটি দিয়ে মোড়া আধখানা সসেজ। কিন্তু কোন হাতই নড়ছে না। স্থির হয়ে চুপচাপ দরজার বাইরে তিনটে পুলিস ইউনিফর্মের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বৃদ্ধ।

মেয়ো রোডে সব কাজ তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ডেমোলিশন স্কোয়াডের লোকেরা কাজ বন্ধ করে ধ্বংসস্তূপের ওপর জটলা করে বসে আছে। তাদের সঙ্গে বসে আছে পুলিসরাও। গাড়ি থেকে নেমে, ভাঙা ইট-কাঠের টুকরোর উপর দিয়ে হেঁটে তাদের কাছে গেলেন হ্যানলে। সবাই নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। হ্যানলেকে দেখে জনতার মধ্যে আবার গুঞ্জন উঠল।

কেউ একজন চিৎকার করে বলল, 'এগুলো বুড়োরই সম্পত্তি।' জনতা গুঞ্জন করে তাকে সমর্থন জানাল। লোকটি আবার বলল, 'ও সম্পত্তি মাটির নিচে পুঁতে রেখেছে ; সেজন্যই বাড়ি ছেড়ে যেতে চাইত না।'

হ্যানলে জায়গাটায় পেঁছে দেখতে লাগলেন, সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুটা কি। ভাঙা চিমনির পাঁচ ফুট উঁচু গাঁথনিটা এখনো রয়েছে। তার চারধারে ইট-কাঠ-পাথরে স্তূপাকার। এরই মধ্যে পুরনো কালো ফায়ার প্লেসটা এখনো দেখা যাচ্ছে। তার একদিকে দু'ফুট মতো বাইরের দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। এর নিচে, বাড়ির ভিতর দিকে একটা ইটের স্তূপের মধ্যে একটা মানুষের দু'টো পা দেখা যাচ্ছে। পা দু'টো দোমড়ানো, জীর্ণ,-শুকিয়ে গেছে প্রায়—তবু মানুষের পা বলে ভালভাবেই চেনা যাচ্ছে। হাঁটুর নিচে যে জিনিসটা জড়িয়ে রয়েছে সেটাকেও মোটামুটি মোজা বলে চেনা যায়।

'এটা দেখল কে?' জিজ্ঞাসা করলেন হ্যানলে।

ফোরম্যান এগিয়ে এলো, বলল, 'টমি একটা গাঁইতি নিয়ে এখানে চিমনিটার উপর কাজ করছিল। এখন থেকে কয়েকটা ইট সরাতেই ও এটা দেখতে পায়। তখন আমাকে ডাকে।'

হ্যানলে বুঝলেন, সাক্ষী হিসেবে লোকটি প্রথম শ্রেণীর।

'জিনিসটা কি মাটির নিচে ছিল?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'না, এই এলাকার বাড়িগুলো সব জলা জায়গার উপর তৈরি। তাই রাজমিস্ত্রীরা মেঝেগুলোয় সিমেণ্টের পাকা গাঁথনি করে দিয়েছে।

'তাহলে ছিল কোথায়?'

ফোরম্যান ঝুঁকে পড়ে ফায়ারপ্লেসের গুঁড়ির ভিতরটা দেখাল। বলল, 'বসার ঘরের ভিতর থেকে মনে হয়, ফায়ারপ্লেসটা দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো। আসলে তা নয়। আসলে এই অংশটা দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আছে। কেউ একজন চিমনির বুক থেকে ঘরের শেষ পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করে একটা ইটের দেওয়াল তুলে দিয়েছে। দেওয়ালটা উঠে গেছে ঘরের ছাদ পর্যন্ত। ফলে প্রায় ১২ ইঞ্চি গভীর ছাদ সমান একটা খোপ তৈরি হয়েছে। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য ঘরের অন্যদিকেও এরকম একটা খোপ বানানো হয়েছে। তবে এটা ফাঁকা ছিল। ঘরের দেওয়াল এবং ভুয়ো দেওয়ালটার মধ্যেই মৃতদেহটা ছিল। কাজটা ঢাকা দেবার জন্য ঘরে নতুন ওয়ালপেপার লাগানো হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখুন, চিমনির সামনে আর ভুয়ো দেওয়ালে একই ওয়ালপেপার।'

লোকটির আঙুল অনুসরণ করে দৃষ্টি চালনা করলেন হ্যানলে। ঠিকই চিমনির সামনের অংশে এবং মৃতদেহ ঘিরে থাকা বা চাপা দেওয়া ইটের উপর

একই রকম ওয়ালপেপার লাগানো। পুরনো কাগজ, রোজবার্ড প্যাটার্ন বলে একে। কিন্তু বাড়ির আসল দেওয়ালে, ফায়ারপ্লেসের পাশে, আরো পুরনো, দাগ কাটা কাটা একটা কাগজ লাগানো। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ফারাকটা।

হ্যানলে উঠে দাঁড়ালেন। 'ঠিক আছে', বললেন তিনি, 'আজ তোমরা এখানেই কাজ শেষ করো। আর যারা রয়েছে, তাদেরও চলে যেতে বলো। ব্যাপারটা আমরাই হাতে নিলাম।' ইটের পাঁজার উপর থেকে সব উঠে পড়তে শুরু করল সঙ্গে সঙ্গে। হ্যানলে তাঁর অধীনস্থ দুই পুলিস কর্মীর দিকে ঘুরলেন।

'শোনো', বললেন হ্যানলে, 'লোকজন কাউকে এদিকে আসতে দেবে না। গোটা জায়গাটা ঘিরে রাখো। আরো বহু লোক আসবে, কাজেই আরো বড় পুলিসি বেড়া তৈরি করতে হবে। আমি চাই, কোন দিক দিয়েই যেন জায়গাটায় আসা না যায়। আমি আরো লোক পাঠাচ্ছি। ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্টের লোকেদেরও পাঠাচ্ছি। তারা কিছু না বলা পর্যন্ত কোন কিছুতে হাত দেবে না, ঠিক আছে?'

দুজনে অভিবাদন জানাল প্রত্যুত্তরে। হ্যানলে গাড়িতে উঠেই সদর দপ্তরে ফোন করে পরপর বেশ কয়েকটা নির্দেশ জারি করলেন। তারপর হিউস্টন রেলস্টেশনের পিছনে অবস্থিত পুরনো ভিক্টোরিয়াম ব্যারাকে তদন্ত ব্যুরোর প্রযুক্তি ও প্রয়োগ বিভাগে ফোনে যোগাযোগ করলেন। কপাল ভাল। ওপাশে ফোন ধরলেন ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেণ্ট ও'কিফে। দুজনে বহুকালের জানাশোনা। হ্যানলে তাঁকে কি কি ঘটেছে সব জানিয়ে নিজে কি কি চান, সেগুলো বললেন।

'ঠিক আছে, সব পাঠিয়ে দেবো', ফোনে ভেসে এল ওকিফের গলা।

'মার্ডার স্কোয়াডের হাতে কেসটা তুলে দেবে, না কি?'

'না', বললেন হ্যানলে, 'আমার মনে হয় আমরাই এটা সামলে দিতে পারব।'

'কাউকে সন্দেহ করছ?' জিজ্ঞাসা করলেন ওকিফে।

'হ্যাঁ, একজন রয়েছে। সন্দেহটা তারই ওপরে', বললেন হ্যানলে।

ফোন করার পর হ্যানলে চলে গেলেন কাফেতে। বার্নি কেলেহার তখন প্রাণপণে চেষ্টা করছে জনতার ভিড়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা করতে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে তার। তার পাশ দিয়েই চলে গেলেন হ্যানলে। এবার

আর পুলিসের পাহারাদায় বার্ণিকে সাহায্য করছে না।

কাফেতে ফিরে হ্যানলে দেখলেন, ড্রাইভার তখনো কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ো তখন নিজের টেবিলে বসে, খাওয়া শেষ করে গরম চায়ে চুমুক দিচ্ছে। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। একদৃষ্ট তাকিয়ে রইল বুড়ো তার দিকে।

টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে হ্যানলে বললেন, 'আমরা মৃতদেহটা খুঁজে পেয়েছি।' এত নিচু স্বরে বললেন যে ঘরের আর কেউ তাঁর কথা শুনতে পেল না।

'তাহলে এখন আমাদের যাওয়া দরকার, তাই না মিঃ লারকিন? এখন একবার পুলিস স্টেশনে যাওয়া দরকার। আমাদের একটু কথাবার্তা বলার রয়েছে, চলুন।'

একটাও কথা না বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধ। ততক্ষণে হ্যানলের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে যে বুড়ো এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। কিন্তু একটা যেন বুড়োর চোখে ঝিলিক মেরে গেল। ভয়? স্বস্তি? সম্ভবত ভয়। কোন সন্দেহ নেই এই এতগুলো বছর লোকটা প্রচণ্ড ভয় নিয়ে কাটিয়েছে।

ধীরে ধীরে বৃদ্ধ উঠল। হ্যানলের দৃঢ় হাত তার কনুই ধরে রয়েছে, দু'জনে পুলিসের গাড়িতে উঠলেন। ড্রাইভার ও তাঁদের পিছন পিছন গিয়ে স্টিয়ারিং-এর পিছনে বসল। ততক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বাতাসে কয়েকটা টফির মোড়ক রাস্তায় এমনভাবে উড়ছে, যেন হেমন্তের বাতাসে শুকনো পাতা উড়ে যাচ্ছে।

গাড়ি আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল। বুড়ো এক জায়গায় কুঁকড়ে বসে আছে, দৃষ্টি সামনের দিকে। চুপচাপ বসে আছে সে।

'থানায় চলো', বললেন হ্যানলে।

টেলিভিশনে খুনের রহস্যভেদ দেখার সময় মনে হয়, ব্যাপারটা কী দারুণ। দুর্দান্ত সব আন্দাজ, অনুমান ইত্যাদি দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই খুনের তদন্তের ব্যাপারটা মোটামুটি একইরকম—রুটিনমাফিক তদন্ত, অবশ্য করণীয় কাজগুলি করা, তদন্তের বিভিন্ন ধাপ সমাপ্ত করা। এর মধ্যে প্রশাসনিক কাজই বেশি।

থানায় গিয়ে বুড়ো নিশ্চিন্তে চার্জরুমের পিছনে একটা কুঠরিতে আশ্রয় নিল। কোন প্রতিবাদ নেই তার মুখে, এমনকি কোন উকিলও চাইল না সে।

হ্যানলে অবশ্য এখনো পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনেননি। আগে তিনি প্রমাণ চান, সত্যি ঘটনাটা জানতে চান। সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত আটকে রাখার অধিকার আছে তাঁর। তাই নিজের ডেস্কে বসে টেলিফোনটা তুলে নিলেন তিনি।

বহু বছর আগে, তখন হ্যানলে সামান্য এক পুলিসকর্মী মাত্র। এক সার্জেণ্ট তাঁকে সবসময় বলতেন, 'ধীরে, বৎস, ধীরে। নিয়ম মেনে এগোবে। আমরা কেউ কিন্তু শার্লক হোমস নই।' সে অনেক দিনের কথা। কিন্তু উপদেশটি হ্যানলে বরাবর স্মরণে রেখেছেন। বুদ্ধিতে, প্রতিভায় হয়তো আজ পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকটা কেস কেউ কেউ জিতেছে, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি পরিষ্কার কেসে হেরে যেতে হয়েছে নিয়মমাফিক তদন্তের ফাঁক-ফোকর থাকার জন্য।

শহরের করোনার তখন সবে টেবিল ছেড়ে উঠেছেন লাঞ্চ খেতে যাবার জন্য। ঠিক তখনই হ্যানলের টেলিফোন এল মৃতদেহের খবর জানিয়ে। তারপর টেলিফোন করলেন বাস টার্মিনাসের পিছনে স্টোর স্ট্রিটের মর্গে। তাদের জানিয়ে দিলেন যে একটা জটিল ময়নাতদন্তের কেস আছে। তারপর সরকারি প্যাথোলজিস্ট প্রফেসর টিম ম্যাকার্নি'কে ধরলেন কিলডেয়ার ক্লাবে। ক্লাবের হলঘরে বসে শান্তভাবে ফোনে সব শুনলেন তিনি। সেদিন ক্লাবের মেনুতে রয়েছে হরিণের মাংস। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ম্যাকার্থি, জবর খাওয়াটা বাতিল হয়ে গেল। এখনই যেতে হবে তাঁকে।

পরপর সব কাজ সারতে লাগলেন হ্যানলে। কয়েকজনকে মেয়ো রোডে পাঠালেন শাবল, গাঁইতিগুলো সংগ্রহ করে সেখানকার খবরাখবর নিতে। তাঁর অধীনস্থ তিন গোয়েন্দা তখন ক্যান্টিনে লাঞ্চ সারছিলেন, তাঁদের ডেকে পাঠালেন। নিজে কাজ করতে করতেই দুটো স্যাণ্ডউইচ আর খানিকটা দুধ খেয়ে লাঞ্চ সেরে নিলেন।

তিন গোয়েন্দা লাঞ্চ সেরে ফিরে আসার পর হ্যানলে বললেন, 'আমি জানি তোমরা ব্যস্ত লোক। আমরা সকলেই ব্যস্ত। তবে এই কাজটা যত দ্রুত সম্ভব সেরে ফেলতে হবে। করতে খুব বেশি সময়ও নেবে না।'

ডিটেকটিভ চিফ ইন্সপেক্টরের উপর তিনি অকুস্থল পরিদর্শনের ভার দিলেন। অবিলম্বে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন মেয়ো রোডে। দুই তরুণ সার্জেণ্ট আলাদা দায়িত্ব পেলেন। একজনকে গোটা বাড়িটা পরীক্ষা করে দেখার ভার

দেওয়া হল। নগর পরিষদ প্রতিনিধি বলেছিলেন, ওই বৃদ্ধই বাড়িটার মালিকানা ভোগ করত; তবে শহরের রেটিং অফিসে গেলে বাড়িটির অতীত ইতিহাস এবং মালিকানা সম্পর্কে আরো অনেক কথা জানা যাবে। রেজিস্টার নথি থেকেই মোটামুটি খুঁটিনাটি তথ্যগুলো পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় ডিটেকটিভ সার্জেন্ট পেলেন পেলেন ঘোরাঘুরির কাজ। মেয়ো-রোডের প্রত্যেক পুরনো বাসিন্দাকে খুঁজে বের করতে হবে। তাদের অধিকাংশই এখন পরিষদের বানানো অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে থাকে, কাজেই অসুবিধা নেই। এদের সঙ্গে দেখা করতে হবে, গল্প করে তথ্য বের করতে হবে। কথা বলতে হবে দোকানদারদের সঙ্গে। মেয়ো রোডে গত ১৫ বছর ধরে যে টহলদার ডিউটি দিচ্ছে, তার সঙ্গেও কথা বলতে হবে। তালিকায় রয়েছেন স্থানীয় পুরোহিতও। অর্থাৎ মেয়ো রোড এবং অধিবাসী বৃদ্ধটিকে যে যতদিন চেনে, সেই নিয়ে তাদের সঙ্গে সবরকমের কথা বলতে হবে। হ্যানলে জোর দিয়ে বলে দিয়েছেন, প্রয়াত মিসেস লারকিনকে যারা যারা চেনে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

উর্দিপরা এক সার্জেন্টকে ইতিমধ্যেই মেয়ো রোডে পাঠিয়ে দিয়েছেন হ্যানলে। তাঁকে বলে দিয়েছেন যে পরিষদের ভ্যানে সেদিন সকালে লারকিনদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র যা যা দেখা গেছে, তার সবই যেন থানায় নিয়ে আসা হয়। এমন কি আসবাব-পত্রগুলো পর্যন্ত যেন বাদ না যায়।

দুপুর দুটো নাগাদ হ্যানলে চেয়ার ছেড়ে উঠে আড়মোড়া ভাঙলেন। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদের ঘরে নিয়ে যাবার নির্দেশ আগেই দিয়েছেন। দুধটা শেষ করে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করলেন। তারপর যখন ঢুকলেন জিজ্ঞাসা-বাদের ঘরে, বৃদ্ধ তখন টেবিলে বসে রয়েছে। হাত দুটো সামনে জুড়ো করে স্থির দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। সামনেই দরজার কাছে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিচুস্বরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন হ্যানলে, 'কোন কথা বলেছে?'

'না স্যার। মুখই খুলছে না।'

ইশারায় তাকে চলে যেতে বললেন হ্যানলে।

ঘরে এখন শুধু দুজন। বৃদ্ধ আর হ্যানলে। টেবিলে গিয়ে বৃদ্ধের মুখো-মুখি বসলেন হ্যানলে। পরিষদের রেকর্ডে হ্যানলে দেখেছেন, বৃদ্ধের পুরো নাম হারবার্ট জেমস লারকিন।

খুব নরম গলায় শুরু করলেন, 'বলুন, মিঃ লারকিন। গোটা ঘটনাটা আমাকে বলে ফেলাটাই কিন্তু সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে, তাই না ?'

হ্যানলের অসীম অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রথম থেকেই বলেছে, এই বৃদ্ধকে খুব বেশি চাপাচাপি করে লাভ হবে না। এ কোন অন্ধকার জগতের বাসিন্দা নয়, কোন মাফিয়াদলের নেতা নয়। আজ পর্যন্ত তিনজন স্ত্রী-হত্যাকারীর মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। এরা সবাই খুব ভদ্র, নম্র, ভীরু প্রকৃতির লোক। যখনই তাদের মুখোমুখি বসেছেন হ্যানলে, তারা তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দ্রুত উগরে দিয়েছে। টেবিলের উল্টোদিকে বসা সহানুভূতি সম্পন্ন লোকটির কাছে স্বীকারোক্তি করে তারা যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এবারেও বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল। তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে টেবিলের উপর চোখ নামিয়ে নিল। হ্যানলে পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে তার মুখটা খুলে বৃদ্ধের সামনে ধরলেন।

'সিগারেট খান ?' প্রশ্ন করলেন হ্যানলে, বৃদ্ধ চুপ, স্থির। 'আমি নিজেও অবশ্য খাই না,' বললেন হ্যানলে। প্যাকেটটাকে খুলেই টেবিলের ওপর রেখে দিলেন তিনি। পাশে একটা দেশলাই ও রাখলেন।

'আপনি অবশ্য অনেক চেষ্টা করেছেন,' হ্যানলে বলে চললেন, 'এতদিন ধরে বাড়িটা আঁকড়ে পড়ে থাকা কম ব্যাপার নয় তবে আজ, না হোক কাল পরিষদ দখল নিতই। ব্যাপারটা আপনিও নিশ্চয়ই জানতেন। যে কোন দিন বাড়ি ভাড়ার লোকরা এসে পড়বে এই আশঙ্কা মাথায় নিয়ে এতদিন কাটানো বেশ ভয়াবহ ব্যাপার, তাই না ?'

মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করলেন হ্যানলে, যদি বৃদ্ধ মুখ খোলে. না. কিছুই না। ঠিক আছে, লোকের মুখ থেকে কথা বের করার সময় হ্যানলের ধৈর্যও অসীম, কথা লোকে বলবেই। সঙ্গে সঙ্গেই হোক, আর খানিক পরেই হোক। বলার জন্যই লোকে তৈরী থাকে। বোঝা নামিয়ে দিতে চায়।

'কত বছর, মিঃ লারকিন ? কত বছর ধরে এই উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতীক্ষা করেছেন ? প্রথম বুলডোজার মেয়ো রোডে যাবার পর কত দিন ? নিঃসন্দেহে খুবই খারাপ দিন কেটেছে আপনার।'

আবার চোখ তুলে হ্যানলের চোখের দিকে তাকাল বৃদ্ধ। বোধহয় কিছু খুঁজল। এতদিনের স্ব-আরোহিত নির্বাসনের পর বোধহয় একজন মানুষের

খোঁজ পেতে চাইছে সে, একটু সহানুভূতি চাইছে। ক্রমেই ভঙ্গুর হয়ে আসছে বৃদ্ধ। আবার তার চোখ ঘুরে গেল, হ্যানলের কাঁধের উপর দিয়ে গিয়ে নিবদ্ধ হল দেওয়ালের উপর।

'সব শেষ, মিঃ লারকিন, সব শেষ, আজ কালের মধ্যে সত্য বেরিয়ে আসবেই। বছরের পর বছর আপনার ইতিহাস আমরা ঘাটব, টুকরোগুলো জোড়া দেব। আপনি নিজেও তা জানেন। মৃতদেহটা মিসেস লারকিনের, তাই না? এটা হল কেন? অন্য প্রেমিক? নাকি হঠাৎ ঝগড়ার ফল? নাকি দুর্ঘটনাবশত হয়ে গেছে? আপনিও ভয় পেয়ে গেছেন, স্বেচ্ছা নির্বাসন বেছে নিয়েছেন, একা-একাই কাটিয়ে দিয়েছেন এতগুলো দিন।'

বৃদ্ধের নিচের ঠোঁটটা নড়ে উঠল। শুকনো ঠোঁটের উপর দিয়ে জিভটা একবার বুলিয়ে নিল সে।

প্রায় মেরে এনেছি, ভাবলেন হ্যানলে। আর বেশি সময় নেবে না।

'গত তিন বছর নিশ্চয়ই খুব খারাপ কেটেছে আপনার,' হ্যানলে বলে চললেন, 'একা একটা বাড়িতে থাকা, কোন বন্ধু-বান্ধব নেই, শুধু আপনি নিজে। আরো ভয়ংকর ব্যাপার হল, আপনি জানতেন যে আপনার স্ত্রী কাছেই রয়েছেন—মৃত—ফারারপ্লেসের পাশে ইটের গাঁথনির নিচেই তিনি শুয়ে আছেন।'

বৃদ্ধের চোখে যেন একটা ঝিলিক খেলে গেল। পুরনো স্মৃতি মনে পড়ছে কি? হয়তো শক ট্রিটমেন্টেই ভাল কাজ হবে। দুবার চোখ পিটপিট করল বৃদ্ধ। হ্যানলের আশাও বাড়ছে। বোধহয় শেষপর্যন্ত পেঁছনো গেছে। কিন্তু বৃদ্ধের চোখ দু'টো আবার যখন হ্যানলের মুখে নিবদ্ধ হল, তখন সেখানে ফের ফিরে এসেছে শূন্যতা। কিছুই বলল না সে।

আরো প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টা চালালেন হ্যানলে, কিন্তু বৃদ্ধের মুখ থেকে একটি কথাও বের করা গেল না।

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন হ্যানলে, 'খানিকক্ষণ পরে আবার আসছি আমি, তখন কথা বলা যাবে।'

মেয়ো রোডে যখন পেঁছলেন হ্যানলে, তখন সেখানে চূড়ান্ত ব্যস্ততা। ভিড় আগের থেকে আরো বেড়েছে। ভাঙা বাড়িটার চার দিকই সাদা ক্যানভাসের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। প্রচণ্ড হাওয়ায় উড়ছে সেগুলো, তবু ভেতরে কি হচ্ছে দেখার জন্য বাইরের জনতার উৎসুক চোখকে খানিকটা আটকে রাখা

গেছে। রাস্তার একাংশে খানিকটা অংশ জুড়ে ভারি বুটপরা কুড়িজন পুলিস-কর্মী রাস্তায় জড়ো করা ভাঙা ইট পাথর হাত দিয়ে তুলে পরীক্ষা করে দেখছে। প্রতিটি ইট এবং পাথর, সিঁড়ি-দরজা-জানালার কাঠ, টালি সবকিছু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে তারা, যদি কিছু পাওয়া যায়। তবে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো রাস্তায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে, ফলে আর একটা স্তূপ ক্রমশ গড়ে উঠেছে। বাড়ির আলমারির জিনিসপত্র সব খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে, সর্বকিছু তন্ন তন্ন করে খতিয়ে দেখা হয়েছে, যদি কিছু পাওয়া যায়। সব দেওয়ালেও টোকা মেরে দেখা হয়েছে, যদি ভিতরে কোন গুপ্ত সিন্দুক বা কক্ষ থেকে থাকে, তার পর এক এক করে ইট খুলে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।

ফায়ারপ্লেসের কাছে খুব যত্ন সহকারে দু'জন লোক কাজ করে চলেছে। মৃতদেহের উপরের ইট-কাঠ-পাথর সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এখন তার উপর শুধু একপ্রস্থ ধুলো জমে রয়েছে। কেমন বেঁকে-চুরে একটা ভ্রূণের মত একপাশে কাৎ হয়ে মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে। তবে আগে এটা সম্ভবত খাড়া, বসানো অবস্থাতেই ছিল। লোকদু'টি একমনে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের নির্দেশ দিচ্ছেন প্রফেসর ম্যাকার্থি। সব কাজ তাঁর পছন্দমত সম্পন্ন হবার পর তিনি মৃতদেহের সামনে গিয়ে একটা নরম ব্রাশ দিয়ে ধুলো সরাতে লাগলেন তার উপর থেকে। অতি যত্নে, গৃহলক্ষ্মীসুলভ সতর্কতায় শবদেহের উপর থেকে ধুলোর আস্তরণ তুলতে লাগলেন প্রফেসর।

ধুলোর আস্তরণ বেশ খানিকটা সরে যাবার পর ম্যাকার্থি আরো খুঁটিয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। খোলা জানু টোকা মেরে দেখলেন, হাতের উপরের দিকটা টিপে টিপে দেখলেন। তারপর আবার বাইরে বেরিয়ে এলেন।

'ওটা মমি হয়ে গেছে', হ্যানলেকে বললেন ম্যাকার্থি।

'মমি?'

'ওই আরকি। কংক্রিটের মেঝে, দু'দিকই চাপা—ফলে আলো বাতাস বন্ধ। ফুট দু'য়েক দূরেই ফায়ারপ্লেসের সব গরম। স্বাভাবিকভাবেই মৃত-দেহটা মমি হয়ে গেছে। শরীরে জলীয় কিছুই নেই, তবে নষ্ট হয়নি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বোধ হয় অক্ষতই থাকবে। তবে কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে। আজকেই কাটাকাটি করা যাবে না। গরম গ্লিসারিন বাথ দিয়ে নরম করাতে হবে, সময় নেবে।'

'কতটা ?' প্রশ্ন করলেন হ্যানলে।

'তা, ধরুন ঘণ্টা বারো লাগবে। বেশিও লাগতে পারে। আগেও দেখছি তো, সময় নেয়।' ঘড়ি দেখলেন ম্যাকার্থি, 'চারটে বাজতে চলল। পাঁচটা নাগাদ এটাকে গ্লিসারিনে ডুবিয়ে দেব। কাল সকাল ন'টা নাগাদ মর্গে গিয়ে দেখব, যদি কাজ শুরু করা যায়।'

'ধুত্‌', খেঁকিয়ে উঠলেন হ্যানলে, 'যাক্‌গে, যা হয় তাড়াতাড়ি করুন।'

'আমার দ্বারা যতটা সম্ভব নিশ্চয়ই করব। তবে আমার ধারণা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে বিশেষ কোন সূত্র পাওয়া যাবে না। আমি যতদূর দেখেছি, গলা ঘিরে একটা পট্টি মত রয়েছে।'

'শ্বাসরোধ ?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যানলে।

'হতে পারে', উত্তর দিলেন ম্যাকার্থি। কণ্ট্রাক্টরের ভ্যান ততক্ষণে অকুস্থলে হাজির হয়ে গেছে। সরকারি প্যাথোলজিস্টের তত্ত্বাবধানে লোকটি দু'টি শক্ত মৃতদেহটিকে শবযানে তুলে একটা বড় কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল। গাড়ি বেরিয়ে গেল মর্গের দিকে। পিছনে গেল প্রফেসর ম্যাকার্থির গাড়ি। গাড়িগুলি চলে যাবার পর হ্যানলে এগিয়ে গেলেন টেকনিক্যাল সেকশনের ফিঙ্গারপ্রিণ্ট দপ্তরের লোকটির দিকে।

'কিছু পেলেন এখানে ?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যানলে।

লোকটা কাঁধ ঝাঁকাল। 'শুধু ইট-পাথরের স্তূপ, স্যার। কোথাও এতটুকু পরিষ্কার জায়গাই নেই।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল টেকনিক্যাল সেকশনেরই ফোটোগ্রাফার। তাকে প্রশ্ন করলেন হ্যানলে, 'আপনি কিছু পেলেন ?'

আমার একটু সময় লাগবে, স্যার। সব পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করছি। যদি নিচে কিছু থেকে থাকে। কিছু না পাওয়া গেলে আজকের মত কাজ হয়ে গেছে।

কণ্ট্রাকটরের ফোরম্যান এদিক ওদিক ঘুরছিল। হ্যানলেই তাকে আটকে রেখে দিয়েছেন। বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, যদি কোন অসুবিধা হয়, ফোরম্যানের দরকার হবে, তাই সে রয়েছে, হ্যানলেকে দেখে হেসে এগিয়ে এলো লোকটি।

'দারুণভাবে কাজ শেষ হয়েছে, স্যার,' লোকটির উচ্চারণে আইরিশ টান স্পষ্ট, 'আর আমার লোকেদের বিশেষ কিছু করার নেই।'

তাকিয়ে দেখলেন হ্যানলে। খানিক আগেই যেখানে বাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল,

এখন সেখানে শুধু ইট-পাথর-কাঠের ধ্বংসাবশেষের একটা বড় স্তূপ দাঁড়িয়ে আছে।

'ঠিক আছে, ইচ্ছে করলে আপনারা ওগুলো সরিয়ে ফেলতে পারেন, আমাদের কাজ হয়ে গেছে।'

ফোরম্যান ঘড়ি দেখল। 'আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি আছে', সে বলল, 'ঠিক আছে, বেশিটাই সরিযে ফেলছি, কালকে কি বাকি কাজটায় হাত দেওয়া যাবে, স্যার? মালিক চাইছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পার্কের কাজ শেষ করে সেটা বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে।'

'কাল সকাল ন'টা নাগাদ আমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন। তখন জানিয়ে দেব' হ্যানলে বললেন।

পুলিসের ডিটেকটিভ চিফ ইন্সপেক্টর তদন্তের ব্যাপারে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। যাবার আগে তাঁকে ডাকলেন হ্যানলে।

'শোনো, পোর্টেবল আলো আনতে পাঠিয়েছি। এখনই এসে পড়বে। তোমার ছেলেদের বলো, আলোগুলোকে মেঝের সমান্তরালে নামিয়ে নিয়ে গোটা মেঝেটা তন্নতন্ন করে দেখতে। অন্তত মৃতদেহ প্রথম শোয়াবার পর আর কিছু করা হয়েছে কিনা, সেটা খুব ভালোভাবে নজর করবে।'

ইন্সপেক্টর মাথা নাড়লেন, 'ঠিক আছে, স্যার। এখনো পর্যন্ত অবশ্য ওই একটাই লুকোনো জায়গা পেয়েছে। তবে আরো দেখি, যদি আর কিছু থাকে।'

থানায় ফিরে খুশি হলেন হ্যানলে। টেবিলের উপর স্তূপাকার করা রয়েছে সেদিন সকালে ভাঙা বাড়ি থেকে পাওয়া কাগজপত্রের সারি, কাউন্সিলের ভ্যান ওগুলো এখানে নিয়ে এসেছে। এতক্ষণে এমন কিছু পাওয়া গেল, যা থেকে বৃদ্ধ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

প্রতিটি নথিপত্র তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলেন হ্যানলে। অনেক কাগজেই লেখা পুরনো হয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সেগুলো আতস কাচ দিয়ে পড়তে লাগলেন।

একটা বার্থ সার্টিফিকেট রয়েছে, বৃদ্ধের নিজের। তারই নাম লেখা রয়েছে, জন্মস্থান ডাবলিন। জন্ম ১৯১১ সালে কিছু পুরনো চিঠিপত্র রয়েছে, তবে সবই দীর্ঘদিন আগে লেখা, সেসব লোককে দিয়ে হ্যানলের তেমন কাজ হবে না। সেসব চিঠির বিষয়বস্তুও বর্তমান কেসের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

দু'টো জিনিস হ্যানলের মনোযোগ আকর্ষণ করল। সস্তা ফ্রেমে আটকানো একটা বহুদিনের পুরনো ছবি, তবে সামনে কাচ নেই। ঝাপসা হয়ে এসেছে ছবিটা। এতে একজন সৈনিককে দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত ব্রিটিশ সৈনাবাহিনীরই ইউনিফর্ম পরা। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসি হাসছে লোকটি। ঝাপসা হলেও চেনা যাচ্ছে লোকটাকে; বয়স বেড়ে যে আজকের বৃদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশে তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক গোলগাল যুবতী, হাতে এক গুচ্ছ ফুল। মেয়েটির পরনে অবশ্য বিয়ের পোশাক নেই, রয়েছে একরঙা টু-পিস স্যুট। '৪০-এর দশকে যেমন উঁচু, চৌকো কাঁধের টু-পিস স্যুট দেখা যেত, অনেকটা সেইরকম।

অন্য জিনিসটা একটা সিগার বক্স। এতেও অনেক আজেবাজে চিঠিপত্র রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে একটা করে আটকানা তিনটে মেডেলের ফিতে, আর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একটা সার্ভিস পে বুক। টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন হ্যানলে, চারটে বেজে পঁচিশ মিনিট হয়েছে, তবে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। গেলও, স্যাণ্ডিফোর্ডে ব্রিটিশ দূতবাসের সামরিক অ্যাটাশে মেজর ডাকিন্স তখনো তাঁর ডেস্কে বসে। হ্যানলে তাঁর সমস্যার কথা তাঁকে বললেন। ডাকিন্স জানালেন, যতটা সম্ভব সাহায্য তিনি নিশ্চয়ই করবেন, তবে বেসরকারিভাবে।

'হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই' বললেন হ্যানলে।

সরকারি পর্যায়ে অনুরোধ, আবেদন ইত্যাদি জানালে তা নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যায়। আয়ার্ল্যাণ্ড এবং ব্রিটেনের পুলিসবাহিনীর মধ্যেও ব্যবস্থাটা সেইরকমই। ফলে সময় নেয়। কিন্তু বেসরকারিভাবে দু'পক্ষের মধ্যেই যোগাযোগটা ঘনিষ্ঠ। মেজর ডাকিন্স জানালেন, ফেরার পথে তিনি হ্যানলের সঙ্গে দেখা করে যাবেন। খানিকটা ঘুরপথ পড়বে বটে, কী আর করা যাবে।

তদন্তের কাজ শেষ করে দুই তরুণ গোয়েন্দার প্রথমজন যখন ফিরল, তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। একেই রেজিস্টার ডিড, রেটিং লিস্ট ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখতে পাঠানো হয়েছিল। হ্যানলের ডেস্কের সামনে বসে সে তার নোটবই খুলে পড়তে শুরু করল।

বাড়ির দলিল অনুসারে, ১৯৫৪ সালে হার্বার্ট জেমস লারকিন ৩৮ নং মেয়ো রোডের বাড়িটি কেনেন পূর্বতন মালিকের কাছ থেকে। দাম দিয়েছিলেন ৪০০ পাউণ্ড। কোন কিছু মর্টগেজ দেবার চিহ্ন পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ

লারকিন বাড়ি কেনার টাকাটা নগদেই দিয়েছিলেন। রেটিং লিস্টে দেখা গেছে, সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত বাড়িটাতে বসবাস করছেন হারবার্ট জেম্‌স লারকিন ও মিসেস ভায়োলেণ্ট লারকিন। রেকর্ডে মিসেস লারকিনের মৃত্যু বা বাড়ি ছেড়ে যাবার ব্যাপারে কোন উল্লেখ নেই, অবশ্য বাড়ির বাসিন্দা লিখিতভাবে কিছু না জানালে এসব ব্যাপার রেটিং লিস্টে ওঠে না। এক্ষেত্রে তেমন কিছু হয়নি। তাছাড়া কাস্টম হাউসে ১৯৫৪ থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ডেথ সার্টিফিকেটের কপি পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতেও, ৩৮ নং মেয়ো রোডের বাসিন্দা মিসেস ভায়োলেট লারকিন বা ওই ঠিকানায় অন্য কারুর মৃত্যুর কোন হদিশ পাওয়া যায়নি।

স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখা গেছে, গত দু'বছর ধরে লারকিন সরকারি পেনসন পেয়ে আসছেন। তবে তিনি কখনো পেনসনের পরিমাণ বাড়ানোর কোন আবেদন করেননি। পেনসনসমেত অবসর গ্রহণের আগে তিনি স্টোরকিপার এবং নৈশপ্রহরী হিসেবে কাজ করতেন। এছাড়াও ১৯৫৪ সাল থেকে লারকিনের পেমেণ্ট ফর্ম পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মেয়ো রোডে আসার আগে তিনি ইংল্যাণ্ডে উত্তর লণ্ডনের একটা ঠিকানায় থাকতেন।

ডেস্কের উপর সেনাবাহিনীর পে বুকটার পাতা ওল্টাতে লাগলেন হ্যানলে।

'তাহলে, ও ব্রিটিশ সেনাদলে ছিল?' প্রশ্ন করল সার্জেণ্ট।

'তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই,' জবাব দিলেন হ্যানলে। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার আইরিশ ছিল। লারকিনও তাদের মধ্যে ছিল মনে হচ্ছে।

'ওর স্ত্রী বোধহয় ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দা ছিলেন। ১৯৫৪ সালে লারকিন স্ত্রীকে নিয়ে উত্তর লণ্ডন থেকে ডাবলিনে আসে।'

'হতে পারে,' বললেন হ্যানলে। বিয়ের ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'সৈনাদলে থাকতে থাকতেই লারকিন ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেছিল।'

অভ্যন্তরীণ দূরভাষ বেজে উঠল। ব্রিটিশ দূতাবাসের সামরিক অ্যাটাশে এসে গেছেন। সার্জেণ্টকে ইঙ্গিত করলেন হ্যানলে, সে সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেল। হ্যানলে জানালেন, অতিথিকে নিয়ে আসা হোক্।

মেজর ডাকিন্স ঋজু পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলেন। হ্যানলের ডেস্কের উল্টোদিকে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে চুপচাপ সমস্ত শুনে গেলেন তিনি। তারপর বেশ খানিকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে বিয়ের ছবিটা দেখতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাকিন্স। ডেস্কের অপরপ্রান্তে হ্যানলের কাঁধের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছবিটা হ্যানলের সামনে রাখলেন। তাঁর একহাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস, আরেক হাতে একটা সোনার পাতে মোড়া পেনসিল। পেনসিলের ডগাটা দিয়ে ছবিতে লারকিনের মুখের ঠিক উপরে টুপির ওপর লাগানো ব্যাজের দিকে হ্যানলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি।

'রাজার ড্রাগুন গার্ড', নিশ্চিত কণ্ঠস্বরে বললেন ডাকিন্স।

'বুঝলেন কি করে?' প্রশ্ন করলেন হ্যানলে।

হ্যানলের হাতে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দিলেন ডাকিন্স।

'দুই মাথাওলা ঈগল,' বললেন মেজর। 'ওটাই রাজার ড্রাগুন গার্ডের টুপির ব্যাজ। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এরকম আর কারুর টুপিতে দেখা যায় না।'

'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যানলে।

ছবির পাত্রের বুকে তিনটে মেডেলের দিকে ইঙ্গিত করলেন ডাকিন্স, 'প্রথমটা ১৯৩৯-১৯৪৫-এর স্টার মেডেল। একদম শেষে তৃতীয়টা যুদ্ধজয়ের ভিকট্রি মেডেল। তবে মাঝেরটা আফ্রিকা স্টার মেডেল, তার উপর আড়াআড়িভাবে আংটা লাগানো রয়েছে। এইট্‌থ আর্মি মেডেল। এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। রাজার ড্রাগুন গার্ডরা উত্তর আফ্রিকায় রোমেলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। সাঁজোয়া বাহিনী হিসেবে।'

তিনটে মেডেলের ফিতে হাতে তুলে নিলেন হ্যানলে। ছবিতে যে মেডেলগুলো দেখা যাচ্ছে, সেগুলো বড় আনুষ্ঠানিক মেডেল। ডেস্কের উপর ফিতের সঙ্গে যেগুলো পড়ে রয়েছে, সেগুলো বড় মেডেলের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ, উর্দিতে পরে থাকার জন্য তৈরি।

'এইতো', বললেন মেজর ডাকিন্স। এক ঝলক দেখে নিলেন মেডেলগুলো, 'একই জিনিস, দেখেছেন? এই যে এইট্‌থ আর্মির মেডেল।'

ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে হ্যানলেও দেখলেন, ছবির ডিজাইনের সংগে এগুলোর ডিজাইন হুবহু এক। এবার ডাকিন্সের দিকে লারকিনের সার্ভিস পে বুকটা এগিয়ে দিলেন তিনি। চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডাকিন্সের। একের পর এক পাতা উল্টে যেতে লাগলেন তিনি।

'১৯৪০-এর অক্টোবরে লিভারপুলে সৈন্যদলে যোগ দেয়।' বললেন ডাকিন্স।

সম্ভবত বার্টনে।'

'বার্টন কি ?' জিজ্ঞাসা করলেন হ্যানলে।

'দর্জির দোকান। যুদ্ধের সময় ওটাই লিভারপুলের সেনা নিয়োগ কেন্দ্র ছিল। বহু আইরিশ স্বেচ্ছাসেবী লিভারপুল ডেকে নেমে রিক্রুটিং সার্জেন্টের পিছন পিছন ওখানে চলে যেত। ১৯৪৬-এর জানুয়ারিতে উঠে যায়। অদ্ভুত ব্যাপার।'

'কি অদ্ভুত ব্যাপার ?' প্রশ্ন করলেন হ্যানলে।

'১৯৪০-য়ে সেনাদলে যোগ দিয়েছে। উত্তর আফ্রিকায় সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে লড়াই করেছে। ১৯৪৬ পর্যন্ত সেনাবাহিনীতে ছিল। অথচ চিরকাল সৈন্যই রয়ে গেল। একবারও পদোন্নতি হয়নি। কাঁধের উপর কোন স্ট্রাইপ নেই। কোনদিন কর্পোরাল হল না।' ছবির স্ট্রাইপহীন কাঁধের উপর টোকা দিলেন ডাকিন্স।

'বোধহয় সৈনিক হিসেবে ভাল ছিল না।' বললেন হ্যানলে।

'সম্ভবতঃ'।

'আপনি আর কিছু জানাতে পারবেন ওর যুদ্ধের রেকর্ড সম্পর্কে ?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যানলে।

'কাল সকালেই জানিয়ে দেব,' বললেন ডাকিন্স। পে বুকের সব খুঁটিনাটি একটা নোটবুকে লিখে রাখলেন তিনি। তারপর বিদায় নিলেন।

ক্যান্টিনেই রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে দ্বিতীয় ডিটেকটিভ সার্জেন্টের ফেরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন হ্যানলে। রাত সাড়ে দশটা বেজে যাবার পর সে এল। প্রচণ্ড শ্রান্ত, কিন্তু মুখে যুদ্ধজয়ের আনন্দ।

'মেয়ো রোডে লারকিন ও তার স্ত্রী-কে চেনে, এরকম অন্তত ১৫ জনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি,' বলল সার্জেন্ট। 'এবং তিন জায়গায় মোক্ষম তথ্য পাওয়া গেছে। একজন মিসেস মোরান। লারকিনদের প্রতিবেশী। তিরিশ বছর ওখানে ছিলেন। লারকিনদের ও বাড়িতে ঢুকতে দেখেছেন। দ্বিতীয়জন পোস্টম্যান। গতবছর পর্যন্ত মেয়ো রোডে চিঠি বিলি করে এখন অবসর নিয়েছেন। আর তৃতীয়জন ফাদার বার্ণে। ইনিও অবসর নিয়ে এখন ইঞ্চিকোরে রিটায়ার্ড প্রিস্টস হোমে বসবাস করছেন। সেখান থেকে কথা বলে ফিরতে ফিরতেই দেরি হয়ে গেল।'

জুৎ করে হেলান দিয়ে বসলেন হ্যানলে। ডিটেকটিভ সার্জেন্ট তার নোট

বইয়ের পাতা উল্টে রিপোর্ট পড়তে শুরু করল।

'মিসেস মোরান জানিয়েছেন যে ১৯৫৪ সালে ৩৮ নং মেয়ো রোডের তৎকালীন বাসিন্দা, এক বিপত্নীক ভদ্রলোক মারা যান। তার দিনকতক পরেই বাড়িটায় 'বিক্রি হবে' নোটিস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। নোটিসটা দিন পনের ছিল, তারপর খুলে নেওয়া হয়। তারও বেশ কয়েকদিন বাদে লারকিনরা বাড়িটায় আসে, তখন লারকিনের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। তার স্ত্রী বয়সে অনেক ছোট। ভদ্রমহিলা ইংরেজ, লণ্ডনের লোক। মিসেস মোরানকে তিনি বলেছিলেন, তাঁরা লণ্ডন থেকেই এসেছেন, তাঁর স্বামী সেখানে স্টোর ক্লার্ক হিসেবে কাজ করতেন। এক গ্রীষ্মে মিসেস লারকিন হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। মিসেস মোরান জানিয়েছেন, বছরটা ১৯৬৩।'

'উনি অত নিশ্চিত হলেন কী করে?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যানলে।

'সেবছরই নভেম্বর মাসে কেনেডি মারা গিয়েছিলেন,' বলল সার্জেণ্ট, 'লাউঞ্জ বারে একটা টেলিভিশন সেট ছিল। সেখানেই খবরটা প্রথম প্রচারিত হয়। তারপর রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। মোড়ে মোড়ে এই নিয়ে জটলা শুরু হয়। মিসেস মোরান এত উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে লারকিনের বাড়িতে খবরটা দিতে যান। দরজায় শব্দ না করেই বসার ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। লারকিন তখন একটা চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছিল। মিসেস মোরানের ডাক শুনে সে ভূত দেখার মত চমকে লাফিয়ে ওঠে এবং কোনরকমে মিসেস মোরানকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বাঁচে। তখনই মিসেস লারকিন নিখোঁজ, তবে বসন্তে, গ্রীষ্মকালেও কিন্তু মিসেস লারকিন ছিলেন, কারণ মিসেস মোরানের দ্বিতীয় সন্তান ১৯৬৩-র জানুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করে; তাকে দেখাশোনা করতেন মিসেস লারকিন। অর্থাৎ ১৯৬৩-র শেষাশেষি মিসেস লারকিন নিখোঁজ হন।'

'কারণ কি দেখানো হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যানলে।

'ছেড়ে চলে গেছেন,' বিনাদ্বিধায় বলল সার্জেণ্ট, 'কেউ তাতে সন্দেহ করেনি। লারকিন খুবই পরিশ্রম করত, কিন্তু ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে চাইত না, এমনকি সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত বেরোত না। এভাবে কাঁহাতক ভাল লাগে? এই নিয়ে ঝগড়া হত। মিসেস লারকিন খানিকটা, যাকে বলে, বহির্মুখী ছিলেন। খোশগল্প, হাসিঠাট্টা, মেলামেশা—এ সব পছন্দ করতেন। তাই সবাই যখন শুনল মিসেস লারকিন ব্যাগপত্তর গুছিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন,

কেউ অবাক হয়নি। এমনকি অনেকে মনে করতেন, মিঃ লারকিনের এই শাস্তি পাবার দরকার ছিল, কারণ কোনদিনই যে স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি। কেউ কিছু সন্দেহ করেনি।'

'এই ঘটনার পর থেকে লারকিন আরো ঘরকুনো হয়ে যায়। বাইরে একেবারেই বেরোত না। বাড়ির প্রতি, নিজের প্রতি যত্ন নিত না। লোকে সাহায্য করতে চাইলেও ফিরিয়ে দিত। শেষ পর্যন্ত লোকে আর যেত না। একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল লারকিন। বছর দুয়েক বাদে ওর স্টোরম্যানের চাকরিটা চলে গেল। তারপর কিছুদিন নৈশপ্রহরীর কাজ করেছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেলে কাজে বেরোত, সূর্য উঠলে ফিরত। দিবারাত্র বাড়ির দরজায় দু'টো তালা ঝুলত—রাত্রে সে বাড়ি থাকত না বলে, আর দিনে ঘুমোবে বলে। অন্তত সেসময় লারকিন এটাই বলত। এই সময় থেকেই সে জীবজন্তু পুষতে শুরু করে। প্রথমে পিছনের বাগানে ঘর বানিয়ে বেজি পুষত। সেগুলো পালিয়ে গেলে নিয়ে এল পায়রা। একদিন তাও বেপাত্তা হল। তখন নিয়ে এল মুরগি। গত দশ বছর ধরেই মুরগি পুষছে।'

মিসেস মোরানের কথাগুলোই প্রায় হুবহু উঠে এসেছে গির্জার যাজকের মুখে। হ্যাঁ, মিসেস লারকিন ইংরেজ ছিলেন, ক্যাথলিক মতে বিশ্বাসী, নিয়মিত গির্জায় যেতেন। প্রায়ই স্বীকারোক্তি করতেন তিনি। তারপর ১৯৬৩-র আগস্ট মাস থেকে তিনি গির্জায় আসা বন্ধ করে দিলেন। সবাই বলাবলি করত, তিনি তাঁর কোন এক পুরুষবন্ধুর সঙ্গে দেশ ছেড়েছেন। ফাদার বার্নে'রও সেইরকমই ধারণা। স্বীকারোক্তি গোপন রাখার প্রতিজ্ঞা তিনি ভঙ্গ করবেন না। তবে এটুকু বলতে পারেন, যে এব্যাপারে তাঁর কোন সন্দেহই নেই। লারকিনের বাড়িতে তিনি বেশ কয়েকবার গেছেন, তবে লারকিন কোনদিনই গির্জায় যেত না। যাজকের উপদেশেও সে কানে তোলেনি। বরং স্ত্রীকে গালাগাল দিয়ে বলত—বেশ্যা।

'মোটামুটি ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে,' বিড়বিড় করে বললেন হ্যানলে, 'মনে হচ্ছে মিসেস লারকিন কারুর সঙ্গে পালাতেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী ব্যাপারটা ধরে ফেলে। বোধহয় জোরে আঘাত করে ফেলেছিল। এরকম তো কতই হয়।'

পোস্টম্যান নতুন বিশেষ কিছু বলতে পারেনি। সে স্থানীয় লোক, মাঝেমধ্যে স্থানীয় বারে গিয়ে মদ খেত। মিসেস লারকিন মাঝেমধ্যে সেখানে যেতেন,

একবার তো গরমকালে সেখানে কিছুদিন কাজও করেছিলেন। তবে দিনকয়েক পরেই তাঁর স্বামী তা বন্ধ করে দেয়। তবে মিসেস লারকিন তাঁর স্বামীর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। খুব হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল মহিলা ছিলেন। সময় সুযোগ পেলে একটু-আধটু ফষ্টিনষ্টি করতেও আপত্তি ছিল না তাঁর।

'চেহারার বর্ণনা?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যানলে।

'বেঁটে ছিলেন, পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি হাইট। মোটাসোটা, গোলগাল চেহারা মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুল। একটু বেশি হাসতেন, বুকদুটো বড় বড় ছিল, পোস্টম্যানের মনে আছে, মিসেস লারকিন যখন একদমে বড় একটা মদের পাইট শেষ করতেন, সে একটা দেখবার মত দৃশ্য ছিল। পুরনো স্টাইলের বিয়ার পাম্প থেকে এক নিঃশ্বাসে খেতেন। কিন্তু সেটা স্বচক্ষে দেখার পর লারকিন রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সোজা ভিতরে এসে স্ত্রীকে টেনে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই মিসেস লারকিন নিখোঁজ হয়ে যান।'

উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন হ্যানলে। অনেক রাত হয়ে গেছে, তরুণ ডিটেকটিভের কাঁধে হাত রেখে আলতো চাপ দিলেন তিনি।

'যাও, শুতে যাও। অনেক রাত হয়ে গেছে। সকালে উঠে পুরোটা লিখে ফেল।'

সে রাত্রে হ্যানলের সঙ্গে শেষ দেখা করতে এলেন তাঁর চিফ ইন্সপেক্টর, যিনি এতক্ষণ মেয়ো রোডে অকুস্থলে তদন্ত চালাচ্ছিলেন।

'সব পরিষ্কার হয়ে গেছে', জানালেন ইন্সপেক্টর, 'শেষ ইটটা পর্যন্ত সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এমন কিছু আর নেই যা সামান্য হলেও কাজে লাগতে পারে।'

'বেশ, তাহলে এখন বাকি রইল শুধু ওই ভদ্রমহিলার মৃতদেহ। বেচারা! বাকি যা জানার ওখান থেকেই জানতে হবে', বললেন হ্যানলে, 'কিংবা লারকিনের কাছ থেকে।'

'কথাবার্তা কিছু বললো?' জিজ্ঞেস করলেন চিফ ইন্সপেক্টর।

'না, এখনো বলেনি।' বললেন হ্যানলে, 'তবে বলবে, শেষ পর্যন্ত সবাই কথা বলে।'

চিফ ইন্সপেক্টরও বাড়ি চলে গেলেন। হ্যানলে এবার বাড়িতে ফোন করলেন স্ত্রীকে, তাঁকে বলে দিলেন যে সে রাতটা তিনি থানাতেই কাটাবেন, বাড়ি আর ফিরবেন না। ঠিক মাঝরাত পেরোনোর পর হ্যানলে আবার লক্‌আপে ঢুকলেন। বুড়ো তখনো জেগে বাংকে পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

চোখের দৃষ্টি বিপরীত দেওয়ালের দিকে স্থির নিবদ্ধ। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ অফিসারের দিকে ইঙ্গিত করলেন হ্যানলে। বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হ্যানলের পিছন পিছন জিজ্ঞাসাবাদের ঘরে এলেন। নোটবুক রেডি করে ঘরের এক কোণে বসলেন অফিসার। হ্যানলে বৃদ্ধের মুখোমুখি বসে তাকে প্রথমে সেই চিরাচরিত সতর্কবাণী শোনালেন।

'হারবার্ট জেমস লারকিন, তুমি কিছু বলতে বাধ্য নও। তবে তুমি যা বলবে তা সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেওয়া হবে। ভবিষ্যতে তা সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।'

বৃদ্ধের চোখের দিকে সোজা তাকালেন হ্যানলে।

'পনেরোটা বছর, মিঃ লারকিন। এই দীর্ঘ সময় ধরে ওরকম একটা জিনিস নিয়ে কাটানো…১৯৬৩-র আগস্ট তাই না? আপনার প্রতিবেশীদের কিন্তু সময়টা মনে আছে, গির্জার যাজকের মনে আছে, এমনকি পোস্টম্যানেরও খেয়াল আছে সময়টা। যাকগে, গোটা ব্যাপারটা খুলে বললে ভাল হয় না কি?'

আবার বৃদ্ধ চোখ তুলল, হ্যানলের চোখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল, তারপর চোখ নামিয়ে নিল টেবিলের উপর। কোন কথা নেই মুখে, প্রায় ভোর পর্যন্ত চেষ্টা চালালেন হ্যানলে। কিন্তু না, লারকিন চুপ। কোন ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, চুপচাপ বসে আছে। কোণে বসে থাকা পুলিস অফিসারের ততক্ষণে ঘন ঘন হাই উঠতে শুরু করেছে। হ্যানলের মনে পড়ল, বেশ কয়েক বছর ধরে নৈশ প্রহরীর কাজ করেছে লারকিন। বোধ হয় দিনের থেকে রাতেই বেশি জেগে থাকত।

শেষ পর্যন্ত হ্যানলে যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন জিজ্ঞাসাবাদের ঘরের ঘষা কাচের জানলা ভেদ করে এক ধূসর আলো ঘরে ঢুকতে শুরু করেছে।

'ঠিক আছে, যা ভাল বোঝেন করুন', বললেন হ্যানলে।

'তবে আপনি কথা না বললেও আপনার প্রিয়তমা ভায়োলেট বলবে। শুনতে অদ্ভুত লাগছে? পনেরো বছর বাদে…… কবর থেকে উঠে এসে কথা বলবে…এ কিরকম ব্যাপার, তাই না? কিন্তু ঘটনা হল, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের প্যাথোলজিস্টের সঙ্গে কথা বলবেন ভায়োলেট লারকিন। বলবেনই, প্যাথোলজিস্টের ল্যাবোরেটরিতেই তিনি বলবেন, তাঁর কী হয়েছিল, কবে হয়েছিল, হয়তো কেন হয়েছিল, সেটাও বলে দেবেন। তখন কিন্তু আমি আবার এখানে আসবো। অভিযোগের সব তীর তখন আপনার দিকে যাবে।'

সহজে রাগেন না হ্যানলে। তবে বৃদ্ধের এই ক্রমাগত স্তব্ধতা এবারে তাঁর বিরক্তি উৎপাদন করতে শুরু করেছে। অল্প কিছু বললেও না হয় হত, কিন্তু বুড়ো একেবারে চুপ। শুধু চোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে হ্যানলের মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে থাকে। এ দৃষ্টির অর্থ কী? নিজেকেই প্রশ্ন করেন হ্যানলে। ভয়? আতঙ্ক? অনুতাপ? নাকি হ্যানলের ভয়? নাকি সবটাই ভান? না, না ভান নয়। ভান নয়। আসলে লোকটাই থেমে গেছে।

উঠে দাঁড়ালেন হ্যানলে। চিন্তান্বিতভাবে গালে একবার বড় হাতটা বুলিয়ে নিলেন। তারপর ফিরে গেলেন অফিসে। লারকিনও তার সেলে ফিরে গেল।

অফিসে এসে চেয়ারে বসে বসেই ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে নিলেন হ্যানলে। পাদু'টো সামনে ছড়িয়ে, মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে হ্যানলে যখন ঘুমোন, তখন ভীষণ নাক ডাকতে থাকে তাঁর। আটটা নাগাদ উঠে, মুখ-হাত ধুয়ে দাড়িটা কামিয়ে নিলেন। সাড়ে আটটায় সকালের ডিউটিতে আসা দুই পুলিসকর্মী হ্যানলেকে দেখে অবাক। ঠিক ন'টায় ব্রেকফাস্ট খেয়ে জমানো ফাইলের স্তূপ নিয়ে কাজ করতে বসলেন। সাড়ে ন'টায় মেয়ো রোডের দায়িত্ব প্রাপ্ত কণ্ট্রাক্টরের ফোরম্যান টেলিফোন করল। তার অনুরোধ নিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন হ্যানলে। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি তাহলে ওখানে বেড়া দিয়ে কংক্রিট করে দিন।'

বিশ মিনিট বাদে ফোন করলেন প্রফেসর ম্যাকার্থি।

'কাজ শুরু করেছি, দেহটা সোজা করে শুইয়ে দিয়েছি।' বেশ উৎফুল্ল গলায় বললেন ম্যাকার্থি, 'চামড়াটাও বেশ নরম রয়েছে, সহজেই ছবি চলছে। আপাতত দেহটা শুকিয়ে নিচ্ছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পরীক্ষা শুরু করব।'

'রিপোর্ট কখন দিতে পারবেন?' প্রশ্ন করলেন হ্যানলে।

'সেটা নির্ভর করছে আপনি কী চান, তার উপর', জবাব দিলেন ম্যাকার্থি' সরকারিভাবে রিপোর্ট পেতে পেতে দু'-তিনদিন লেগে যাবে। কিন্তু বেসরকারিভাবে, আশা করছি, লাঞ্চের পরই জানিয়ে দিতে পারব। অন্ততঃ মৃত্যুর কারণটা তো বটেই। ঘাড়ের কাছে যে ফাঁস আছে, সেটা আমরা নিশ্চিত, আমার সন্দেহ, জিনিসটা সম্ভবত মোজা-টোজা জাতীয় জিনিস দিয়ে করা হয়েছে।'

৬

ম্যাকার্থি কথা দিলেন, বেলা আড়াইটে নাগাদ স্টোর স্ট্রিটের মর্গ থেকে তিনি হ্যানলের অফিসে আসবেন, দূরত্ব মাইলখানেক।

পরের ফোনটা এল বেলার দিকে। মেজর ডিকিন্স।

'একটা ভাল খবর আছে' বললেন ডিকিন্স, 'যুদ্ধ দপ্তরের অফিসে রেকর্ডস বিভাগে আমার এক বন্ধু কাজ করে। সে আমাকে কিছু সাহায্য করেছে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মেজর,' বললেন হ্যানলে, 'আপনি বলুন আমি লিখে নিচ্ছি।'

'না, তেমন কিছু নয়', বললেন ডিকিন্স 'তবে গতকাল আমরা যা যা অনুমান করেছিলাম, সেগুলোই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।'

কী কী ভেবেছিলাম ? নিজেকেই প্রশ্ন করলেন হ্যানলে। ইংরেজদের এই অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর তাঁর পোষায় না।

ডিকিন্স বলে চললেন, 'সৈনিক হারবার্ট জেমস লারকিন ১৯৪০-এর অক্টোবরে ডাবলিন থেকে নৌকা করে লিভারপুলে আসে। স্বেচ্ছায় সে সৈন্যদলে যোগ দেয়। ইয়র্কশায়ারের ক্যাটেরিক ক্যাম্পে বেসিক ট্রেনিং নেবার পর তাকে নিয়োগ করা হয় কিংস ড্রাগুন গার্ডস-এ। ১৯৪১-এর মার্চে তাকে মিশরে পাঠানো হয় যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য। এইখানে আমরা জানতে পেরেছি, কেন লারকিন কোনদিন কর্পোরাল হয় নি, কেন সে আজীবন সৈনিকই রয়ে গেল।'

'কেন ?'

'ধরা পড়েছিল। রোমেলের শরৎকালীন ঝটিকা আক্রমণের সময় ধরা পড়ে যায়। যুদ্ধের বাকি সময়টা তৃতীয় রাইখের পূর্বাংশে সাইলেশিয়ায় যুদ্ধ-বন্দীদের ক্যাম্পে মাঠের কাজ করে কাটায়। ১৯৪৪-এর অক্টোবরে রাশিয়ানরা এদের মুক্ত করে। ১৯৪৫-এর এপ্রিলে দেশে ফেরে। ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫-এর মে মাসে।'

'ওর বিয়ে সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলেন ?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যানলে।

'অবশ্যই' জবাব দিলেন ডিকিন্স 'সৈন্য হিসেবে থাকার সময়েই ও বিয়ে করে, কাজেই সেটার উল্লেখ ফাইলে পাওয়া গেছে। ১৯৪৫-এর ১৪ই নভেম্বর উত্তর লণ্ডনের এডমণ্টনে সেণ্টমেরি সেভিয়ার্স ক্যাথলিক চার্চে বিয়ে করে। পাত্রীর নাম ভায়োলেট মেরি স্মিথ, হোটেলের পরিচারিকা। বয়স ১৭ বছর। ১৯৪৬-এর জানুয়ারিতে লারকিনকে সৈন্যবাহিনী 'সম্মানজনক' মুক্তি দেয়। তারপর ১৯৫৮ পর্যন্ত সে এডমণ্টনেই স্টোরকিপার হিসেবে কাজ করে। এই

সময় পর্যন্ত সেনাবাহিনীর তরফে তার কাছে চিঠিপত্র গেছে। তারপর আর যায়নি।'

ডাকিন্সকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন নামিয়ে রাখলেন হ্যানলে। বিয়ের সময় তাহলে লারকিনের বয়স ছিল চৌত্রিশ। চৌত্রিশ কেন, পঁয়ত্রিশই বলা যায়, সে সময় সে বিয়ে করে সতেরো বছরের এক তরুণীকে। তার মানে, ওরা যখন মেয়ো রোডে আসে, তখন মিসেস লারকিন এক প্রাণোচ্ছল ছাব্বিশ বছরের যুবতী, আর লারকিন প্রায় তেতাল্লিশ। ১৯৬৩-র আগস্টে মৃত্যুর সময় তাহলে মিসেস লারকিনের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ। নিঃসন্দেহে তখনও যথেষ্ট আকর্ষণীয় টগবগে ছিলেন তিনি। আর লারকিন ততদিনে বাহান্নয় পা দিয়েছে, আকর্ষণ কমেছে। এটাই সম্ভবত সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। হুঁ, নিশ্চিতভাবেই। অধীর আগ্রহে প্রফেসর ম্যাকার্থি'র আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন হ্যানলে।

প্রফেসর ম্যাকার্থি নিয়মনিষ্ঠ এবং সময়নিষ্ঠ লোক। ঠিক আড়াইটেয় তাঁকে দেখা গেল হ্যানলের উল্টোদিকের চেয়ারে বসে থাকতে। পকেট থেকে পাইপটা বের করে ধীরে সুস্থে সেটা ভরতে লাগলেন।

'আসলে ল্যাবরেটরিতে তো খেতে পারি না।' ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে বললেন ম্যাকার্থি, 'কেননা ধোঁয়া ফরম্যালডিহাইডকে ঢেকে দেয়। এটা একটু আপনাকে মেনে নিতে হবে।'

নিশ্চিন্তে পাইপ টানতে লাগলেন ম্যাকার্থি। দু'-চারটে জবর টান দেওয়ার পর বললেন, 'আপনি যা চাইছিলেন, সেটা পেয়েছি। নিঃসন্দেহে মহিলাকে খুন করা হয়েছে। মোজা দিয়ে তাঁর গলায় ফাঁস লাগানো হয়, তাতেই শ্বাস-রোধ হয়ে যায়। তার উপরে শরীরে ভারি আঘাত রয়েছে। এই জায়গার হাড়ে'—থুতনি আর গলার ঠিক মাঝখানে আঙুল দিয়ে দেখালেন ম্যাকার্থি—'তিন জায়গায় ভাঙার চিহ্ন রয়েছে। মৃত্যুর ঠিক আগে মাথায় কোন ভারি বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়। তবে তাতে খুলিতে চিড় ধরলেও মৃত্যু হয়নি। সম্ভবত এই আঘাতে মহিলা একেবারেই নিস্তেজ হয়ে পড়েন। তখন শ্বাসরোধ করে তাঁকে খুন করা হয়।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন হ্যানলে, বললেন, 'চমৎকার। মৃত্যুর বছরটা কি ঠিক করতে পেরেছেন?'

'ও, হ্যাঁ,' অ্যাটাচিকেস খুলতে খুলতে বললেন প্রফেসর।

'আপনার জন্য একটা ছোট্ট উপহার আছে।'

অ্যাটাচি কেস থেকে একটা পলিথিনের প্যাকেট বের করলেন ম্যাকার্থি। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে হলুদ, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া একটা কাগজের টুকরো, আন্দাজ ৬ ইঞ্চি বাই ৪ ইঞ্চি হবে।

'মাথার আঘাতটা থেকে রক্তপাত হয়েছিল। মেঝের কার্পেটটা যাতে ভিজে না যায়, সেজন্য খুনী ক্ষতস্থানটা খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে দেয়। অবশ্যই গোপন কুঠরিটা বানানোর সময়। তবে আমাদের সৌভাগ্য এখনো এটা দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে চেনা যাচ্ছে, এমনকি ওপরে লেখা তারিখটা পড়া পর্যন্ত যাচ্ছে।'

পলিথিনের ব্যাগটা হাতে নিয়ে রিডিং স্পটলাইট এবং ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে হ্যানলে খুব ভালোভাবে কাগজের টুকরোটা পরীক্ষা করলেন। তারপর হঠাৎ এক ঝটকায় সোজা হয়ে বসলেন।

'হুঁ, কাগজটা বেশ পুরনো,' বললেন হ্যানলে।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' বললেন ম্যাকার্থি।

'কাগজটা যখন মাথার ক্ষতস্থান চাপা দিতে ব্যবহার করা হয়েছিল, তখনই এটা বেশ পুরনো হয়ে গিয়েছিল.' জোর দিয়ে জানালেন হ্যানলে।

ম্যাকার্থি কাঁধ ঝাঁকালেন। নরম সুরে বললেন, 'হতে পারে, এই ধরনের মমি হয়ে যাওয়া মৃতদেহের মৃত্যুর সময় একেবারে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে কাছাকাছি নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে।'

আরাম করে বসলেন হ্যানলে, স্বস্তির সুরে বললেন, 'আরে, আমিও তো এটাই বলতে চাইছি। লারকিন নিশ্চয়ই এমন কোন ড্রয়ার বা তাক থেকে কাগজটা টেনে নিয়েছিল, যেটা বছরের পর বছর ছোঁয়াই হয়নি। সেইজন্যই কাগজটা অত পুরনো। দেখছ না তারিখটা—১৩ই মার্চ, ১৯৪৩।'

'মৃতদেহটাও তো ওই সময়েরই,' বললেন ম্যাকার্থি, 'আমার ধারণা ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে খুনটা করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব, এই খবরের কাগজের তারিখের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে।'

তীব্র দৃষ্টিতে ম্যাকার্থির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন হ্যানলে। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'মিসেস ভায়োলেট লারকিন মারা গেছেন ১৯৬৩-র আগস্টে।'

এবার ম্যাকার্থি তাকিয়ে রইলেন হ্যানলের দিকে। তাকিয়ে তাকিয়েই পাইপটা আবার ধরালেন। তারপর ধীরস্বরে বললেন, 'আমার মনে হয় আমাদের

আলোচনার বিষয় ও উদ্দেশ্য উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে।'

'আমি মর্গের মৃতদেহটা সম্পর্কে কথা বলছি,' বললেন হ্যানলে।

'আমিও তাই,' ম্যাকার্থি উত্তর দিলেন।

'লারকিন এবং তার স্ত্রী ১৯৫৪ সালে লণ্ডনে আসে।' ধীরে ধীরে বললেন হ্যানলে, 'মেয়ো রোডের পুরনো বাড়িটা ওরা কেনে আগের মালিকের মৃত্যুর পর। বিভিন্ন সূত্রে কথাবার্তায় জানা গেছে ১৯৬৩-র আগস্টে মিসেস লারকিন তাঁর স্বামীকে ফেলে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। গতকাল বাড়িটা ভাঙার সময় একটা ইটের কুঠরির মধ্যে তাঁর মৃতদেহটা আমরা পেয়েছি।'

'আপনারা তো আমায় বলেননি যে কতদিন লারকিনরা ওই বাড়িতে ছিল,' যুক্তি দেখালেন ম্যাকার্থি, 'আপনারা আমাকে বলেছেন একটা প্রায় মমি হয়ে যাওয়া মৃতদেহের প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট করতে। আমি তাই করেছি।'

'কিন্তু দেহটা তো প্রায় মমি হয়ে গেছে,' অধীর গলায় বললেন হ্যানলে, 'এরকম অবস্থায় মৃত্যুর প্রকৃত সময়ের সঙ্গে আপনাদের অনুমানের নিশ্চয়ই অনেক ফারাক হতে পারে?'

'না, অন্তত কুড়ি বছর তো নয়ই। 'সহজ গলায় বললেন ম্যাকার্থি, '১৯৪৫-এর পর ওই শরীরটা কোনভাবেই বেঁচে ছিল না। শরীরের ভিতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নিয়ে যে পরীক্ষা আমরা করেছি, তা অভ্রান্ত, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই। মোজাটা অবশ্য আলাদা করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কাগজটাও তাই। কিন্তু আপনিই বলেছেন, দুটোই ব্যবহারের সময় অনেক পুরনো হতে পারে। কুড়ি বছরেরও পুরনো হতে পারে। কিন্তু চুল, নখ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—এগুলো তো হবে না।'

হ্যানলের তখন মনে হচ্ছে, তিনি জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছেন। এ যেন অনেকটা রাগবির খেলায় সব বাধা ভেদ করে সবে যখন গোললাইনের সামনে পৌঁছেছেন, তখনই বলটা তাঁর হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। আপ্রাণ চেষ্টা করছেন ধরতে, কিন্তু কিছুতেই ধরে রাখতে পারছেন না। ১৯৫১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ট্রিপল এগউন ম্যাচে এরকম একবার হয়েছিল··· ।

চটকটা ভেঙে গেল, দ্রুত সামলে নিলেন নিজেকে।

'আচ্ছা, বয়স ছাড়া আর কি কি পেয়েছেন? প্রশ্ন করলেন হ্যানলে, 'মিসেস লারকিন বেঁটে ছিলেন, পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি হাইট।'

ম্যাকার্থি মাথা নাড়লেন, 'নাঃ, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে চোরাকুঠরিতে থাকলেও

হাড়ের দৈর্ঘ্য বদল হয় না। মহিলা পাঁচ ফুট দশ-এগার ইঞ্চি লম্বা, রোগা গড়নের।'

'চুল কালো ? কোঁকড়ানো ?' আবার প্রশ্ন হ্যানলের।

'একেবারেই না, পুরোপুরি সোজা চুল। অনেকটা আদার মত রং, এখনো মাথায় লেগে রয়েছে।'

'মৃত্যুর সময় বয়স কত ছিল ? পঁয়ত্রিশ ?'

'না,' বললেন ম্যাকার্থি, 'মহিলার বয়স পঞ্চাশের উপর। বাচ্চাও হয়েছে, সম্ভবত দু'টো, এমনকি দ্বিতীয় বাচ্চার পর আর যাতে না হয়, সেজন্য অপারেশন ও করানো হয়েছে।'

'তাহলে, আপনি বলতে চান,' কেটে কেটে বলতে লাগলেন হ্যানলে, 'যে ১৯৫৪ সাল থেকে ওরা দু'জন অর্থাৎ হারবার্ট এবং ভায়োলেট লারকিন—একটা মৃতদেহ থেকে মাত্র ফুট দুয়েক দূরে একটা ঘরে এত দিন কাটিয়ে গেল ? তারপর ভায়োলেট ১৯৬৩ সালে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু লারকিন একা পনেরোটা বছর ওই মৃতদেহের সঙ্গে কাটাল ?'

'নিশ্চয়ই তাই করেছে,' ম্যাকার্থি উত্তর দিলেন, 'একটা মৃতদেহ যখন মমি হয়ে যায়, তখন তা থেকে গন্ধ ছড়ায় না। আর ওই ধরনের গরম আবহাওয়ায় মৃতদেহ খুব তাড়াতাড়ি মমি হয়ে যায়। যদি ধরে নেওয়া যায়, ১৯৪৩ সালেই মহিলা খুন হয়েছেন, তাহলে ১৯৫৪ সালে মৃতদেহ মমি হয়ে গেছে। তখন যে অবস্থায় ছিল, গতকাল সেই অবস্থাতেই আমরা পেয়েছি। আচ্ছা, ১৯৪৩ সালে ওই লোকটা—কী যেন নাম—লারকিন—হ্যাঁ, লারকিন কোথায় ছিল ?'

'সাইলেশিয়ায় যুদ্ধবন্দীদের ক্যাম্পে।' বললেন হ্যানলে।

'তাহলে ও মহিলাকে খুনও করেনি, ফায়ারপ্লেসের পাশে কুঠরি বানিয়ে রাখেওনি', উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন প্রফেসর, 'কিন্তু প্রশ্ন হলো, খুনটা করলো কে ?'

টেলিফোনটা তুলে ইন্টারকমে ডিটেকটিভদের ঘরে ডাক পাঠালেন হ্যানলে। তরুণ সার্জেন্ট ফোন ধরল।

'আচ্ছা' খানিকক্ষণ ভেবে বললেন হ্যানলে, '১৯৫৪ সালে লারকিনরা কেনার আগে মেয়ো রোডের বাড়িটার মালিক কে ছিল ? কে থাকত বাড়িটায় ? ১৯৫৪ সালেই যে মারা গিয়েছিলো।'

'সেটা ঠিক জানি না স্যার,' বলল সার্জেণ্ট।

'কতদিন ধরে বাড়িটায় ছিল?'

'আসলে এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করিনি স্যার। তবে আমার মনে পড়ছে, কে যেন বলেছিল, আগের জন ওই বাড়িটায় প্রায় তিরিশ বছর ছিল। এক বিপত্নীক ভদ্রলোক।'

'হ্যাঁ, বিপত্নীক-ই বটে, গর্জে উঠলেন হ্যানলে, তার নাম কি?'

ওধারে খানিকক্ষণ কথা নেই। তারপর সার্জেণ্ট বলল, 'আমি জিজ্ঞেস করিনি, স্যার।'

দু'ঘণ্টা বাদে বৃদ্ধ লারকিনকে ছেড়ে দেওয়া হল। তাকে অবশ্য বাইরে বের করা হল পিছনের দরজা দিয়ে, কারণ সামনের দরজায় খবরের কাগজের লোকজন ওঁৎ পেতে থাকতে পারে। এবার আর কোন পুলিসের গাড়ি নেই, সঙ্গে কোন লোকজন নেই। বুড়োর পকেটে শুধু নগর পরিষদের একটা হোস্টেলের ঠিকানা। কোন কথা না বলে, ধীর পদক্ষেপে বুড়ো ফুটপাথে নামল। তারপর হেঁটে চলে গেল।

মেয়ো রোডে তখন গোটা কার পার্কটা ঘিরে বেড়া দেবার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। যে জায়গায় লারকিনদের বাড়ি ও বাগানটা ছিল, সেই জায়গায় এখন একটা বড়, সমান কংক্রিটের চাঁই শুকোনো হচ্ছে। শুকোনো প্রায় হয়ে এসেছে। দিনের আলোও প্রায় শেষ পর্যায়ে। দু'জন কর্মী'সহ ফোরম্যান মাঝে মাঝেই চাঁইটা ঠুকে পরীক্ষা করছে।

ফোরম্যানের একটা বুটের গোড়ালি ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়া। তাই দিয়েই কংক্রিটটা পরীক্ষা করছে সে।

'শুকিয়ে গেছে' একসময় বলল ফোরম্যান, 'মালিক চান আজ রাতের মধ্যেই বেড়া দিয়ে ঘিরে কারপার্কের কাজ শেষ করতে।'

রাস্তার অন্যদিকে আবর্জনার স্তূপে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল। বাড়িটার ধ্বংসাবশেষের শেষ চিহ্নগুলো—কাঠের দরজা-জানালার ফ্রেম, সিলিং-এর বিম, আলমারির কাঠ, আরো যা যা ছিল—বেড়া, মুরগির ঘর—সব একজায়গায় করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সেই আগুনের আলোতেও কর্মীরা কেউ দেখতে পেল না যে লোহার তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে এক বৃদ্ধ একদৃষ্টে দেখে যাচ্ছে তাদের।

নতুন কংক্রিট পরীক্ষা করে ফোরম্যান তখন জমির শেষপ্রান্তে চলে এসেছে,

আগে যেখানে বেড়া দেওয়া ছিল। সেখানে পায়ের কাছটা দেখল সে।

'এটা কি?' জিজ্ঞেস করল ফোরম্যান, 'এটা তো নতুন নয়। এতো পুরনো।'

একটা ৬ ফুট বাই ২ ফুট কংক্রিটের চাঁই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ফোরম্যানের।

যে লোকটি সেদিন সকালে কংক্রিট জমানোর মশলা মিশিয়েছে, সে এগিয়ে এলো, 'এটা মুরগির ঘরের মেঝে ছিল স্যার।'

'তুমি এর উপর নতুন মশলা দাও নি?' প্রশ্ন করলো ফোরম্যান।

'না দিলে ওই জায়গাটা অন্যাগুলোর তুলনায় অনেক উঁচু হয়ে যেত। সেক্ষেত্রে টারম্যাকে একটা বড় কুঁজের সৃষ্টি হত।'

'এখানে কাজে যদি কোন গোলমাল হয়, তাহলে মালিক আবার আমাদের দিয়ে পুরো কাজ করাবে, সেইসঙ্গে টাকা কেটে নেবে,' গম্ভীর গলায় বলল ফোরম্যান। কয়েক পা এগিয়ে একটা বড়, ভারি ইস্পাতের রড নিয়ে ফিরে এল সে. সেটা মাথার উপর তুলে সপাটে আঘাত করল কংক্রিটের চাঁইটার উপর। রডটা লাফিয়ে ফিরে এল। চাঁই অক্ষত, ফোরম্যান মুখ দিয়ে একটা শব্দ করে উঠল।

'বাব্বাঃ, এতো বেশ শক্ত,' বলল ফোরম্যান, তারপর কাছেই অপেক্ষমান বুলডোজারের দিকে ঘুরে বলল, 'মাইকেল জায়গাটা সমান করে দাও।'

রাস্তার উপরের জ্বলন্ত আলকাতরার স্তূপটাকে ঠেলে কংক্রিটের আয়তক্ষেত্রটার উপর ঢেলে দিল বুলডোজারের ব্লেড। নরম, ভিজে ভিজে চিনির পাহাড়ের মত ভঙ্গুর স্তূপটা বসে গেল কংক্রিটের চাঁইয়ের উপর। কয়েক মিনিটের মধ্যে জায়গাটা কালো হয়ে গেল। সমান, সমতলভাবে প্রলেপ পড়েছে আলকাতরার। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা যান্ত্রিক রোলার বাকি কাজটা শেষ করে দিল। আকাশের গায়ের শেষ আলোটুকু যখন মুছে যাচ্ছে, কর্মীরা সব কাজ শেষ করে বাড়ির পথ ধরল। অবশেষে কার পার্কের কাজ শেষ হয়েছে।

তারের বেড়ার পিছনে বৃদ্ধ লোকটিও ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। একটি কথাও সে বলেনি। না, একটি কথাও না, কিন্তু বহুদিন পর, এই প্রথম, তার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। পরিপূর্ণ, খাঁটি স্বস্তির এক দীর্ঘ, খুশির হাসি।

———

ডেস্কের ওপাশে নতুন চাকরী প্রার্থী বসে আছে। এপাশ থেকে বেশ তীক্ষ্ন চোখে তাঁর দিকে তাকালো ম্যাককুইন। দৃষ্টিতে খানিকটা সন্দেহ যেন মিশে আছে। তার কারণও আছে। এর আগে ম্যাককুইন কাউকেই চাকরীতে নেয়নি, কারণ তার দরকারও হয়নি। তবে ম্যাককুইন নির্দয় নয়। লোকটির যদি সত্যিই টাকার দরকার থাকে এবং কাজ করতে যদি সে রাজি হয়, সুযোগ দিতে আপত্তি নেই ম্যাককুইনের।

'আপনি কি জানেন এখানে কাজ করতে গেলে খুবই পরিশ্রম করতে হবে?' প্রশ্ন করল ম্যাককুইন।

'হ্যাঁ স্যার', চাকরি প্রার্থী জবাব দিল।

'কাজটা কিন্তু ঘুরে ঘুরে করতে হবে। এটা আগে থেকে জেনে রাখা ভাল। কোন প্রশ্ন করবেন না, অযথা কৌতূহল দেখাবেন না। টাকা পাবেন সঙ্গে সঙ্গে, এক জোটে, এর অর্থ জানেন?'

'না, স্যার।'

'এর অর্থ হল টাকাটা আপনি নগদে পাবেন। অবশ্য টাকা ভালই দেওয়া হবে। কোন কাটা-কাটির ব্যাপার নেই, ঠিক আছে?'

ব্যাপারটা বোঝার অসুবিধা নেই। ম্যাককুইনের বক্তব্য হল এই টাকা থেকে কোন আয়কর কাটা হবে না, জাতীয় স্বাস্থ্য খাতেও কিছু দিতে হবে না। হয়ত এটাও বলতে চেয়েছেন যে বিমার জন্য বা অন্য কোন নিরাপত্তা খাতেও কোন টাকা কাটা হবে না। আজকের দিনে দ্রুত লাভ করাটাই প্রধান লক্ষ্য। চাকরি প্রার্থীর নিজেরও এতে কোন আপত্তি নেই। সে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে তাঁর সম্মতি জানিয়ে দিল, যার অর্থ সে ব্যাপারটা বুঝেছে। তবে সত্যি কতটা বুঝেছে তা বোঝা গেল না। ম্যাককুইন আবার তাঁর দিকে বেশ চিন্তিতভাবে তাকালো।

'আপনি বললেন আপনি ডাক্তারীর ছাত্র, তাই তো? রয়্যাল ভিক্টোরিয়া কলেজে শেষ বছর?'

আবার সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নড়ে উঠল।

'গরমের ছুটিতে এসেছেন?'

আবার সেই ঘাড় নাড়া। বোঝাই যাচ্ছে এর টাকার দরকার, কারণ বৃত্তি হিসাবে যা পায়, তাতে খরচ পুষিয়ে উঠছে না। তাই খরচ চালাতে গেলে টাকার দরকার। ম্যাককুইন পেশায় কনট্রাকটার, ভাঙা-ভাঙি করাটাই যার

কাজ। এইখানে এই ছোট্ট, সংকীর্ণ অফিসে বসেই গোটা ব্যবসাটা সে চালায়, জায়গাটার নাম ব্যাঙ্গর। নিজস্ব জিনিষ বলতে একটা লঝ্‌ঝড়ে ট্রাক আর কয়েক টন সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ভারী হাতুড়ি। এই নিয়েই তার উন্নতি। নিজেকে সে পুরোপুরি সুপ্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে। এই ছেলেটিও কাজ করতে চায়, চিন্তা করতে পারে। একে হতাশ করার কোন ইচ্ছে ম্যাককুইনের নেই, চেহারাটা তার যেমনই হোক না কেন।

'ঠিক আছে', বলল ম্যাককুইন,' তুমি তোমার মালপত্র নিয়ে ব্যাঙ্গরে চলে এস। তুমি বলে বলছি, কিছু মনে কর না, বয়সে তুমি অনেক ছোট। বেলফাস্ট থেকে রোজ সময় মত আসা-যাওয়া করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের এখানে সকাল সাতটায় কাজ শুরু হয়, চলে সন্ধ্যে পর্যন্ত। ঘড়ি ধরা কাজ, পরিশ্রম আছে, তবে মাইনে ভাল। তবে কারুর নামে যদি খারাপ কোন রিপোর্ট কতৃপক্ষের কাছে আসে, তাহলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাকরি যায়। বুঝতে পেরেছো ?'

'হ্যাঁ স্যার, তাহলে কবে থেকে কাজ শুরু করব ? জায়গাটাই বা কোথায় ?'

'প্রত্যেকদিন সকাল সাড়ে ছ'টায় মুলে স্টেশন ইয়ার্ড থেকে আমার ট্রাক কর্মীদের দলের সবাইকে তুলে নেয়। আগামী সোমবার সকালবেলা তুমি ওখানে হাজির থাকবে। দলের ফোরম্যানের নাম—বিগ বিলি ক্যামেরন। আমি ওকে তোমার ওখানে হাজির থাকার কথা বলে দেব।'

'ঠিক আছে মিঃ ম্যাককুইন,' বাইরে যাবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল চাকরি প্রার্থী।

'আর একটা কথা', টেবিলে পেন্‌সিল ঠুকতে ঠুকতে বললেন ম্যাককুইন, 'আপনার নামটা কি ?'

'হারকিষেণ রামলাল', উত্তর দিল ছাত্রটি। ম্যাককুইনের দৃষ্টি পেন্‌সিল এবং সামনে পড়ে থাকা নামের তালিকা ঘুরে আবার গিয়ে স্থির হল ছাত্রটির মুখের উপর।

'আমরা তোমাকে রাম বলে ডাকব', বললেন ম্যাককুইন। নামের তালিকাতেও সেই নামটাই লিখে নিলেন তিনি।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের উত্তর উপকূলে ছোট্ট কাউণ্টি শহর ব্যাঙ্গর। জুলাইয়ের শেষের সেই রৌদ্রস্নাত সকালে খুশিমনে ছাত্রটি বেরিয়ে এল রাস্তায়। শনিবার সন্ধ্যের মধ্যেই সে একটা সস্তায় বাসা খুঁজে নিল। বাড়িটা ব্যাঙ্গরের

ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় রেলওয়ে ভিউ স্ট্রীটে। অনেকগুলো সস্তার বাড়ি আছে এখানে। এ বাড়িটাও খুবই ছোট, অনেকটা বোর্ডিং হাউস ধরনের, তবে সস্তা। বাড়িটা রেল স্টেশনের খুব কাছে। তাছাড়া যেখান থেকে ট্রাক ছাড়বে সেই মূল স্টেশন ইয়ার্ড থেকেও বাড়িটা বেশ কাছে। ঘরের জানলা থেকে সোজা তাকালে সমুদ্রের উপকূল ধরে রেল লাইন দেখা যায়। বেলফাস্ট থেকে ট্রেনগুলো এখানেই আসে।

অনেক চেষ্টার পর সে ঘরটা পেয়েছে। এই বাড়িগুলোয় সস্থায় থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেকটা বাড়ির জানলায় সেরকম নোটিশও দেওয়া রয়েছে। প্রথম যখন সে এই বাড়িটার দরজায় দাঁড়াল, তখন মনে হয়েছিল বাড়িটায় জায়গা নেই। আসলে গরম কালটায় এই সময়ে এই জায়গাটায় প্রচুর অস্থায়ী শ্রমিক ঢুকে পড়ে। তবে এটাও সত্যি যে বাড়ির মালিকন মিসেস ম্যাকমূর্ক ধর্মপ্রাণ মহিলা। সত্যিকারের প্রয়োজন যাঁদের, তাঁদের জন্য ঘর তিনি রাখেন।

রবিবার সকালবেলা বেলফাস্ট থেকে সব জিনিষপত্র নিয়ে এল রামলাল। জিনিষপত্রের অধিকাংশই অবশ্য ডাক্তারার বই। বিকেলবেলা নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে একমনে নিজের দেশের কথা মনে করতে লাগল। তার দেশ পাঞ্জাবে। বিকেলবেলায় ধূসর পাহাড়ের উপরে সেখানে খেলা করে শেষ সূর্যের নরম আলো; সকালে আবার উজ্জ্বল আলোয় ঝিকমিক করতে থাকে তাদের চূড়াগুলো। আর বছর খানেকের মধ্যেই সে পাশ করা ডাক্তার হয়ে যাবে, তারপর বছর খানেক শিক্ষানবীশি করতে হবে। সেটা শেষ হলেই সে ফিরে যাবে দেশে। তাঁর নিজের দেশে মানুষগুলোর মধ্যে রোগ-ভোগ প্রচণ্ড। তাদের সে চিকিৎসা করবে, সুস্থ করে তুলবে, এটাই তাঁর স্বপ্ন। সেইভাবে হিসেব করেই সে এগিয়েছে। এ বারের গরমের ছুটিতে কিছু টাকা রোজগার করে নিতে পারলে ফাইনাল পরীক্ষাটা সে ভালভাবেই দিয়ে দিতে পারবে। ডাক্তারী পাশ করে গেলে তখন তো তাঁর নিজস্ব মাইনেই হবে।

ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়েই শুয়েছিল। সোমবার ভোর ঠিক পৌনে ছ'টায় ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা জলে স্নান-টান সেরে ঠিক ছ'টার পর সে গিয়ে হাজির হল স্টেশন ইয়ার্ডে। নষ্ট করার মত সময় নেই। তড়ি-ঘড়ি একটা কাফেতে ঢুকে আগে দু-কাপ ব্ল্যাক-টি খেয়ে নিল। এই দিয়েই সারাদিন চালাতে হবে। সোয়া ছ'টায় ট্রাক চলে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে

জনা বারো লোকের একটা ভিড় জমে গেল। রামলাল বুঝতে পারছিল না এখন তার করণীয় কী—নিজে থেকে এগিয়ে যাবে, নিজের পরিচয় দেবে? নাকি একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে? ভেবেচিন্তে অপেক্ষা করাই সাব্যস্ত করল সে।

ছ'টা বেজে পঁচিশে ফোরম্যানের গাড়িটা এসে দাঁড়াল। একপাশে সেটাকে পার্ক করে হেঁটে ট্রাকের কাছে এল সে। হাতে ম্যাককুইনের দেওয়া নামের তালিকা। দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে সহজেই তাদের চিনতে পারল। ধীরে মাথা নাড়ালো ফোরম্যান। ভারতীয় ছাত্রটি এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। একদৃষ্টে তাকে দেখতে লাগল ফোরম্যান তারপর কড়া গলায় জানতে চাইল, 'তুমিই তাহলে ম্যাককুইনের কাজে নতুন বহাল হওয়া নয়া, কালা-আদমী?'

চলতে চলতে থেমে গেল রামলাল। ধীর স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, আমার নাম হরকিষেণ রামলাল।

বিলি ক্যামেরনের নামের আগে বিগ শব্দটা বসেছে কেন তা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই, তাঁকে দেখলেই মালুম হয়। এমনিতেই সে লম্বায় ছ'ফুট তিন ইঞ্চি, তার উপরে তার পায়ে বিশাল বিশাল দুই জুতো। তাদের গোড়ালির জায়গাটা ইস্পাতের পাতে মোড়া, বিশাল দুটো কাঁধ থেকে ঝোলা হাতদুটো যেন দুটো মোটামোটা গাছের গুঁড়ি। বিরাট মাথাটার উপরে এক গুচ্ছ রুপোলি চুল। চোখ দুটো ছোট ছোট, চোখের পাতার লোমগুলো পর্যন্ত বিবর্ণ, ফিকে। সেই চোখ দুটো দিয়ে ক্ষুদ্রকায়, শীর্ণ ভারতীয়টির দিকে ঘৃণায় পূর্ণভাবে চেয়ে রইল ফোরম্যান। বোঝাই যাচ্ছে সে আদৌও খুশি হয়নি। শেষমেশ মাটিতে থুথু তো ফেলে সে বলল। 'ঠিক আছে, ট্রাকে উঠ।'

ট্রাকটার সামনের আর পিছনের মধ্যে কোন পার্টিশান দেওয়া নেই। পিছন দিকে দু'দিকে দুটো কাঠের বেঞ্চ পাতা। তার উপরে এক ডজন শ্রমিক গাদা-গাদি করে বসে আসে। আর সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে আছে ক্যামেরন। রামলাল গিয়ে একদম পিছনদিকে একটা বেঁটে, শক্ত-পোক্ত লোকের পাশে গিয়ে বসল। লোকটার চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল নীলাভ, ব্যবহারটাও হাসি-খুশি, বন্ধুত্ব-পূর্ণ।

জানা গেল তার নাম—টমি বার্নস। গলায় বেশ কৌতূহল এনে লোকটা

জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাড়ি কোথায় ?'

'ভারতে, পাঞ্জাবে,' বলল রামলাল।

'কোথায় ?' আবার প্রশ্ন বার্নসের।

রামলাল মৃদু হাসল। বলল, 'পাঞ্জাব ভারতের একটা অংশ।'

বার্নস খানিকক্ষণ কি যেন চিন্তা করল। বেশ খানিকক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি প্রোটেস্ট্যান্ট, না ক্যাথলিক ?'

'কোনটাই না', ধীর স্বরে বলল রামলাল, 'আমি হিন্দু।'

'মানে তুমি খৃস্টান নও ?' বিস্ময়ে মুখ হ্যাঁ হয়ে গেছে বার্নস-এর।

'না, আমরা হিন্দু ধর্মমতে বিশ্বাসী।'

'আরে, সব শুনেছো', অন্যদের ডেকে বলল বার্নস, 'এই লোকটা খৃস্টানই নয়।' তার গলায় কোন রাগ নেই, আছে স্রেফ কৌতূহল। ঠিক যেন একটা বাচ্চা ছেলে একটা নতুন, অদ্ভুত খেলনার সন্ধান পেয়েছে।

ট্রাকের সামনে থেকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ক্যামেরন। রাগত স্বরে বলল, 'ওহে, এতো আদিম, বর্বর।'

রামলালের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। চুপচাপ একদৃষ্টে ট্রাকের উল্টো দিকের ক্যানভাসের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল সে। এতক্ষণে তারা ব্যাঙ্গরের দক্ষিণ দিকে অনেকটা চলে এসেছে, এগিয়ে চলেছে নিউ-টাউনের দিকে। খানিকক্ষণ বাদে বার্নস রামলালের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করল। এর নাম ক্রেগ, এ'হল মনরো, এ প্যাটারসন·· এই যে বয়েড···আর ওরা দুই ব্রাউন ভাই। বেলফাস্টে রামলাল অনেকদিন আছে। সে সহজেই বুঝল এরা সবাই মূলতঃ স্কটল্যাণ্ডের লোক। ধর্মে সবাই প্রোটেস্ট্যান্ট। এদিককার ক্লার্টিন্টগুলোয় প্রোটেস্টান্টদের ছড়াছড়ি। তবে লোকগুলো হাসি-খুশি, মিশুকে। আলাপ হবার পর সবাই তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

প্যাটারসন বলে যে বয়স্ক লোকটির সঙ্গে আলাপ হল, সে প্রশ্ন করল, 'তোমার সঙ্গে লাঞ্চ বক্স আনোনি ?'

'না', উত্তর দিল রামলাল, 'অত ভোরে ল্যান্ড লেডিকে লাঞ্চ তৈরী করার কথা বলতে পারিনি।'

'কিন্তু লাঞ্চ না খেয়ে পারবে না, বলল বার্নস, 'এমনকি সকালেও খাওয়া দরকার। আমরা নিজেরাই অবশ্য অনেক সময়ে সেটা করি নি।'

'আগামীকাল থেকে আমি অবশ্যই খাবার সঙ্গে নিয়ে আসব। একটা

টিফিন বক্সও কিনব।' বলল রামলাল।

ভারতীয় ছাত্রটির রবারের সোল দেওয়া নরম বুটজোড়ার দিকে দেখল বার্নস।

জিজ্ঞেস করল, 'আগে কখনও এ ধরনের কাজ করনি?'

রামলাল মাথা নাড়ল, করিনি।

'তোমার একজোড়া ভারী বুট দরকার। পা-দুটো বাঁচানোর জন্য এটা খুবই জরুরী।' আবার রামলাল প্রতিশ্রুতি দিল যে সে একজোড়া ভারী বুট কিনে নেবে। বেশী রাতে খোলা পেলে আজ রাতেই কিনবে। ততক্ষণে তাঁরা নিউটাউন পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে কুমবারের দিকে। ক্রেগ তারদিকে তাকালো, জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এমনিতে কি কর?'

'বেলফাস্টে রয়াল ভিক্টোরিয়া কলেজে ডাক্তারী পড়ি', বলল রামলাল, 'আশা করছি সামনের বছর ডাক্তার হয়ে বেরোব।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল টমি বার্নস। বলে উঠল, 'তাহলে তো ডাক্তার প্রায় হয়েই গেছ। এই যে, বিগবিলি, শুনছো? আমাদের মধ্যে কারুর শরীর টরীর খারাপ হলে রামই চিকিৎসা করতে পারবে।'

বিগবিলি গর্জে উঠল, 'আর যাকে করুক, আমার গায়ে যেন ও হাত না ছোঁয়ায়।'

এরপর আর কথা চলে না, অতএব সবাই থেমে গেল। ট্রাকটা উত্তর-পশ্চিমে আর খানিকটা এগিয়ে কুমবার ছাড়িয়ে আরও মাইল দু'এক গিয়ে যেখানে ব্রেক কষলো, সে রাস্তাটার নাম ডানডোনালাড রোড। একসারি গাছের শেষে যেখানে ট্রাকটি দাঁড়াল, দেখা গেল সেখানে একটা বাড়ি ভাঙা হচ্ছে।

বাড়িটা আসলে একটা বিরাট বড়, পুরোনো হুইস্কি তৈরীর কারখানা।

দেখেই বোঝা যায় বাড়িটা অনেক দিনের পরিত্যক্ত, চারটে দিক খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে। এই এলাকায় আগে দুটো আইরিশ হুইস্কি তৈরীর কারখানা ছিল, এটা তারই একটা। তবে বেশ কয়েক বছর হল এখানকার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে।

একেবারে কুম্বার নদীর ধারে বাড়িটা। নদীটা এখন মজে গেছে, আগে তাতে বেশ জল ছিল। ডানডোনাল্ড থেকে কুম্বার পর্যন্ত বয়ে গিয়ে একেবারে স্ট্রাংফোর্ড লাফে গিয়ে মিশেছে। ঘোড়ার টানা গাড়িতে করে এখানে ক্যান আসত, আবার তাতে হুইস্কি ভর্তি করে ওই একই পথে পাচার হত, পিপে

ভর্তি করে হুইস্কি যেত এখান থেকে। কুম্বার নদীর জল খুব মিষ্টি ছিল, সেই জল খাওয়াও যেমন যেত, তেমনি তা থেকে শক্তি উৎপাদন করে মেশিনও চালানো যেত। কিন্তু তারপর বছরের পর বছর ধরে বাড়িটা নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত এবং শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে।

আগে স্থানীয় ছেলেরা বাড়িটার দরজা-জানলা ভেঙে ভিতরে ঢুকে খেলত। খালি বাড়ি, খেলার আদর্শ জায়গা। কিন্তু একদিন একজনের পা পিছলে পড়ে পা ভেঙে গেল। তখন নগর পরিষদ এটাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিপজ্জনক বাড়ি বলে ঘোষণা করল। বাড়ির মালিককে নোটিস দেওয়া হল, এ বাড়ি ভাঙা বাধ্যতামূলক।

বাড়িটির বর্তমান মালিক এবং পুরনো, অভিজাত জমিদার বংশের তরুণ বংশধর। আগে তাঁদের অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু এখন তা নয়। তিনি ব্যাপারটা যত সস্তায় সম্ভব সেরে ফেলতে চাইলেন। এইখানে ডাক পড়ল ম্যাককুইনের। ভারি যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজটা আরো অনেক তাড়াতাড়ি করা যেত, কিন্তু তাতে খরচও বাড়ত। বিগ বিলি ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা শাবল-গাঁইতির সাহায্যেই কাজটা সেরে দেবে। এমনকি বাড়ি ভাঙার পর যে সব কাঠ-তক্তা বা কয়েকশো টন পোড়া ইট বেরোবে, সেগুলোকেও ম্যাককুইন এক গৃহনির্মাণকারীর কাছে বিক্রি করে দেবার বন্দোবস্ত করেছে। এখনকার দিনে বড়লোকেরা বাড়ি তৈরি করার সময় তাতে এক অভিনব 'স্টাইল' চায়, সে স্টাইল হল বাড়িটাকে পুরনো পুরনো দেখানো। তাই পুরনো দিনের রোদে পোড়া ইট আর সত্যিকারের ভালো কাঠের এখন বাজারদর ভালো। বড় বড় চাকুরেরা সেসব দিয়ে নিজেদের পুরনো দেখানো নতুন বাড়ি সাজায়। এসব ব্যাপারে ম্যাককুইনের মাথা খেলেও ভালো।

ট্রাকটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ানোর পর বিগ বিলি বলল, 'দেখে নাও, এই বাড়িটাই ভাঙতে হবে। ছাদের টালি থেকে আমরা শুরু করব। কী করতে হবে, তা তো তোমরা জানোই।'

ভাঙার সরঞ্জামগুলো এক জায়গায় স্তূপ করা রয়েছে। তার পাশে বিলির লোকেরা সারি বেঁধে দাঁড়াল। কী নেই সেই স্তূপে। সাত পাউন্ডের মাথা-ওলা বিশাল বিশাল হাতুড়ি। ছ'ফুট লম্বা, এক ইঞ্চি ঘনত্বের শাবল, গজখানেকে উপর লম্বা, বাঁকানো মাথার গাঁইতি, পেরেক তোলার ছোট রেঞ্চ, ছোট হাতলওলা ভারি মাথার হাতুড়ি এবং অজস্র ধরনের কাঠ কাটার করাত। আর মানুষগুলোর

নিরাপত্তার ব্যবস্থা বলতে ডগাক্লিপ আঁটা বেশ কয়েকটা চওড়া বেল্ট, আর কয়েক শো ফুট লম্বা দড়ি। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলল রামলাল। বাড়িটার চারতলা উঁচু, আর রামলাল উচ্চতাকে ভয় পায়। অত উঁচুতে দড়ি……। কিন্তু উপায় নেই, ভারা বাঁধতে গেলে খরচ অনেক।

দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে একজন গিয়ে একটা কাঠের দরজা এমন ভাবে মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল, যেন সেটা তাদের ঘরের দরজা। তারপরেই সে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। আর একজন সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় ক্যানে করে কাছের নদীটা থেকে জল এনে আগুনের উপর চাপিয়ে দিল। রামলাল বুঝল, জল ফোটানো হচ্ছে চা তৈরি করা হবে বলে। প্রত্যেকের সঙ্গেই একটা করে এনামেলের মগ রয়েছে। নেই কেবল রামলালের। মনে মনে সে ঠিক করে নিল, কালই একটা মগ কিনে আনতে হবে। এ কাজে টিকে থাকতে হলে গলা ঘন ঘন শুকোবে, ধুলো-ময়লা মাখতে হবে গায়ে। অতএব কিনে নেওয়াই ভাল। টমি বার্ন'স ততক্ষণে তার নিজের মগের চা শেষ করে, আবার ভরে, রামলালকে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ভারতে তোমরা চা খাও?'

কোন কথা না বলে রামলাল গরম মগটা নিল। চা-টা ইনস্ট্যান্ট টি, মিষ্টি বেশি। রংটা একেবারে সাদা। একেবারেই খাবার ইচ্ছে হল না তার, তবু নিল।

প্রথমদিন সকালটা তারা শুধু ছাদেই কাজ করে কাটাল। টালিগুলো রেখে দেবার কথা বলা হয়নি, তাই সেগুলো একটা একটা করে খুলে নিচে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল তারা। এদিকে নগর পরিষদ থেকে বলে দেওয়া হয়েছে, আবর্জনার স্তূপে নদী যেন আটকে না যায়। কাজেই টালিগুলো নদী থেকে একটু দূরেই ফেলতে লাগলো তারা। বাড়িটার ভিতর দিকে একটা খালি জায়গায় লম্বা লম্বা ঘাস হয়ে আছে, তার চারধারে আগাছা। আগাছা অবশ্য বাড়িটার সবদিকেই রয়েছে। সেই সব জায়গাতেই টালিগুলো ফেলতে লাগলো কর্মীরা। সবক'টা লোকের কোমর একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা, যদি ছাদে কারুর পা পিছলে যায়, বা গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তাহলে পরের লোকে ব্যালান্স ঠিক রাখবে এবং সঙ্গীকে গড়িয়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচাবে। এক এক করে টালিগুলো খুলে ফেলার পর ছাদের জায়গায় একটা বেশ বড় ফাঁকা শূন্যস্থানের সৃষ্টি হল। ঠিক তার নিচেই সবচেয়ে উঁচুতলার ঘরের মেঝে। এটাই মস্ট স্টোর।

বাড়িটার সিঁড়িগুলোর অবস্থাও সঙ্গীন, অনেক জায়গাতেই ভেঙেচুরে গেছে সেগুলো। ঠিক দশটায় সেই সিঁড়ি বেয়ে শ্রমিকরা নেমে এল, প্রাতরাশের জন্য। ঘাসের উপর বসে ব্রেকফাস্ট খাওয়া হল, সঙ্গে আবার এক ক্যান চা। রামলাল কিছু খেল না। ঠিক দু'টায় মধ্যাহ্নভোজের বিরতি। শ্রমিকরা সবাই স্তূপাকৃতি স্যাণ্ডউইচ নিয়ে বসে পড়েছে। রামলাল তার হাতের দিকে তাকাল। বেশ কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। ভীষণ খিদে পেয়েছে তার, পেশীগুলোও ব্যথা করছে সেইসঙ্গে। মনে মনে ঠিক করে নিল, কাজের জন্য বেশ কয়েক জোড়া গ্লাভস কিনে নিতে হবে।

নিজের টিফিন বাক্স থেকে একটা স্যাণ্ডউইচ বের করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল টমি বার্নস। বলল, 'রাম, তোমার খিদে পায়নি? খাও, আমার কাছে অনেকগুলো রয়েছে।'

যে জায়গাটায় সবাই গোল হয়ে বসে খাচ্ছিল, তার ঠিক মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে তৈরি হচ্ছিল চা। সেই আগুনের আড়াল থেকে হঠাৎ ভেসে এল বিগবিলির কণ্ঠস্বর, 'টমি কি করছ?'

থমকে গেল বার্নস, ধীর স্বরে বলল, 'ছেলেটাকে একটা স্যাণ্ডউইচ খেতে দিচ্ছিলাম।'

'কেলেটাকে নিজের স্যাণ্ডউইচ নিজে আনতে দাও', গর্জে উঠল বিলি, 'তুমি নিজের পেট ভরাও।'

প্রতিটি লোক চুপচাপ যে যার টিফিন বাক্সের দিকে তাকিয়ে খেয়ে যেতে লাগল। এটা পরিষ্কার যে কেউ বিগবিলির সঙ্গে গোলমালে জড়িয়ে পড়তে চায় না।

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমার খিদে পায়নি', রামলাল বার্নসকে বলল। ওখান থেকে উঠে একটু হেঁটে গিয়ে সে নদীর ধারে বসল। হাত দুটোয় বড় জ্বালা করছে, নদীর জলে হাত ডুবিয়ে বসে রইল সে।

সূর্য অস্ত যাবার পর ট্রাকটা আবার যখন তাদের নিতে এল, তখন ছাদের অর্ধেক টালি খোলা হয়ে গেছে। পরের দিনই সম্ভবত টালি খোলার কাজ শেষ হয়ে যাবে, পরশু থেকে কড়িবরগা খোলার কাজ শুরু করে দেওয়া যাবে। তখন করাত আর ছোট শাবলের কাজ।

পুরো এক সপ্তাহ ধরে কাজ চলল। দেখা গেল, একদা মদগর্বী বিশাল বাড়িটির কড়ি-বরগা, তক্তা-কাঠামো, কাঠের বিম—সবই চলে গেছে। জানলার

জায়গায় হাঁ-হাঁ করছে খানিকটা শূন্যস্থান, যেন আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তারা। গোটা বাড়িটা এখন ফাঁপা, খোলা, সারহীন। এই ধরনের কাজের কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে রামলালের আগে পরিচয় ছিল না। তার পেশীতে এখন তীব্র যন্ত্রণা, হাতে বড় বড় ফোস্কা পড়ে গেছে। তবু সে মুখ বুজে কাজ করে যেতে লাগল। টাকাটার এখন ভীষণ প্রয়োজন তার।

সেদিনই গিয়ে একটা টিনের টিফিন বাক্স, এনামেলের একটা মগ, শক্ত একজোড়া বুট, আর একজোড়া ভারী দস্তানা কিনে নিল রামলাল। অন্যরা অবশ্য দস্তানা কেউ পরত না, বছরের পর বছর ধরে কঠিন পরিশ্রম করে করে তাদের হাতগুলো কঠিন হয়ে গিয়েছিল। গোটা সপ্তাহটা ধরেই বিগবিলি ক্যামেরুন ক্রমাগত তার পিছনে লেগে রইল। সবচেয়ে শক্ত কাজগুলো সে রামলালকেই দিত। যেদিন থেকে সে জানতে পারল যে রামলাল উচ্চতাকে ভয় পায়, সেদিন থেকেই সবচেয়ে উ'চুর কাজগুলো রামলালের ঘাড়ে এসেই পড়ত! রামলালের পাঞ্জাবী মন রাগে গমগম করে উঠত, কিন্তু সে রাগের প্রকাশ ঘটত না। টাকাটা তার বড়ই দরকার। কিন্তু শনিবার অবস্থা চরমে গিয়ে পৌঁছল।

কাঠের কাজ আগেই হয়ে গিয়েছিল, তখন চলছিল চুন-বালি-ইট খসানোর কাজ। দেওয়ালগুলো ভেঙে ফেলার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে চারকোণে চারটে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেওয়ালগুলোকে ভেঙে ফেলা। সেক্ষেত্রে নর্দাটাও এর হাত থেকে বাঁচত। কিন্তু ডিনামাইট ব্যবহার করা যাবে না কারণ উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের যেকোন জায়গায় ডিনামাইট ব্যবহার করতে গেলে বিশেষ লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়। আর লাইসেন্স নিলে আবার ট্যাক্সের ঝামেলা এসে পড়বে। তখন ম্যাককুইন আর তার দলের প্রত্যেককে আয়কর তো দিতে হবেই, ম্যাককুইনকে আবার জাতীয় বিমা তহবিলেও টাকা দিতে হবে। তাই নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনেক অসুবিধার মধ্যেই হাতুড়ি মেরে মেরে দেওয়াল ভাঙছিল বিলির লোকেরা। চৌকো এক-একটা টুকরো করে দেওয়াল ভাঙছিল তারা। অভ্যস্ত হাতে হাতুড়ির বাড়িতে একের পর এক দেওয়ালে ধরে যাচ্ছিল ফাটল।

লাঞ্চের সময় ক্যামেরন গোটা বাড়িটা বার দু'য়েক চক্কর দিয়ে শ্রমিকদের কাছে এল। সবাই তখন আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসেছে। পায়ের উপর পা তুলে বসে সে বর্ণনা করতে শুরু করল চারতলার বাইরের দিকের একটা

দেওয়াল কিভাবে ভাঙতে হবে। বর্ণনা শেষ হলে তার চোখ দুটো ঘুরল রামলালের দিকে।

'শোন রামলাল, উপরের ওই কাজটা তুমি করবে', বলল বিলি, 'যখন দেওয়ালটা ভাঙার মুখে আসবে, তখন ওটার গায়ে বাইরের দিকে লাথি মারবে।'

রামলাল মুখ তুলে দেওয়ালটার দিকে দেখল। ইতিমধ্যেই দেওয়ালটার গায়ে নিচের দিক থেকে বড় একটা ফাটল ধরেছে।

'এ দেওয়ালটা যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়ে যাবে', সহজ গলায় বলল রামলাল, 'ওটার উপর বসে ভাঙতে শুরু করলে দেওয়ালটার সঙ্গেই নীচে পড়ে যেতে হবে।'

ক্যামেরন একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রাগে ফুঁসছে সে। চোখ দুটো রাগে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। চিবিয়ে চিবিয়ে সে শুধু বলল, 'আমার কাজ আমাকে বোঝাতে হবে না ; তোমাকে যা বলা হয়েছে তাই কর, বুঝেছো বেজন্মা কেলোর বাচ্চা ?' বলে আর একমুহূর্ত দাঁড়াল না, সোজা মুখ ফুরিয়ে অন্য দিকে হাটতে শুরু করল।

বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল রামলাল। তার গলা থেকে বেরিয়ে এল এক জান্তব চিৎকার, 'মিঃ ক্যামেরন...'

বিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়াল ক্যামেরন। অন্যদের মুখ ততক্ষণে হাঁ হয়ে, গেছে। ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে ক্যামেরনের সামনে দাঁড়াল রামলাল। বলল, 'একটা জিনিষ পরিষ্কার করে বলা দরকার। আমি উত্তর ভারতের পাঞ্জাব থেকে এসেছি। আমরা জাতে ক্ষত্রিয়, পেশায় যোদ্ধা। 'ডাক্তারী পড়ার মত যথেষ্ট টাকা আমার হাতে নেই, তাই কাজ করতে এসেছি। কিন্তু আমার পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে সৈনিক থেকে রাজপুত্র, শাসক থেকে পণ্ডিত সবই ছিল। দু-হাজার বছর আগে আমার পূর্ব-পুরুষ যখন যুদ্ধ করেছে, তখন তোমার পূর্বপুরুষ চামড়ার জামা পরে চার হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিত। তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আমাকে আর কখনও অপমান করার চেষ্টা করবে না।' উচ্চ কণ্ঠে বলা স্পষ্ট কথাগুলো বসে থাকা প্রত্যেককের কানেই পরিষ্কার ভাবে ঢুকল।

ভারতীয় ছাত্রদের দিকে রক্তচক্ষু মেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বিলি ক্যামেরন। অন্য শ্রমিকরা জলছবির মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। বেশ

খানিকক্ষণ পরে খুব শান্ত গলায় ক্যামেরন বলল, 'তাই নাকি? তা তোমার পূর্ব পুরুষ আগে তাহলে যোদ্ধা ছিল? কিন্তু ব্যাপারটা এখন বোধহয় খানিকটা আলাদা তাই না? শালা বেজম্মার বাচ্চা, এবার তুই কি করবি?'

শেষ শব্দটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিলির বিশাল কব্জি এবং চওড়া হাতের তালু শূন্যে একবার ঝলসে উঠে সোজা নেমে এল রামলালের গালে। বেশ কয়েক ফুট দূরে মাটির উপর আছড়ে পড়ল তার শীর্ণ শরীরটা। মাথাটা ঝনঝন করে উঠল তাঁর। কানে এল টমি বার্ণ'স চেঁচিয়ে বলছে, 'শুয়ে থাক রামলাল। উঠার চেষ্টা কোরো না। উঠলে বিগ বিলি তোমাকে মেরে ফেলবে।'

মাথার উপরে সূর্য-তখন প্রখর আলো ছড়াচ্ছে। কোন মতে চোখ দুটো মেলল রামলাল। ঠিক তার শরীরের উপরেই দু'পা ফাঁক করে ঘুষি পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিগ বিলি। রামলাল জানে বিশালদেহী এই দৈত্যের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে নেমে কোন লাভ নেই। লজ্জা এবং পরাজয়ের এক তীব্র অনুভূতি তৎক্ষণে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এক সময়ে তাঁর পূর্ব-পুরুষরা ঘোড়ার পিঠে চেপে, বল্লম আর তরোয়াল হাতে নিয়ে এই ছ'টা কাউন্টির থেকে অন্তত একশ গুণ বড় সব দেশ জয় করে ফিরেছে। আর তাঁদের বংশধর হয়ে আজ তার এই অবস্থা।

চোখ বুজে স্থির হয়ে শুয়ে রইল রামলাল। বেশ কয়েক সেকেন্ড পরে তার কানে এল বিগ বিলির পদশব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। কানে ভেসে আসছে বসে থাকা লোকগুলোর গুঞ্জন। লজ্জায় চোখে জল এসে গেছে রামলালের। বহু কষ্টে চোখের পাতা দুটো শক্ত করে আটকে রেখে জল সামলাল রামলাল। অন্ধকারের মধ্যে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল পাঞ্জাবের সমতল ভূমি আর সেখানকার নির্ভীক বাসিন্দাদের প্রতিচ্ছবি। গর্বিত, দুঃসাহসী. দীর্ঘনাসা মানুষগুলোর গালে ঘনকৃষ্ণ দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। পঞ্চনদের দেশের দুঃসাহসী যোদ্ধার জাত এই পাঞ্জাবীরা। বহুদিন আগে, বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম পর্বে ম্যাসিডনের আলেকজাণ্ডার দি-গ্রেট এই সমতল ভূমি পেরিয়েই ভারতে ঢুকেছিলেন। চোখে তখন তাঁর দিগ্বিজয়ের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। মানুষের কাছে তখন আলেকজাণ্ডার দেবতার প্রতিভূ। মাত্র পঁচিশ বছর বয়েসে তিনি বিলাপ করেছিলেন সে পৃথিবীতে জয় করার মত জায়গা আর তাঁর সামনে নেই। আজকের পাঞ্জাবের বহু যোদ্ধা আলেকজাণ্ডারের

সেনাপতিদের বংশধর। হরকিষেণ রামলালের পূর্ব-পুরুষও তাই।

অন্যান্য শ্রমিকেরা যখন উঠে দাঁড়িয়ে যে যার কাজে যেতে শুরু করল, রামলাল তখনও ধুলোয় শুয়ে আছে। যাবার পথে সবাই মুখ নামিয়ে তাকে একবার করে দেখে গেল। তাদের সবার মুখেই একই নিঃশব্দ অভিব্যক্তি ফুটে উঠছিল—প্রতিহিংসা নাও। পিছিয়ে যেও না।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রামলাল। যা হবার হয়ে গেছে। এখন যা করার করতে হবে। এটাই তাদের জাতির নিয়ম। সেদিন সারাদিন চুপচাপ তার কাজ করে গেল সে। সেও কারুর সঙ্গে কথা বলল না। তার সঙ্গেও কেউ কথা বলল না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে রামলাল যখন তার প্রস্তুতি শুরু করল, তখন চারধারে রাত নেমে এসেছে। ভাঙা চোরা ড্রেসিং টেবিলটার উপর থেকে টুথ-ব্রাশ, চিরুনির মত টুকুটাকি জিনিষগুলো সরিয়ে ফেলল সে। ধুলো পড়া আয়নাটাও স্ট্যাণ্ড থেকে খুলে ফেলল। তারপর বাক্সের মধ্যে সযত্নে রাখা হিন্দু দেবদেবীর উপর লেখা বইখানি বের করে তা থেকে মা আদ্যাশক্তির একটা ছবি কেটে নিল। পাতা জোড়া ছবিটাকে ড্রেসিং টেবিলের পিছনের দেওয়ালে পেরেক দিয়ে আটকিয়ে জায়গাটাকে একটা মন্দির মন্দির চেহারা দিল সে।

কাজ থেকে ফেরার পথে মেন স্টেশনের সামনে থেকে একগুচ্ছ ফুল কিনে এনে-ছিল রামলাল। এবার সেগুলো দিয়ে একটা মালা গেঁথে ফেলল। দেবী আদ্যা-শক্তি শক্তি আর ন্যায়ের দেবী, তাকে তুষ্ট করতে গেলে পুষ্পমাল্য অতি প্রয়োজন। ছবিটার একপাশে একটা ছোট বাটি অর্ধেক বালি ভর্তি করে রাখল। তারপর সেই বাটির মধ্যে একটা মোমবাতি গুঁজে দিয়ে সেটা দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। সুটকেস্ থেকে বের করে নিল এক খণ্ড বড় কাপড়, তা থেকে বেরল একডজন ধূপকাঠি। বইয়ের র‍্যাক থেকে সস্তার সরু ধূপদানি নিয়ে তার মধ্যে ধূপকাঠি গুঁজে সেগুলোও জ্বালিয়ে দিল। একটা মিষ্টি, আবেশী সুগন্ধে ভরে উঠল গোটা ঘরটা। বাইরে তখন উত্তাল সমুদ্রে হাজার হাজার বজ্রপাতের শব্দে ঢেউ ভেঙে চলেছে।

পুজার উপাচার সম্পূর্ণ হবার পর রমলাল মাথা নীচু করে, মালা হাতে নিয়ে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে প্রার্থনা শুরু করল। সে পথের নির্দেশ চায়। ব্যাঙ্গরের আকাশে ঠিক তখনই ঝলসে উঠল প্রথম বিদ্যুৎ। আধুনিক

পাঞ্জাবী নয়, রামলাল মন্ত্রচারণ করিছল পুরানো সংস্কৃতে। বিড়বিড় করে বলা তার মন্ত্র থেকে শুধু শোনা যাচ্ছিল, 'দেবী শক্তি···মা···হে মা···।'

বাইরে আবার বাজ পড়ল। শোনা গেল বৃষ্টির শব্দও হাতের মালাটা নিয়ে দেবী শক্তির ছবির সামনে রেখে দিল রামলাল। নীচু স্বরে বলল, 'মা, আমার বিরুদ্ধে দারুণ অন্যায় করা হয়েছে। আমার সম্মান নষ্ট হয়েছে। আমি অন্যায়কারীকে শাস্তি দিতে চাই। আমি প্রতিহিংসা নিতে চাই মা···।' পাশে পড়ে থাকা বাকি ফুলগুলো তুলে ছবির সামনে রেখে দিল : স।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে প্রার্থনা করল রামলাল। বাইরে তখন ছাদের উপর বৃষ্টির দাপাদাপি চলছে। পিছনে জানলা বেয়েও অঝর ধারে ঝরে চলেছে জল। অবশেষে তাঁর প্রার্থনা যখন থামল, বাইরে তখন ঝড়ের মত্ততাও খানিকটা কমেছে। রামলাল শুধু জানতে চায় প্রতিহিংসার মাধ্যমটা কি হবে। তার দৃঢ় ধারণা দেবী তাকে কোন না কোন সংকেত পাঠাবেনই।

প্রার্থনা যখন শেষ হল তখন ধূপকাঠিগুলি জ্বলেজ্বলে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের মাদকতাময় গন্ধ। মোম-বাতিটাও প্রায় নিভুনিভু হয়ে এসেছে। ফুলগুলো ময়লা ড্রেসিং টেবিলটার উপর ছবির সামনে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। দেবী শক্তি অ-চঞ্চলভাবে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে জানলার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল রামলাল। বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু জানলার পিছনে কাঁচ বেয়ে তখনও জল পড়ছে। রামলালের চোখের সামনেই বেশ খানিকটা বৃষ্টির জল উপর থেকে তাঁর জানলায় পড়ল, পরে গড়িয়ে গেল খানিকটা, জানলার ভিতরের কাঁচে ধুলো ভর্তি, তাই সোজা না গড়িয়ে ধুলোর মধ্যে পথ কেটে এঁকেবেঁকে গড়িয়ে গেল জলধারা। একাগ্র দৃষ্টিতে কাঁচে জলের ধারার এই পথ কাটা দেখতে লাগল রামলাল। জানলার এক কোণে এসে সে ধারা যখন থেমে গেল তখন রামলালের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ঘরের এককোণে, যেখানে দেওয়ালের গায়ে সাটা পেরেক থেকে তার ড্রেসিং গাউনটা ঝুলছে।

সে লক্ষ্য করল ঝড়ের সময় ড্রেসিং গাউনেরএকটা দড়ি খুলে গিয়ে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে। দড়িটা পাকিয়ে গেছে, ফলে একদিকের গিঁট দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে, অন্য দিকেরটা চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। একডজন ফিতের মধ্যে দেখা যাচ্ছে মাত্র দুটো, দূর দেখে মনে হচ্ছে চেরা জিভ। ঘরের কোণে

পড়ে থাকা ড্রেসিং গাউনের দড়িটার সঙ্গে গুটিয়ে থাকা সাপের এক অদ্ভুত মিল। রামলালের উপলব্ধি উন্মোচিত হল। পরের দিনই বেলফাস্টের ট্রেন ধরে সে দেখা করতে গেল এক শিখের সঙ্গে।

রঞ্জিত সিংহ ডাক্তারীর ছাত্র, তবে রামলালের মত দুর্ভাগা নয়। তার বাবা-মা যথেষ্ট ধনী, তারা মাসেমাসে তাকে মোট টাকা পাঠান। হস্টেলে তার ঘরটাও বেশ সাজানো গোছানো। সেখানেই তার সঙ্গে রামলালের দেখা হল।

'আমাকে বাড়ি যেতে হবে। বাড়ি থেকে খবর এসেছে বাবা মৃত্যু শয্যায়', বলল রামলাল।

'খুবই দুঃখের খবর' বলল রঞ্জিত সিংহ, 'শুনে আমারও খারাপ লাগছে। আমি তোমার পাশে আছি।'

রামলাল আবার বলল, 'বাবা আমাকে দেখতে চান। আমি তার প্রথম সন্তান। তাই আমাকে যেতে হবে।'

'তাতো বটেই', বলল রঞ্জিত সিংহ। তাদের দেশের নিয়ম মৃত্যুর সময় বাবার শয্যার পাশে বড় ছেলেকে অবশ্যই থাকতে হয়।

'সমস্যাটা হল বিমান ভাড়ার 'বলল রামলাল, 'আমি অবশ্য এখন একটা কাজ করছি, টাকা-পয়সাও মোটামুটি ভালই পাচ্ছি। কিন্তু অত টাকা আমার নেই। তুমি যদি কিছু টাকা আমাকে দাও, আমি ফিরে এসে তোমার টাকা শোধ করে দেব। কাজটা ছাড়ছি না, ফিরে এসেও করব।'

সুদের হার যদি ভাল থাকে আর ফেরত পাওয়াটা যদি নিশ্চিত হয়, তাহলে টাকা ধার দেওয়াটা শিখেদের কাছে নতুন কিছু নয়। রঞ্জিত সিংহ প্রতিশ্রুতি দিল সোমবার সকালেই সে টাকা ব্যাংক থেকে তুলে রাখবে।

সে রবিবার সন্ধ্যাবেলায় রামলাল গ্রুমস্পোর্ট-এ ম্যাককুইনের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করল। ম্যাককুইন তখন আরাম করে বিয়ার খেতে খেতে টিভি দেখছিল। রবিবার সন্ধ্যাটা সাধারণত সে এভাবেই কাটায়। তার স্ত্রী রামলালকে সেই ঘরে নিয়ে আসার পর ম্যাককুইন টিভিটা বন্ধ করে দিল।

'বাড়ি থেকে খবর এসেছে বাবা মৃত্যু শয্যায়', বলল রামলাল।

'খুবই দুঃখের খবর', বলল ম্যাককুইন।

'আমার বাড়ি যাওয়া খুবই দরকার। আমাদের দেশে বাবার মৃত্যু শয্যার পাশে বড় ছেলেকে থাকতে হয়। এটাই আমাদের দেশের নিয়ম।' বলল

রামলাল।

ম্যাককুইনের বড় ছেলে কানাডায় থাকে। সাত বছর তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। সে শুধু বলল, 'ঠিকই তো। সেটাই তো করা উচিৎ।'

'বাড়ি ফেরার বিমান ভাড়ার টাকাটা আমি জোগাড় করেছি। অবশ্য ধার করে', বলল রামলাল, 'যদি কালকে যেতে পারি, তাহলে আশা করছি সপ্তাহ খানিকের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব। কিন্তু কথাটা হল, চাকরিটা বজায় থাকা আমার পক্ষে এখনই সবচেয়ে দরকার মিস্টার ম্যাককুইন। ধার শোধ করতে হবে, সামনে পরীক্ষারও খরচ আছে। আমি যদি এখন গিয়ে সপ্তাহ খানিকের মধ্যে ফিরে আসতে পারি, আপনি আমাকে চাকরীতে বহাল রাখবেন তো?'

'ঠিক আছে', বলল ম্যাককুইন, 'তবে এই সময়টা কোন টাকা আমি তোমায় দেব না। যদি তুমি সপ্তাহ খানিকের মধ্যে ফিরে আসতে পার তাহলে তোমার চাকরী থাকবে তা নাহলে আমি অন্য লোক নিয়ে নেব। মাইনে কিন্তু একই থাকবে ঠিক আছে?'

'ধন্যবাদ', বলল রামলাল, 'আপনার দয়া আমার মনে থাকবে।'

রেলওয়ে ভিউ স্ট্রীটে নিজের ঘরটা রামলাল ছাড়ল না, তবে সেদিন রাতটা সে বেলফাস্টে তার হোস্টেলে কাটাল। সোমবার সকালে রঞ্জিত সিংহের সঙ্গে সেও ব্যাংকে গেল। টাকাটা তুলে রঞ্জিত সিংহ তার হাতে দিতেই রামলাল একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে গেল অলডারগ্রোভ এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে স্থানীয় বিমানে লণ্ডন বিমান বন্দরে গিয়ে ভারতে যাবার পরবর্তী বিমানের একটা সাধারণ যাত্রী টিকিট কাটল। ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা বাদে তার বিমান যখন বোম্বাইয়ের মাটি ছুঁল, তখন সেখানে প্রচণ্ড গরম।

বুধবার দিন গ্র্যান্ট রোড ব্রীজের বাজারে রামলাল তার ঈপ্সিত বস্তুটির সন্ধান পেয়ে গেল। দোকানটা মিঃ চাটার্জী বলে এক ভদ্রলোকের, মাছ এবং সরীসৃপ জাতীয় জিনিষ বিক্রি হয় এখান থেকে। বুধবার দোকান যখন প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে, ঠিক তখনি বগলে সরীসৃপ সংক্রান্ত টেক্সটবইটা নিয়ে দোকানে ঢুকল যুবক ছাত্রটি। আধো-অন্ধকারে দোকানের পিছন দিকে বৃদ্ধ মালিক বসে। তার চারধার ঘিরে রয়েছে অজস্র মাছ। আর কাঁচ দিয়ে ঘেরা বাক্স-গুলোর মধ্যে সাজানো রয়েছে সাপ আর গোসাপ। প্রচণ্ড গরমে সেগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে।

শিক্ষাজগতের সঙ্গে মিঃ চ্যাটার্জি'র ভালোমতই পরিচয় রয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ব্যবচ্ছেদের জন্য তিনি বহু চিকিৎসা শিক্ষাকেন্দ্রে মাছ ও সরীসৃপের নমুনা পাঠিয়েছেন। এমনকি কখনো কখনো বিদেশেও দামি অর্ডার সরবরাহ করেন তিনি। রামলাল যখন তাঁকে ব্যাখ্যা করে বোঝাল যে সে কী চায়, তখন তাঁর সাদা দাড়িওলা মাথাটা বোঝার ভঙ্গিতে দুলে উঠল।

'ও, আচ্ছা' বললেন বৃদ্ধ বাঙালি ব্যবসায়ী, 'হ্যাঁ, এধরনের সাপ আমি চিনি। আপনার কপাল ভাল। আমার কাছে একটাই আছে। মাত্র দিনকয়েক আগে রাজপুতানা থেকে এসেছে।'

রামলালকে তিনি ভিতরে তাঁর ব্যক্তিগত চেম্বারে নিয়ে গেলেন। একটা গ্লাসকেসের মধ্যে সাপের নতুন ঘর। দু'জনেই একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

টেক্সট বইয়ে সাপটার নাম লেখা আছে 'এখিস ক্যারিনেটাস।' বইটা এক ইংরেজের লেখা, স্বভাবতই তিনি ল্যাটিন নাম অনুসরণ করেছেন। ইংরেজিতে বলে 'স' স্কেল্‌ড ভাইপার। ভয়ানক বিষধর। আকারে খুবই ছোট, সবচেয়ে ছোট বলা যায়। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ংকর। ছোবলে মৃত্যু অবধারিত।

বইতে লেখা আছে, সাধারণত পশ্চিম আফ্রিকার পূর্বদিকে, ইরানের উত্তরাংশে, ভারতে এবং পাকিস্তানে এই সাপ পাওয়া যায়। খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা এদের প্রচণ্ড ; যে কোন পরিবেশে এরা মানিয়ে নিতে পারে ; যে পশ্চিম আফ্রিকার স্যাঁতসেতে জঙ্গলই হোক, আর ইরানের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পাহাড়ি অঞ্চলই হোক, কিংবা ভারতের গরমে ভাজাভাজা হওয়া পাহাড়ই হোক।

গ্লাসকেসের মধ্যে পাতা ভর্তি। তার তলায় কী যেন একটা নড়ে উঠল।

বইতে বলা আছে, এরা লম্বায় ৯ ইঞ্চি থেকে ১৩ ইঞ্চি হয়। ভীষণ সরু। গায়ের রং ঘন বাদামী, মধ্যে মধ্যে হাল্কা ছোপ রয়েছে। অবশ্য সে ছোপ প্রায় বোঝাই যায় না। এছাড়াও শরীরের পাশের দিকে আঁকাবাঁকা একটা কালো রেখা চলে যায়।

গরমকালে, শুকনো আবহাওয়ায় এরা রাত্রে বেরোয়, দিনের বেলা প্রচণ্ড গরমে সাধারণত কোন আশ্রয় খুঁজে নেয়।

গ্লাসকেসের মধ্যে পাতা আবার নড়ে উঠল। পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল একটা ছোট্ট মাথা।

বইতে বলা আছে, এদের নিয়ে কাজ করা অতি বিপজ্জনক। কেউটে অবশ্য

আরো বিখ্যাত, কিন্তু এদের কামড়ে আরো বেশি মৃত্যু হয়। আসলে এদের আকৃতি এত ছোট, যে মানুষের হাত-পা অজান্তেই এদের ছুঁয়ে যায়, কামড়ও খায়। বইয়ের লেখক নিচে একটা ফুটনোটে লিখেছেন, কিপলিং তাঁর অসাধারণ গল্প 'রিকি-টিকি-ট্যাভি'-তে যে ছোট্ট অথচ বিষধর সাপটির কথা বলেছেন, তা সম্ভবত স' স্কেলড ভাইপার। গল্পে গোখরো বলা হয়েছে, কিন্তু গোখরো কম করেও দু'ফুট লম্বা হয়। বোঝাই যাচ্ছে, কিপলিং-এর ভুল ধরতে পেরে লেখক খুবই খুশি হয়েছেন।

গ্লাসকেসের ভিতরে, পাতার নিচে ছোট্ট একটা কালো চেরা জিভ দুই ভারতীয়দের দিকে ঝলসে উঠল।

এথিস ক্যারিনেটাসের উপর লেখা অধ্যায়টি ইংরেজ প্রকৃতিবিশারদ শেষ করেছেন এই বলে যে এরা অত্যন্ত সতর্ক এবং সহজেই ক্ষুব্ধ হয়। কোন বিপদসংকেত না দিয়ে এরা বিদ্যুৎগতিতে ছোবল মারে। বিষদাঁত এত ছোট যে কামড়ালে কেবলমাত্র দু'টো ছোট ছোট ফুটো হয়, অনেকটা পায়ে বা হাতে কাঁটা ফুটলে যেমন হয়। কোন যন্ত্রণা হয় না। কিন্তু মৃত্যু একেবারে নিশ্চিত। সাধারণত দুই থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু আসে। এটা নির্ভর করে যাকে কামড়ানো হয়েছে তার দেহের ওজনের উপর এবং কামড়ানোর সময়ে বা পরে তার শারীরিক পরিশ্রম কতটা হয়েছে, তার উপর। তবে মৃত্যুর কারণ সবসময় একটাই—মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ।

'এটার জন্য আপনি দাম কত চান?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রামলাল।

বৃদ্ধ দোকানদার অসহায়ের ভঙ্গীতে হাত নাড়লেন। দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'বুঝতেই পারছেন, দুর্লভ জিনিস। এমন নমুনা সহজে পাওয়া যায় না। খুব কম আসে, পাঁচশো টাকা লাগবে।'

অনেক দরাদরি করার পর সাড়ে তিনশ' টাকায় শেষপর্যন্ত রফা করল রামলাল। সাপটা কিনে একটা জারে পুরে চলে গেল সে।

লণ্ডনে ফেরার পথে রামলাল এক বাক্স সিগার কিনল। তারপর সিগার-গুলো ফেলে দিয়ে খালি করে ফেলল বাক্সটা। বাক্সটার মুখে খুব ছোট ছোট কুড়িটা ফুটো করল, যাতে ভিতরে আলো-বাতাস খেলতে পারে। সে জানে, ছোট্ট সাপটা এক সপ্তাহ না খেয়ে থাকতে পারে, জল না খেয়ে থাকতে পারে দু'-তিন দিন। খুব অল্প বাতাসেও এরা অনায়াসে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে

পারে। সিগারের বাক্সটাকে বেশ ভাল করে তোয়ালে দিয়ে মুড়ে স্যুটকেসে পুরল রামলাম। ভিতরে রয়েছে কালান্তক সাপ। তোয়ালেগুলো মোটা মোটা, স্পঞ্জের মত। তার ভিতরে যেটুকু বাতাস থাকবে, তাই দিয়ে অনায়াসে শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারবে সাপটা।

বোম্বাইতে রামলাল যখন নেমেছিল, তখন তার হাতে ছিল কেবল একটা হ্যাণ্ডব্যাগ। কিন্তু যাবার সময় সে বাজার থেকে সস্তায় একটা ফাইবারের স্যুটকেস কিনে নিল। তারপর বাজার থেকে কাপড় কিনে ভাল করে মুড়ল স্যুটকেসটা। সিগারের বাক্সটা রইল ঠিক মাঝখানে। হোটেল থেকে বোম্বাই বিমানবন্দর রওনা দেবার ঠিক আগে স্যুটকেসের ডালা বন্ধ করে তালা দিল। লণ্ডন ফেরার সময় বোয়িং বিমানটার খোলে রেখে দিল সেটা। নিয়মমাফিক-ভাবে সার্চ হল স্যুটকেসটা, কিন্তু তেমন কিছুই পাওয়া গেল না।

শুক্রবার সকালে লণ্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানটা নামল। সামনেই ব্রিটেনে ঢোকার প্রত্যাশী ভারতীয়দের লম্বা লাইন। রামলাল কর্তৃপক্ষকে জানাল যে সে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র, দেশ ছেড়ে আসেনি। এতে কাজ হল, তাড়াতাড়ি সব ঝামেলা চুকিয়ে ঢুকে পড়ল। মাল-পত্রের কাছে এসে দেখল সবে কনভেয়র বেল্ট বেয়ে স্যুটকেস আসা শুরু হয়েছে। প্রথম দু' ডজনের মধ্যেই নিজেরটা পেয়ে গেল রামলাল। স্যুটকেসটা নিয়ে ঢুকে পড়ল বাথরুমে। সেখানে স্যুটকেসটা খুলে ভিতর থেকে সিগারের বাক্সটা বের করে নিয়ে হাতের ছোট ব্যাগটায় পুরে নিল।

বেরোনোর মুখে আবার বাধা। ঘোষণা করতে হবে কী কী আছে। রামলালের কিছুই নেই, তবু তার স্যুটকেসটা তছনছ করে খোঁজা হল। শুল্ক অফিসারটি রামলালের হাতের ব্যাগের দিকেও আড়চোখে একবার তাকালেন, তবে সেটা আর সার্চ করলেন না। রামলাল বেরোনোর অনুমতি পেল। একটা বাস ধরে চলে গেল বেলফাস্টের বাস টার্মিনাসে। সেখান থেকে বেলফাস্টের দুপুরের বাস ধরল। ঠিক বিকেলের সময় পেঁীছে গেল ব্যাঙ্গরে। এতক্ষণে সে তার সওদা ভাল করে দেখার সময় পেল।

বিছানার পাশে রাখা টেবিলটা থেকে একটা কাচের বড় চৌকো টুকরো নিয়ে অতি সন্তর্পণে সিগার বাক্সের ঢাকনা আর ভিতরের বিষধর বাসিন্দার মাঝে চাপা দিল রামলাল। কাচের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট দেখা গেল ভাইপারটা ভিতরে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে। হঠাৎই থেমে গিয়ে কালো কালো রাগত চোখ-

দুটো দিয়ে একদৃষ্টে সেটা তাকিয়ে রইল রামলালের দিকে। দ্রুত কাচটা টেনে নিয়ে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল রামলাল। ফিসফিস করে বলল, 'ঘুমোও, বন্ধু, ঘুমোও। যদি সত্যিই ঘুম পায়, ঘুমোও। মা আদ্যাশক্তির আদেশ, কাল সকালেই তুমি তাঁর ইচ্ছে পূরণ করবে।'

সন্ধ্যা নামার আগে রামলাল বাজার থেকে একটা ছোট কফির জার কিনে এনে ভিতরের কফিটা ঘরের একটা চীনেমাটির পাত্রে ঢেলে ফেলল। পরদিন সকালে হাতে ভারি গ্লাভসটা পরে নিয়ে ভাইপারটাকে সিগারের বাক্স থেকে কফির জারে চালান করে দিল। ক্ষিপ্ত সাপটা একবার তার হাতে কামড়েও দিল, তবে গ্লাভস থাকায় ক্ষতি হল না। এমনিতেও অসুবিধা নেই, কারণ দুপুরের মধ্যেই সাপটার বিষের থলি আবার ভরে উঠবে। কাচের কফি জারের মধ্যে গুটিয়ে, কুঁকড়ে পড়ে থাকা সাপটার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল রামলাল। তারপর ঢাকনাটা ভালো করে মোচড় দিয়ে আটকিয়ে বড় টিফিন বাক্সটার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল। চটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে গেল কাজে জন্য ট্রাক ধরতে।

কাজের জায়গায় পৌঁছনো মাত্রই গায়ের জ্যাকেট খুলে ফেলাটা বিগ বিলি ক্যামেরনের বরাবরের অভ্যাস। জ্যাকেটটা খুলে সাধারণত কাছাকাছি কোন পেরেক বা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। রামলাল লক্ষ্য করে দেখেছে, লাঞ্চ ব্রেকের সময় খাওয়া-দাওয়ার পর দৈত্যাকার ফোরম্যানটি জ্যাকেটের কাছে গিয়ে ডানদিকের পকেট থেকে তার পাইপ এবং তামাকের প্যাকেট বের করে। এর কোন অন্যথা হয় না। এক রুটিন বরাবর চলে আসছে। বেশ মৌজ করে পাইপটা টেনে পাইপের ভিতরের পোড়া তামাকটা ফেলে খানিক বাদে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'চলো কাজে লাগা যাক।' কাজে যাবার আগে আবার পাইপটা জ্যাকেটের পকেটে পুরে দিয়ে যায়। নিয়ম হচ্ছে, সে পাইপটা পকেটে রেখে ঘোরার আগেই প্রতিটি শ্রমিককে উঠে দাঁড়াতে হবে।

রামলালের পরিকল্পনা খুব সহজ, কিন্তু নিশ্চিত। সকালেই কোন এক সময় সে সাপটাকে ঝুলন্ত জ্যাকেটের ডানদিকের পকেটে ঢুকিয়ে দেবে। লাঞ্চ ব্রেকের সময় ক্যামেরন স্যাণ্ডউইচ শেষ করে জ্যাকেটের কাছে গিয়ে ডানদিকের পকেটে হাত ঢোকাবেই। সাপটা তখন তার কাজ করবে। করবেই, দেবী আদ্যাশক্তির আদেশ। এই কাজ করার জন্যই তো তাকে অর্ধেক পৃথিবী উড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। বিগ বিলির জল্লাদ হবে সাপটাই, রামলাল নয়। এটাই দেবীর নির্দেশ।

কল্পনায় রামলাল গোটা খুনটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। একটা বিশ্রি গালাগাল দিয়ে ক্যামেরন জ্যাকেটের পকেট থেকে হাতটা টেনে বের করে নিল। আঙুল থেকে ঝুলছে ছোট্ট সাপটা, তার বিষদাঁত ঢুকে গেছে আঙুলের মাংসের গভীরে। রামলাল তখন লাফিয়ে উঠে টেনে সাপটাকে ছাড়িয়ে নেবে। তারপর সেটাকে মাটিতে আছাড় মেরে মাথাটা পা দিয়ে পিষে দেবে। অসুবিধা কিছু হবে না, কারণ সেই মুহূর্তে সাপটা বিষহীন থাকবে, কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা তার আর থাকবে না। শেষপর্যন্ত, প্রচণ্ড রাগ ও হতাশায় ভান করে সে মৃত সাপটাকে কুম্বার নদীর গভীরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ব্যস্, ধুয়েমুছে যাবে সব প্রমাণ। হয়তো কেউ কেউ সন্দেহ করতে পারে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। প্রমাণের আর কোন অবকাশ থাকবে না।

সেদিন বেলা এগারোটা নাগাদ হরিকিষেণ রামলাল হঠাৎ জানাল তার একটা নতুন হাতুড়ি দরকার, পুরনোটায় আর কাজ চলছে না। বাইরে বেরিয়ে এসে রামলাল টিফিন বাক্সটা খুলে কফির জারটা বের করল। তারপর জ্যাকেটের কাছে গিয়ে জারের ঢাকনাটা খুলে সাপটাকে ফেলে দিল ঝুলন্ত জ্যাকেটের ডানদিকের পকেটে। কাজ সেরে নিজের কাজের জায়গায় ফিরে এল মিনিট-খানেকের মধ্যেই। কেউ তাকে লক্ষ্য করল না।

লাঞ্চের সময় রামলালের গলা দিয়ে আর খাবার নামছে না। অন্য দিনের মতই শ্রমিকরা সব আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে। আগুনের মধ্যে দেওয়া পুরনো শুকনো কাঠগুলো ফট্‌ফট্ করে ফাটছে, ওপরে জল ফুটছে বড় ক্যানটায়। রোজকার মতই লোকগুলো নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টায় মশগুল। এক জায়গায় বসে আপন মনে পাহাড় প্রমাণ স্যান্ডউইচ চিবিয়ে চলেছে বিগ বিলি ক্যামেরন। তার বৌ বাড়ি থেকে রোজ খাবার তৈরি করে পাঠিয়ে দেয়। রামলাল বেছে বেছে এমন একটা জায়গায় বসেছে যেখান থেকে জ্যাকেটটা স্পষ্ট দেখা যায়। খেতে ইচ্ছে করছে না, তবু জোর করে খেতে লাগল। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ধক্‌ধক্ আওয়াজ বাইরে থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে উত্তেজনা আর বাগ মানতে চাইছে না।

খাওয়া শেষ করে বিগ বিলি স্যান্ডউইচ মোড়া কাগজটা আগুনে ছুঁড়ে ফেলে মুখ ধুয়ে নিল। তারপর মুখে একটা তৃপ্তির আওয়াজ করে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল জ্যাকেটের দিকে। রামলালের চোখ আর সেদিক থেকে সরছে না। অন্যরা কিন্তু কেউ কিছুই লক্ষ্য করল না। জ্যাকেটের

কাছে গিয়ে বিলি ক্যামেরন সোজা হাত ঢুকিয়ে দিল ডানদিকের পকেটে। দম বন্ধ করে রয়েছে রামলাল। বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে ক্যামেরন হাত পকেটটা হাতড়াল। যখন বেরিয়ে এল তখন হাতে উঠে এসেছে পাইপ আর তামাকের প্যাকেট। পাইপে ঠেসে তামাক ভরতে ভরতেই ক্যামেরনের নজরে এল রামলাল একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। গম্ভীর গলায় সে প্রশ্ন করল, 'কি দেখছ হাঁ করে তাকিয়ে?'

'কিছু না', বলল রামলাল। মুখটা ফিরিয়ে নিল আগুনের দিকে। কিন্তু স্থির হয়ে বসে থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা টানটান করতে শুরু করল। কোমর ঘুরিয়ে খিল ছাড়ানোর সময় হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে সে নজর করল, ক্যামেরন আবার তামাকের প্যাকেট রাখার জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। প্যাকেটটা রেখে আবার যখন হাতটা বের করল, তখন দেখা গেল হাতে রয়েছে দেশলাই। পাইপটা দেশলাই জেবলে ধরিয়ে বেশ মেজাজে টানতে শুরু করল ফোরম্যান। তারপর ধীর পদে হেঁটে ফিরে এল আগুনের কাছে।

নিজের জায়গায় ফিরে এসে চুপচাপ বসে পড়ল রামলাল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আগুনের জ্বলন্ত শিখার দিকে। দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। মনে প্রশ্ন, কেন এমন হল? নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল, কেন দেবী আদ্যাশক্তি তার সঙ্গে এমন করলেন? এই কালসর্প তো তাঁরই অস্ত্র। নিজে আদেশ দিয়ে তিনি এই অস্ত্র আনিয়েছেন। তাহলে সে অস্ত্র প্রয়োগ করার সময় হঠাৎ তা সংবরণ করলেন কেন? নিজেই প্রতিহিংসার পথ দেখিয়ে আবার নিজেই তা ফিরিয়ে নিলেন কোন সুবাদে? মুখটা ঘুরিয়ে চুপিচুপি আর একবার তাকিয়ে নিল জ্যাকেটের দিকে। যেখানে পকেটটা সেলাই করা হয়েছে, তার লাইনিং-এর কোণায় একেবারে বাঁদিক ঘেঁষে কী যেন একটা নড়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই সব স্থির। গভীর দুঃখে চোখ বন্ধ করে ফেলল রামলাল। ভুল হয়েছে, মারাত্মক ভুল হয়েছে। লাইনিং-য়ে একটা ছোট্ট গর্ত আছে। এটা সে জানতই না। ছোট্ট ওই গর্তটা তার সব প্ল্যান ভেস্তে দিয়ে গেল। সর্বনাশ করে দিয়ে গেল তার। সেদিন গোটা বিকেলটা কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কাজ করে গেল রামলাল। মন প্রচণ্ড সংশয়ে অস্থির, সিদ্ধান্ত-হীনতায় ছিন্নভিন্ন। কী করবে কিছুই জানা নেই তার।

ট্রাকে করে ব্যাঙ্করে ফেরার সময় বিগ বিলি যথারীতি ট্রাকের সামনে তার

সিটে গিয়ে বসল। সামনে প্রচণ্ড গরম। তাই জ্যাকেটটা গা থেকে খুলে ফেলে ভাঁজ করে হাঁটুর উপর রেখে দিল। ট্রাকটা স্টেশনে এসে পেঁছনোর পর রামলাল দেখল, বিগ বিলি জ্যাকেটটা ভাঁজ করা অবস্থাতেই তার গাড়ির পিছনের সিটে রেখে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। একটু দূরেই টমি বার্নস বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। দ্রুত পা চালিয়ে তাকে ধরে ফেলল রামলাল।

'আচ্ছা একটা কথা', বলল রামলাল 'মিঃ ক্যামেরনের কি পরিবার রয়েছে, মানে, নিজস্ব সংসার রয়েছে ?'

'হ্যাঁ, তা তো আছেই', সহজ গলায় বলল বার্নস, 'বৌ আছে, দুটো বাচ্চাও আছে।'

'ওদের বাড়িটা এখান থেকে কতদূর ?' জিজ্ঞেস করল রামলাল, 'গাড়ি করে আসেন, কাজেই কিছুটা দূর তো হবেই।'

'খুব দূরে নয়', বলল বার্নস, 'যতদূর জানি গ্যানাওয়ে গার্ডেনসে কিলকুলে এস্টেটে ওদের বাড়ি। কেন, দেখা করতে যাবে ?'

'আরে না, না', বলে উঠল রামলাল, 'ঠিক আছে, সোমবার দেখা হবে।'

ঘরে ফিরে এল রামলাল। ঘরের দেওয়ালে দেবী উদাসীন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছেন। তিনি ন্যায়ের দেবী' সত্যের দেবী। একদৃষ্টে সেই ছবির দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলে চলল রামলাল, 'মা, আমি বিগ বিলিকে মারতে চেয়েছি প্রতিহিংসা নেবার জন্য। কিন্তু তা বলে ওর স্ত্রী-সন্তানদের মারতে চাইনি। ওরা নির্দোষ। ওরা আমার কোন ক্ষতি করেনি। ওদের যেন কিছু না হয়।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল দেবী মূর্তি। কোন উত্তর এল না।

সপ্তাহ শেষের দুটি চূড়ান্ত উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটল রামলালের। মনে মনে এক তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছে সে। অবশেষে আর থাকতে না পেরে শনিবার সন্ধ্যাবেলা হেঁটে হেঁটে সে গিয়ে হাজির হল রিং রোডের উপর কিলকুলে হাউসিং এস্টেটে। খুঁজে খুঁজে গ্যানাওয়ে গার্ডেনসও বার করল। আওয়েনরো গার্ডেনের পরেই ওবার্ণ ওয়াক-এর উল্টোদিকে গ্যানাওয়ে গার্ডেনস। ওবার্ণ ওয়াক-এর এক কোণে একটা টেলিফোন বুথ রয়েছে। সেখানেই ফোন করার ভান করে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দিল। কিন্তু চোখ তার সর্বক্ষণ রইল রাস্তার ওপাশে হাউসিং এস্টেটের ছোট রাস্তার দিকে। হঠাৎই একবার মনে হল একটা বাড়ির জানলায় যে বিগ বিলি ক্যামেরনের মুখটা দেখতে

পেল। বাড়িটার উপর ভাল করে লক্ষ্য রাখল রামলাল।

বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর রামলাল দেখল, বাড়িটা থেকে এক কিশোরী বেরিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষারত জনাকয় বন্ধুর সঙ্গে কোথায় চলে গেল। এক মুহূর্তের জন্য রামলালের মনে হল, মেয়েটার কাছে যায়, তাকে ডেকে বলে যে তার বাবার জ্যাকেটের পকেটে ভয়াবহ মৃত্যুদূত ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সাহসে কুলোল না।

আরো খানিক সময় কাটার পর রামলাল দেখল, বাড়িটা থেকে এক মহিলা বাজার করার ব্যাগ হাতে বেরিয়ে এলেন। রামলাল ও তাঁকে অনুসরণ করে করে হাজির হল ক্ল্যাণ্ডেবয় শপিং সেন্টারে। এটা শনিবার একটু বেশিক্ষণ খোলা থাকে, কারণ সপ্তাহান্তিক মাইনে যাদের তারা টাকা নিয়ে এলে তবে বাজার হয়। রামলালের ধারণা, ইনিই মিসেস ক্যামেরন। ভদ্রমহিলা ভিতরে গিয়ে স্টুয়ার্ড'স সুপার মার্কেটে ঢুকলেন। ভারতীয় ছাত্রটিও ঢুকল। সারাটা বাজার সে ভদ্রমহিলার পিছন পিছন ঘুরল, আর মনে মনে তাঁকে ডেকে সব বলার সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করে গেল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। স্নায়ুর চাপ কাটাতে পারল না রামলাল। তাছাড়া মনে মনে ভয় রয়েছে, বাড়িটা তো অন্য লোকেরও হতে পারে, ভদ্রমহিলাও মিসেস ক্যামেরন নাও হতে পারেন। এই অবস্থায় সে উল্টোপাল্টা কিছু করে ফেললে সবাই তাকে পাগল ভাববে, তাতে কিসে কী হবে, কে জানে!

সেদিন রাতে রামলালের ভাল ঘুম হল না। ঘুমের ঘোরে সে দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল, চিত্র বিচিত্র সাপটা জ্যাকেটের লাইনিং-এর ভিতর তার লুকোনো জায়গা থেকে কিলবিল করে বেরিয়ে আসছে। নিঃশব্দ, নিশ্চিত তার নির্গমন। অবধারিত মৃত্যুর সংকেত। ঘুমন্ত বাড়িটার সর্বত্র যেন সেই সাপ!

রবিবার রামলাল আবার কিলকুলে এস্টেটে গিয়ে খুঁজে খুঁজে ক্যামেরন পরিবারের বাড়িটা বের করে ফেলল। পরিষ্কার দেখল, পিছন দিকের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিগ বিলি। যখন বিকেল হয়ে এল, ততক্ষণে স্থানীয় অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার এই সন্দেহজনক ঘোরাফেরা। রামলাল বুঝল, তার হাতে এখন দু'টো উপায়। হয় সাহস ভরে ক্যামেরনদের দরজার সামনে গিয়ে কড়া নাড়া এবং তাদের পরিষ্কার বলা যে সে কী করেছে, নয়তো চুপচাপ এখান থেকে চলে গিয়ে দেবীর হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা। কিন্তু ভয়ংকর বিগ বিলির মুখোমুখি হয়ে তাকে বলা যে কী বিপদ তার এবং তার

সন্তানদের সামনে উপস্থিত, এটা আর সাহসে কুলোল না রামলালের। চিন্তাটাই তাকে কুঁকড়ে দিল। আর কালক্ষেপ না করে সে হেঁটে ফিরে গেল রেলওয়ে ভিউ স্ট্রিটে।

সোমবার সকালে ক্যামেরন পরিবারের সবাই ভোর পৌনে ছ'টার মধ্যে উঠে পড়ল। আগস্ট মাসের সকাল, রোদে ঝলমল করছে উজ্জ্বল দিনটা। পরিবারে চারজন লোক—ক্যামেরন, তার স্ত্রী, ছেলে এবং মেয়ে। ছ'টার মধ্যে সবাই চলে এল ব্রেকফাস্ট টেবিলে। বাড়ির পিছন দিকে এককোণে ছোট্ট রান্নাঘর। সেখানেই সবাই এল, ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীর পরণে ড্রেসিং গাউন, বিগ বিলি একেবারে কাজের জন্য তৈরি হয়ে এল। তার জ্যাকেটটা শুক্রবার থেকে বড় হল ঘরটার দেওয়াল আলমারির মধ্যেই রয়েছে।

খাওয়া শেষ করে সবার আগে উঠল বিলি-র মেয়ে জেনি। তখন ছ'টা বেজে গেছে। মুখভর্তি তার মার্মালেড টোস্টে ঠাসা। সেটা চিবোতে চিবোতেই সে বলল, 'আমি মুখ ধুয়ে নিচ্ছি।'

বিলি তখনো এক মনে খেয়ে চলেছে। সামনে প্লেটভর্তি খাবার। খেতে খেতেই সে বলল, 'জেনি, বেরোনোর আগে আমার জ্যাকেটটা এখানে দিয়ে যাও। কয়েক সেকেণ্ড বাদে জেনি জ্যাকেটটা নিয়ে এল কলারের কাছটা ধরে। এনে সেটা বাবার সামনে ধরল। বিগ বিলি মুখ তুলে তাকালোও না। শুধু বলল 'দরজার পিছনে ঝুলিয়ে রাখো।'

বাবার কথা মত কাজ করল জেনি। কিন্তু মুশকিল হল জ্যাকেটটায় ঝোলানোর মত কোন খোপ নেই। তাছাড়া দরজার পিছনের লুকটা কোন লোহার আংটা নয়, মসৃণ ক্রোমিয়ামের তৈরি। ফলে জ্যাকেটটা খানিকক্ষণ ঝুলে থাকার পরই পিছনে রান্নাঘরের মেঝেতে পড়ে গেল। জেনি তখন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। জ্যাকেট পড়ার শব্দে তার বাবা মুখ তুলে তাকাল। চিৎকার করে বলল, 'জেনি, জ্যাকেটটা ভালো করে ভুলে রাখো।'

ক্যামেরন পরিবারে ,পরিবারের কর্তার সঙ্গে কেউ কোন বিষয়ে তর্ক করে না। জেনিও কোন কথা না বলে ফিরে এসে জ্যাকেটটা মাটি থেকে তুলে ভাল করে ঝুলিয়ে দিল। কিন্তু ঝোলানোর সময়েই জ্যাকেটের ভাঁজ থেকে সরু, কালো মত কি একটা যেন মাটিতে পড়ল এবং পড়েই কিলবিল করে ঘরের এক কোণে চলে গেল। শুকনো মেঝেতে সর্‌সর্‌ করে শব্দ হল একটা। ভয়ে বিস্ফারিত চোখে সেটার দিকে তাকিয়ে রইল জেনি। তারপর চিৎকার করে বলল, 'বাবা,

তোমার জ্যাকেটে এটা কি ?'

বিগ বিলি তখন সবে এক চামচ খাবার মুখে দিয়েছে, চামচটা তখনো মুখের ভিতর। সেই অবস্থাতেই সে থেমে গেল। মিসেস ক্যামেরন কুকারে রান্না করছিলেন, তিনিও মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। চোদ্দ বছরের কিশোর ববি এক টুকরো রুটিতে মাখন মাখাচ্ছিল, সে-ও কাজ থামিয়ে তাকাল। ছোট্ট প্রাণীটা ঘরের এক কোণে এক সারি ক্যাবিনেটের পিছনে কুঁকড়ে পড়ে আছে। ঘন হয়ে পাক দিয়ে, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে সামনের পরিস্থিতি জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে সে। ছোট জিভটা ভিতর বাইরে করছে দ্রুত।

'হে ভগবান, এ তো একটা সাপ। কী হবে এখন ?' আঁৎকে উঠলেন মিসেস ক্যামেরন।

'বোকার মত কথা বোল না', ধমকে উঠল বিলি ক্যামেরন, 'আয়ার্ল্যান্ডে যে আদৌ কোন সাপ নেই, এটাও জানো না ? এ তো একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। চামচটা রেখে উঠে এল বিলি, বলল 'ববি ভাল করে দ্যাখ্ তো, এটা কি ?'

বাড়িতে কর্মক্ষেত্রে বিগ বিলি ক্যামেরন যতই ভীতিপ্রদ এবং অত্যাচারী হোক্ না কেন, একটা ব্যাপারে সে মনে মনে প্রচণ্ড বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা পোষণ করে। তার ছেলের জ্ঞান। পড়াশুনোয় ছেলেটা খুবই ভাল। ভাল রেজাল্ট করে। অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস তাদের পড়তে হয়। এরই মধ্যে তার চোখে চশমা উঠেছে। গোল গোল চশমার ফাঁক দিয়ে ছেলেটা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সাপটার দিকে।

'বাবা, এটা মনে হচ্ছে কেঁচো জাতীয় কিছু একটা হবে.' অনেকক্ষণ ধরে দেখে বলল ববি, 'গত টার্মে বায়োলজি ক্লাসের জন্য স্কুলে কয়েকটা কেঁচো এনেছিল ব্যবচ্ছেদ করার জন্য। জল থেকে তুলে এনেছিল, মনে আছে আমার।'

'কিন্তু আমার তো এটাকে দেখে কেঁচো বলে মনে হচ্ছে না', বলল বিগ বিলি ক্যামেরন।

'না, এটা ঠিক পুরোপুরি নয়', বলল ববি, 'এটা এক ধরনের গিরগিটি, তবে পা নেই। পদহীন গিরগিটি।'

'গিরগিটি ? তাহলে এটা কেঁচো জাতীয় হল কি করে ?' সন্দেহের গলায় প্রশ্ন করল বিগ বিলি।

'তা আমি জানি না', ববি উত্তর দিল।

'কিছুই জানো না তো স্কুলে যাচ্ছো কী করতে ?' রাগে চেঁচিয়ে উঠল বিগ বিলি ক্যামেরন।

'এটা কামড়ায় ?' আতঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করলেন মিসেস ক্যামেরন।

'আরে না, না', আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল ববি, 'এগুলো কারুর কোন ক্ষতি করে না। একেবারেই নিরীহ প্রাণী।'

'যাই হোক্, এটাকে মেরে ফেল্,' বলল বিলি ক্যামেরন, 'মেরে ডাস্টবিনে ফেলে দে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে একপাটি চটি খুলে হাতে নিয়ে অগ্রসর হল ববি। চটিটা হাতে মাছি তাড়ানোর পাখার মত ধরেছে সে। খালি পায়ে কোণের দিকে যখন বেশ খানিকটা এগিয়েছে, তখন হঠাৎ-ই তার বাবা মত বদলাল। খেতে খেতে প্লেট থেকে মুখ তুলে যখন তাকালো সে, তখন তার মুখটা হাসিতে ভরে উঠেছে।

'ববি, এক মিনিট দাঁড়া। এগোস্ না আর', বলল বিগ বিলি, 'আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে, অ্যাই, শুনছো, আমাকে একটা জার দাও তো।'

'কীরকম জার ?' প্রশ্ন করলেন মিসেস ক্যামেরন।

'আমি কী করে বলব, কীরকম জার ? জার যেমন হয়, তেমনই। ওপরে ঢাকনা দেওয়া থাকবে', বলল বিলি ক্যামেরন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিসেস ক্যামেরন সন্তর্পণে সাপটাকে এড়িয়ে একটা ক্যাবিনেট খুলে ফেললেন। ভেতরে অনেকগুলো জার। সেগুলো পরখ করতে লাগলেন তিনি। তারপর বললেন, 'জ্যামের একটা জার আছে বটে, তবে ভিতরে শুকনো মটর রাখা রয়েছে।'

'মটরগুলো অন্য কোথাও রেখে জারটা আমায় দাও', নির্দেশ দিল ক্যামেরন। বিনাবাক্য ব্যয়ে সে নির্দেশ পালন করলেন মিসেস ক্যামেরন।

'তুমি কি করতে চাইছো, বাবা ?' প্রশ্ন করল ববি।

'এক ব্যাটা কেলেভূত আমাদের ওখানে কাজ করে। আদিবাসী ধরনের লোক। যে দেশ থেকে লোকটা এসেছে, সেখানে বহু সাপ আছে। সাপেরই দেশ বলা যায়। ওকে নিয়েই খানিক মজা করব। একটু পিছনে লাগা। যাকে বলে আরকি। জোন, ওই রান্না করার গ্লাভ্সটা দাও তো', বলল বিলি ক্যামেরন।

'গ্লাভ্স লাগবে না, বাবা' বলল ববি, 'কাউকেউ কামড়াতে পারে না।'

'সে না পারুক', বলল ক্যামেরন, 'আমি কিছুতেই ওই নোংরা জিনিসটা ছোব না।'

'না না, ওরা নোংরা হয় না', জোর দিয়ে বলল ববি, 'এমনিতে ওরা খুব পরিচ্ছন্ন প্রাণী।'

'আরে রাখ তোর পরিচ্ছন্ন প্রাণী, বোকা কোথাকার', রেগে গিয়ে বলল বিলি ক্যামেরন, 'স্কুলে গিয়ে যত সব ভুলভাল জিনিস শিখছে। বাইবেলে গুড বুকে কি লেখা আছে জানিস্ ? 'যদি তুমি পেটে ভর দিয়ে হাঁটো, তাহলে ধুলো তোমায় খেতেই হবে। বুঝলি কিছু ? আর শুধু ধুলো তো নয়, আরো কি কি পেটে যাবে, কে জানে! আমি হাত দিয়ে কিছুতেই ওটা ছোব না।'

জেনি তার বাবার হাতে রান্না করার গ্লাভ্‌সটা দিল। খোলা আচারের জারটা বাঁ হাতে নিয়ে, ডানহাতটায় গ্লাভ্‌সটা পরে বিগ বিলি ক্যামেরন সোজা গিয়ে দাঁড়াল সাপটার সামনে। ধীরে ধীরে তার ডান হাতটা নেমে আসতে লাগল। যখন হাতটা প্রায় সাপটার কাছে এসে গেছে, তখন বিদ্যুৎ গতিতে ক্যামেরন হাত নামাল। কিন্তু ছোট্ট সাপটার প্রতিক্রিয়া আরো দ্রুত। ছোট ছোট বিষ দাঁতগুলো নিমেষে বসে গেল ক্যামেরনের গ্লাভ্‌স-এর মধ্যে। কিন্তু কোন ক্ষতি হল না, গ্লাভ্‌স-এর পুরু প্যাত ঢেকে রেখেছে ক্যামেরনের ডানহাত-এর তালু। সাপ-এর এই প্রতি আক্রমণ ক্যামেরনের নজরও পড়ল না, কারণ তার নিজের হাতই তার চোখের সামনে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক নিমেষে সাপটা চলে গেল আচারের জারের মধ্যে। ঢাকনাটাও আটকে দিল বিগ বিলি। সবাই দেখল, কাচের জারের মধ্যে রাগে ছটফট করছে সাপটা।

'এরা ক্ষতিকর হোক্ বা না হোক্, আমার বাবা এগুলোকে দেখলেই ঘেন্না করে', বললেন মিসেস ক্যামেরন, 'তুমি এটাকে দয়া করে বাইরে নিয়ে যাও, তাহলেই আমি খুশি হব।'

'ঠিক আছে, এখনই নিয়ে যাচ্ছি', বলল বিগ বিলি, 'এমনিতেই আমার আজ দেরি হয়ে গেছে।'

দ্রুতহাতে আচারের জারটাকে কাঁধের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল বিগ বিলি। ইতিমধ্যেই তার স্ত্রী ব্যাগের মধ্যে টিফিন বাক্স ঢুকিয়ে দিয়েছে। পাইপ আর তামাকের প্যাকেটটা জ্যাকেটের ডানদিকের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যাগ আর জ্যাকেটটা গাড়িতে রাখল বিলি। তারপর রওনা দিল কাজের জায়গায়। সেদিন স্টেশন ইয়ার্ডে ঢুকল পাঁচ মিনিট দেরিতে। একটা জিনিস গোড়াতেই

তার নজরে পড়ল। ভারতীয় ছাত্রটি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বিগ বিলি মনে মনে ভাবল, 'ওঃ, তাকিয়ে আছে দেখো! অসহ্য! এসব চোখে দৃষ্টি না থাকাই উচিৎ!' ট্রাক ততক্ষণে দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করেছে নিউটনওয়ার্ডস হয়ে কুম্বারের দিকে। কোন কথা না বলে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল বিলি ক্যামেরন।

সেদিন বেলা এগারটার মধ্যে সবাই জেনে গেল যে রামলালকে নিয়ে গোপনে একটা মজা করার ফন্দী এঁটেছে বিগ বিলি। একই সঙ্গে সবাইকে এ-ও জানিয়ে দেওয়া হল যে কেউ যদি ভুলেও 'কেলেভূতটাকে' বলে ফেলে যে তাকে নিয়ে মজা হতে চলেছে, তাহলে তার কপালে দুঃখ আছে। এর মধ্যে কেউ দোষেরও কিছু দেখেনি, কারণ 'কেঁচো'-টা একেবারেই নিরীহ প্রাণী, কারুর কোন ক্ষতি করে না। তাই সবারই ধারণা, একটা নির্দোষ মজা হবে মাত্র, আর কিছু নয়। একমাত্র রামলালই গোটা ঘটনাটার কিছুই জানতে পারল না। সে তার নিজের চিন্তায়, নিজের আশঙ্কায় মগ্ন হয়ে রইল।

লাঞ্চ ব্রেকের সময় চারধারে চাপাহাসি ফিসফাস আলোচনা। সন্দেহ হওয়া উচিৎ ছিল রামলালের। একটা টেনশন যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে সরল লোকগুলোর মধ্যে। তারা যথারীতি অন্য দিনের মত আগুন মাঝখানে রেখে গোল হয়ে ঘিরে বসেছে। কিন্তু অন্য দিনের মত আজ আর অনর্গল কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা চলছে না, সব কিছুই কেমন যেন খাপছাড়া, বিসদৃশ। নিজের চিন্তার রাম-লাল যদি অতটা মগ্ন না থাকত, তাহলে নিশ্চিত ভাবেই তার চোখে পড়ত, আশেপাশের মুখগুলোতে চাপা হাসি যেন ফুটে বেরোচ্ছে; সবাই যেন তার দিকেই আড়চোখে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু না, কিছুই লক্ষ্য করল না রামলাল। সে পা ছড়িয়ে বসে দুই হাঁটুর মধ্যে টিফিন বাক্সটা রেখে ঢাকনিটা খুলল। ভিতরে আপেল আর স্যান্ডউইচের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে বিষাক্ত ভাই-পারটা। মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে ছোবল মারার জন্য প্রস্তুত সে।

ভারতীয় ছাত্রটির তীব্র চিৎকারে ফেটে গেল চারদিক, সে চিৎকার প্রতি-ধ্বনিত হল নদীর বুকে। আর তার প্রায় গায়ে গায়ে ভেঙে পড়ল পাশে বসে থাকা শ্রমিকদের সমবেত অট্টহাসি। চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গেই রামলাল গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে টিফিন বাক্সটাকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। বাক্সটা অনেকটা উপরে উঠে একটু দূরে লম্বা ঘাসের মধ্যে গিয়ে পড়ল। ভেতরের খাবার দাবার ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

রামলাল ততক্ষণে চিৎকার করতে করতে উঠে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গী শ্রমিকরা হেসে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বিশেষত বিগ বিলির হাসির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে সবার গলা ছাপিয়ে। এত মজা, এত হাসি গত কয়েক মাস যাবৎ সে উপভোগ করেনি।

রামলাল চিৎকার করে উঠল, 'ওটা সাপ, ভয়ংকর বিষধর সাপ। সবাই এখান থেকে সরে যাও। কামড়ালে আর রক্ষা নেই, সঙ্গে সঙ্গে অবধারিত মৃত্যু।'

হাসির আওয়াজ যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। মানুষগুলো আর নিজেদের সামলাতে পারছে না, হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবার যোগাড়। মজা হবে, এটা সবারই মনে হয়েছিল, কিন্তু লক্ষ্যবস্তুর প্রতিক্রিয়া তাদের সব প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এত মজা বহুদিন হয়নি। কিন্তু রামলালের সেদিকে নজর দেবার সময় নেই। সে আবার চেঁচিয়ে উঠল।

'সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো, এটা সাপ। মারাত্মক বিষধর সাপ। এর কামড়ে মরণ অনিবার্য।'

বিগ বিলির মুখটা হাসতে হাসতে কুঁচকে গিয়ে টকটকে লাল হয়ে গেছে। শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে সে রামলালের দিকে তাকাল। হাসতে হাসতে চোখ বেয়ে জল পড়ছে তার। কোনরকমে জল মুছে দেখল, রামলাল উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চারদিক দেখছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বিলি ক্যামেরন বলল, 'দূর বেটা বোকা কেলেভূত, কিছুই জানিস না। আরে, আয়ার্ল্যাণ্ডে আদৌ কোন সাপ নেই। বুঝলি হাঁদারাম? একটা সাপও আয়ার্ল্যাণ্ডে পাওয়া যায় না।'

আবার হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরল বিগ বিলি, তারপর হাতে ভর দিয়ে ঘাসে আধশোয়া অবস্থায় হাসতে লাগল। হাত দু'টো পিছনে থেকে শরীরের ভর রাখছিল। সে খেয়ালও করল না, কখন দু'টো অতি ক্ষুদ্র বিষ দাঁত তার ডান কব্জির শিরার ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল। চামড়ার উপর ফুটে উঠল ছোট্ট দু'টো দাগ, ঠিক কাঁটা ফুটলে যেমন দাগ হয়, অনেকটা সেইরকম দেখতে।

সবারই হাসির বেগ ততক্ষণে অনেকটা কমে এসেছে। খুব মজা হয়েছে, অতএব এবার সবাই খাবারে মনোযোগ দিলো। খিদেও পেয়েছে খুব। হরকিষেণ রামলালের খাবার এতটুকু ইচ্ছে ছিল না, তবু নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে এককাপ

গরম চা নিয়ে বসল। বাঁহাতে কাপটা ধরে চা খেতে খেতেও চারদিকে সতর্ক রাখতে লাগল রামলাল। বসেছেও লম্বা ঘাস থেকে বেশ খানিকটা দূরে। খাওয়া শেষ হবার পর সবাই কাজে ফিরে গেল। হুইস্কির পুরনো কারখানাটা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে। একদিকে ইট পাথরের স্তূপ, অন্যদিকে বেঁচে যাওয়া কাঠের স্তূপ। উপরে পুরু হয়ে ধুলো জমেছে। আগস্ট মাসের কড় কড়ে রোদ্দুরে পড়ে আছে সেগুলো।

ঠিক বেলা সাড়ে তিনটের সময় কাজ করতে করতে হঠাৎ থেমে গেল বিগ বিলি ক্যামেরন। হাতের গাঁইতিটার উপর ভর দিয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে কপালে একবার হাত দিয়ে ঘামটা মুছে নিল চট্ করে। ডান হাতের কব্জির ভিতর দিকটা কেমন যেন একটু ফুলে উঠেছে। তবে তেমন কিছু নয়। ফোলাটার উপর দিয়ে একবার জিভ বুলিয়ে নিল বিগ বিলি। তারপর আবার কাজ করতে শুরু করে দিল। কিন্তু মিনিট পাঁচেক বাদেই আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

পাশেই কাজ করছিল প্যাটারসন। তাকে ডেকে বিগ বিলি বলল, 'শরীরটা ভাল লাগছে না। আমি ওই ছায়ায় গিয়ে একটু জিরিয়ে নিই।'

একটা গাছের নিচে গিয়ে খানিকক্ষণ বসল ক্যামেরন। দু'হাতে সজোরে চেপে ধরে রইল মাথাটা, বেলা সোয়া চারটের সময় হঠাৎই প্রচণ্ড জোরে একটা হেঁচকি তুলল সে। মাথাটা মনে হচ্ছে ছিঁড়ে যাচ্ছে। গোটা দেহটা কেঁপে উঠল থরথর করে। দু'হাতে মাথা চেপে ধরা অবস্থাতেই বিগ বিলি ক্যামেরন কাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। বেশ কয়েক মিনিট পর হঠাৎ টমি বার্নস-এর নজর পড়ল সেদিকে। কেমন ভাবে যেন শুয়ে আছে বিগ বিলি। একটু এগিয়ে গিয়ে সে প্যাটারসনকে ডাকল।

'মনে হচ্ছে বিগ বিলি অসুস্থ হয়ে পড়েছে', বলল বার্নস, 'ওকে একটু দেখা দরকার।'

দলের সবারই কানে গেল কথাটা। কাজ থামিয়ে সবাই গাছটার কাছে এল। ছায়ায় ঘেরা জায়গাটাতে নিথর হয়ে শুয়ে রয়েছে ফোরম্যান বিলি। দৃষ্টিহীন চোখ দু'টো বিস্ফারিত অবস্থায় চেয়ে আছে মুখের থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে ঘাসগুলোর দিকে, একদিকে কাত হয়ে রয়েছে মাথাটা। ঝুঁকে পড়ে দেখল প্যাটারসন। শ্রমিকের পেশায় দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে সে। বেশ কিছু মৃত্যু দেখেছে অত্যন্ত কাছে থেকে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'রাম, তুমি তো

ডাক্তারি পড়ছ। তোমার কি মনে হচ্ছে?'

পরীক্ষা করার আর প্রয়োজন নেই রামলালের, তবু সে পরীক্ষা করল। যখন উঠে দাঁড়াল, তখন একটা শব্দও তার মুখ দিয়ে বেরোল না। যা বোঝার, বুঝে নিল প্যাটারসন।

গোটা পরিস্থিতিটা সে হাতে তুলে নিল। গম্ভীর গলায় বলল, 'যে যেখানে আছে, সেখানেই থাকো। নড়বে না। আমি অ্যাম্বুলেন্সে একটা ফোন করে ম্যাককুইনকে ফোন করছি।' কাঁচা রাস্তাটা ধরে বড় রাস্তার দিকে চলে গেল প্যাটারসন।

আধঘণ্টা বাদে অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছলো ঘটনাস্থলে। গাড়িটা রাস্তায় এসে দাঁড়ানোর পর দু'জন লোক নেমে স্ট্রেচারে তুলে নিল ক্যামেরনের দেহটা। সব চেয়ে কাছের হাসপাতাল নিউটাউনওয়ার্ডসে, নাম নিউটাউনওয়ার্ডস জেনারেল হাসপাতাল। সেখানে মর্গও রয়েছে। সেখানকার খাতায় ক্যামেরনের নামের পাশে লেখা হল ডি ও এ—ডেড অন অ্যারাইভাল, অর্থাৎ মৃত অবস্থায় যাকে আনা হয়েছে। তারও আধঘণ্টা বাদে সেখানে হাজির হলেন ম্যাককুইন। ভয়ানক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে তাঁকে।

মৃত্যুর কারণ অজানা, অতএব ময়না তদন্ত করতেই হবে। মঙ্গলবার সকালে নিউটাউনওয়ার্ডসের মর্গে সরকারি প্যাথোলজিস্ট শবব্যবচ্ছেদ করলেন। সন্ধ্যার মধ্যেই প্যাথোলজিস্টের রিপোর্ট বেলফাস্টে নর্থ ডাউন করোনারের অফিসে চলে গেল।

রিপোর্টে সন্দেহজনক কোন কিছুরই উল্লেখ নেই। মৃতের বয়স ৪১ বছর, বিশাল চেহারা, ভীষণ শক্তিশালী। শরীরে বিভিন্ন জায়গায় কাটা বা সেলাইয়ের দাগ রয়েছে। বিশেষত হাতে বা কব্জিতে এরকম অনেক দাগ রয়েছে। তবে মৃত ব্যক্তি যে ধরণের পেশায় জড়িত ছিল, তাতে এরকম কাটা ছেঁড়ার দাগ অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাছাড়া এর কোনটাই তার মৃত্যুর কারণ নয়। মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের ফলেই মানুষটি মারা গেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্ভবত অতিরিক্ত গরমে প্রচণ্ড পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরেই লোকটির মৃত্যু হয়েছে।

সাধারণত এই ধরনের রিপোর্ট পেলে করোনার আর বিশেষ কিছু তদন্ত করে না। এক্ষেত্রেও ব্যাঙ্গরের রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠানো ডেথ সার্টিফিকেটে বলা হল স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বিলি ক্যামেরনের জীবনে এমন

একটা ব্যাপার ছিল, যেটা রামলাল জানত না।

বিগ বিলি ক্যামেরন আলস্টার স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর ব্যাঙ্গর পরিষদের একজন সক্রিয় সভ্য ছিল। এটা কট্টর প্রোটেস্টান্টদের এক জঙ্গী সংগঠন এবং সরকারি ভাবে নিষিদ্ধ। এদের সদর দপ্তর লুরগ্যানে। এদের কম্পিউটারে আলস্টার প্রদেশের প্রতিটি মৃত্যু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়, মৃত্যুর কারণ যতই স্বাভাবিক হোক্ না কেন। এখানেই কম্পিউটারে ক্যামেরনের মৃত্যু প্রসঙ্গে কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ল। সেখান থেকে কেউ একজন ফোন করে ব্যাপারটা জানাল রয়্যাল আলস্টার কন্সটাবুলারিতে। সেখান থেকে আবার ফোন গেল বেলফাস্টের করোনারের অফিসে। ফলে আনুষ্ঠানিক তদন্তের আদেশ জারি করলেন। পুলিশি তদন্ত হয়। আগামী বুধবার ব্যাঙ্গরের টাউন হলে তিনি নিজেই সংশ্লিষ্ট লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

আলস্টারে মৃত্যু পরবর্তী তদন্তের প্রথম ধাপ হল একটা মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত কারণে ঘটেছে কিনা শুধু সেটা দেখা নয়, আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যুটা দুর্ঘটনার মত লাগছে কিনা, সেটাও দেখা। করোনারের এই তদন্তের আদেশে ম্যাককুইন কিঞ্চিৎ বিপদে পড়ে গেলেন, কারণ তদন্তের সময় অভ্যন্তরীণ শুল্ক দপ্তরেরও লোকজন হাজির থাকল। আর একেবারে পিছনের সারিতে চুপচাপ শান্ত ভাবে বসে রইল আলস্টার স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর দুই জঙ্গী সদস্য। মৃত ক্যামেরনের কাজের সাথীরা সবাই সামনের দিকে বসল। তাদের থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরত্বে বসলেন মিসেস ক্যামেরন।

সাক্ষ্য দেবার জন্য ডাকা হল একমাত্র প্যাটারসনকে। করোনারের আদেশে সে সোমবারের যাবতীয় আগা থেকে গোড়া বলে গেল। অন্য শ্রমিকরা কেউ কোন তথ্যের বিরুদ্ধতা করল না, বা নতুন কোন তথ্য যোগ করতে পারল না। ফলে অন্য শ্রমিকদের কাউকেই আর সাক্ষ্য দিতে ডাকা হল না। এমনকি রাম-লালকেও নয়। তারপর করোনার প্যাথলজিস্টের রিপোর্টটা উচ্চস্বরে পড়লেন এবং তখনই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। রিপোর্টটা শেষ করার পর নিজের রায় দেবার আগে করোনার গোটা পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করলেন ঃ 'প্যাথোলজিস্টের রিপোর্ট নিশ্চিত এবং নিখুঁত। এইমাত্র আমরা মিঃ প্যাটারসনের কথা থেকে জানতে পারলাম, যে ঘটনার দিন লাঞ্চ ব্রেকের সময় মৃত ব্যক্তি ভারতীয় ছাত্রটিকে নিয়ে খুব বোকার মত মজা করতে গিয়েছিলেন। মনে হচ্ছে, মজা করতে গিয়ে মিঃ ক্যামেরন এতই মজা পেয়েছিলেন, যে হাসতে

হাসতে তিনি সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাময়িক ভাবে বিবশ হয়ে যায় তাঁর। সেই অবস্থাতেই প্রচণ্ড রোদ্দুরের মধ্যে শাবল এবং গাঁইতি নিয়ে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে যান। তাতেই যা ক্ষতি হবার, হয়ে যায়। মস্তিষ্কে রক্তের একটা বড় অংশ বিদীর্ণ হয়ে যায়, যাকে আমাদের প্যাথোলজিস্ট ডাক্তারি পরিভাষায় বলেছেন, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়া। এই আদালত সদ্য-বিধবা ও তাঁর সন্তানদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে। আদালত এই সিদ্ধান্তেই এসেছে, যে মিঃ উইলিয়াম ক্যামেরন আকস্মিক ভাবে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা গেছেন। এতে সন্দেহজনক কিছুই নেই।'

ব্যাঙ্গর টাউন হলের বাইরের লনে তখন ম্যাককুইন তাঁর কর্মচারিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। 'আমি তোমাদের পিছনে নিশ্চয়ই থাকব', বললেন তিনি, 'কাজও আগের মতই চলবে, এটাও নিশ্চিত। কিন্তু আয়কর না কাটা, বা অন্যান্য যে সব সুযোগ-সুবিধাগুলো আগে দিতাম, এখন থেকে তা আর দিতে পারব না। আয়কর দপ্তরের লোকেরা আমার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। আগামীকাল বিলি ক্যামেরনের শেষকৃত্য হবে, অতএব তোমরা ছুটি নিতে পারো। যারা কাজ করতে চাও, তারা শুক্রবার এসে কাজে রিপোর্ট করতে পারো।'

হরকিষেণ রামলাল ক্যামেরনের শেষকৃত্যে গেলনা। ব্যাঙ্গর কারখানায় যখন শেষকৃত্যের কাজ চলছে, তখন সে একখানা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে গেল কুম্বারে। ড্রাইভারকে রাস্তায় দাঁড়াতে বলে সে গাড়ি থেকে নামল। ড্রাইভার নিজেও ব্যাঙ্গরের লোক। ক্যামেরনের মৃত্যুর খবর সে ও জানে। রামলালকে নামতে দেখে সে বলল, 'আপনি কি মৃত্যুর জায়গায় গিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই', বলল রামলাল।

'আপনাদের দেশে কি এভাবেই শ্রদ্ধা জানায়?' আবার ড্রাইভারের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন', জবাব দিল রামলাল।

'তা ভাল। আমাদের দেশে শ্রদ্ধা জানায় কবরের পাশে গিয়ে। তা দুটোই ভাল, কোনটাকে বেশি কম বলা যায় না।' বলে ড্রাইভার ড্যাশবোর্ড থেকে একটা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে পড়তে অপেক্ষা করতে লাগল।

হরকিষেণ রামলাল কাঁচা রাস্তা ধরে হেঁটে যে জায়গাটায় পেঁছিল সেখানেই সোমবার দুপুরে আগুন জ্বালানো হয়েছিল। চুপ করে সেখানে খানিকক্ষণ

দাঁড়ালো সে। চারদিকে লম্বা লম্বা ঘাস হয়ে রয়েছে। সেখানে খানিকক্ষণ থেকে ভাঙা বাড়িটা এবং আশেপাশের খোলা মাটির দিকেও ভালো করে তাকিয়ে দেখল রামলাল।

কোনো সাপের উদ্দেশ্যে রামলাল ডেকে উঠল, 'বিষসর্প—বিষসর্প তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? রাজপুতানার পাড়া থেকে এতদূর পর্যন্ত যে উদ্দেশ্যে তোমায় আমি এনেছি, তা তুমি সফলভাবে করেছ। কিন্তু তোমারও তো মারা যাবার কথা। যদি সব কিছু আমার পরিকল্পনা মাফিক চলত, তাহলে আমিই হয়তো তোমায় মেরে ফেলতাম। তোমার মৃতদেহটা পড়ত গিয়ে নদীর জলে। তুমি কি শুনতে পাচ্ছো, মৃত্যু দূত? তাহলে শোনো। হয়তো আরো কিছুদিন তুমি বেঁচে গেলে, কিন্তু সব প্রাণীকেই একদিন না একদিন মরতে হয়। তোমাকেও মরতে হবে। একা তুমি নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা যাবে, কারণ মিলনের জন্য কোন সঙ্গী তুমি পাবে না। আয়ার্ল্যান্ডে আর একটিও সাপ নেই।'

বিষধর ভাইপার তার কথা শুনল না। কিংবা শুনে থাকলেও তা বোঝার মত কোন ইঙ্গিত দিল না। গরম বালির গভীরে এক গর্তে সে তখন ভয়ানক ব্যস্ত। প্রকৃতি তাকে যা করার নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছে, তা করতেই সে মগ্ন তখন।

সাপের লেজের নিচের দিকে দু'টো আড়াআড়ি চোয়াল আবরণ থাকে, যেটা তাদের রেচন ছিদ্রকে ঢেকে রাখে। বালির গর্তে ভাইপারের ল্যাজটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, শরীরটা মোচড়াতে লাগল আদি, অকৃত্রিম ছন্দে। ধীরে ধীরে আবরণ দু'টো সরে গেল। ছিদ্র থেকে একের পর এক বেরিয়ে আসতে লাগল সর্পশিশু। স্বচ্ছ থলির মধ্যে ইঞ্চিখানেক লম্বা এক একটা বাচ্চা। জন্মের সাথে সাথেই যারা ভয়ংকর বিষধর। মনের আনন্দে, নিশ্চিন্তে ডজন-খানেক শিশুকে পৃথিবীর আলোয় নিয়ে আসছে নাগমাতা।

সমাপ্ত